রাতজাগার পালা

তপোবিজয় ঘোষ

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা

[Ratjagar Pala—a Bengali novel by
Tapobijoy Ghose

প্রথম প্রকাশ

১৫ এপ্রিল, ১৯৬৪

প্রকাশক

মজাহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা—৭০০০০৭

মুদ্রক

শ্রীঅধীরকুমার ঘোষ
কালিকা জব প্রেস
১০৯বি, কেশব সেন স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০০৯

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

অর্ধেন্দুশেখর দাস

সুহৃদ্‌বরেষু

প্রেসের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা, প্রুফ দেখা ও অন্যান্য কাজে নিরন্তর সাহায্য করেছে শিবানী ঘোষ, পারমিতা ও সুচরিতা ঘোষ।

কালিকা জব্ প্রেসের কর্ণধার অধীর ঘোষ ও বিজয় পাল, কানু সরকার, তারাপদ মণ্ডল, রঞ্জিত মাইতি, দেবাশিস্ মিদ্যা, মহাদেব ঘোষ ও শৈলেন দত্ত দ্রুত গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রকাশের কাজে সাহায্য করেছেন।

গ্রন্থের চমৎকার প্রচ্ছদটি এঁকে দিয়েছেন স্বনামখ্যাত শিল্পী খালেদ চৌধুরী।

আশা করা যায়, আমার 'সামনে লড়াই'-উপন্যাসটির মতো 'রাতজাগার পালা'ও প্রগতি-পাঠকের আনুকূল্য লাভ করবে।

তপোবিজয় ঘোষ

এই লেখকের

উপন্যাস

সামনে লড়াই

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ

[মালয়ালম ও তামিল ভাষায় অনূদিত]

ছোটগল্প

কালচেতনার গল্প

নির্বাচিত গল্প

প্রবন্ধ ও গবেষণাগ্রন্থ

সুকান্ত-অন্বেষা

উনিশশতকের নীল-আন্দোলন

ও বাংলার সারস্বত সমাজ [যন্ত্রস্থ]

মাঝরাতে একধরণের খুট খুট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যেতে ঘোষাল-মশাই সন্দেহ করলেন তাঁর বাড়িতে চোর ঢুকেছে। আর সন্দেহ হওয়া মাত্র অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি ধারালো এবং চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। নিঃশব্দে কিন্তু হিংস্র ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে বসলেন তিনি।

এ পাড়ায় চোরের উপদ্রব খুব বেশি। কারণ পাড়াটা ঠিক শহরের মধ্যে নয়—আবার গ্রামও নয়। শহরের শেষ সীমান্তে গ্রামের ধারে ধানমাঠের গা ছুঁয়ে গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র জনপদটি। এর বিঘা ত্রিশেক উঁচু ডাঙ্গাজমি বহুকাল অনাবাদী ও বাসের অযোগ্য হয়ে বন্ধ্যা অবস্থায় পড়ে ছিল। কাছাকাছি মুসলমানদের প্রাচীন ও পরিত্যক্ত একটা গোরস্থান থাকায় বাড়িঘর ওঠে নি। রাঢ়ের রুক্ষ লাল কাঁকুরে মাটিতে গাছপালাও তেমন জন্মায় নি। এখানে ওখানে ছু'একটা বট, নিম আর গোটা তিনেক শিমূল গাছ ছিল। গোরস্থানে মাটি খোঁড়াখুঁড়ির জন্য গজিয়ে উঠেছিল কিছু বাবলা আর আশশ্যাওড়ার গাছ। ফাল্গুন চৈত্র মাসে শিমূল গাছে লাল ফুলের আগুন লাগত। বাতাসে শিমূলের তুলো উড়ে বেড়াত। বর্ষাকালে এখানে ওখানে সবুজ ঘাসের উঁকিঝুঁকি দেখা দিলে আশেপাশের গাঁ থেকে গরু চরাতে আসত বাগালেরা। তখন ধানমাঠে গরু নামানো যেত না। ডাঙ্গা-জমির ঢালু অংশে ধানের জমিতে সবুজ কচি ধানের চারা বর্ষার জল পেয়ে লকলকিয়ে উঠত। বাগালেরা ডাঙ্গালের জমিতে গাইবাছুর চরতে দিয়ে বট কিংবা শিমূলতলায় পা ছড়িয়ে বসে লক্ষ্য রাখত—জন্তুরা যেন ধানমাঠে না নামে। নামলে গরুর দোষ ধরবে না কেউ, বাগালের পিঠেই পড়বে পাচনের ঘা। খোরাকির চাল বন্ধ করে শাস্তি দেওয়া হবে তাকে। বাগালি থেকেও ছাড়িয়ে দিতে পারে।

এই অনুর্বর পাথুরে ডাঙ্গাজমিতে, মুসলমানদের কবরখানার গা ঘেঁষে কোনোদিন বাড়িঘর উঠবে, শহুরে 'বাবু'-রা বউছেলেমেয়ে নিয়ে বসতি স্থাপন করবে, দোল দুর্গোৎসব পূজা পার্বন হবে, সামিয়ানা খাটিয়ে যাত্রার আসর বসবে, এমন কথা আশেপাশের পাঁচ গাঁয়ের লোক ভাবে নি কখনো। কিন্তু এখন সবই হয়েছে। দেশ ভাগাভাগির পর শহরের মানুষজন বাড়তে শুরু করেছে। বাড়তি মানুষ ক্রমে আরো মানুষের জন্ম দিয়েছে। এখন শহরের বুকে বাড়ি তোলার মত আর জমি নেই। ফাঁকেফুঁকে দু'এক কাঠা যদি বা আছে তার দাম মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। দশ বছর আগেও যে-জমি এক হাজার টাকা কাঠায় পাওয়া যেত, এখন বারো হাজারেও হয় না। কাজেই কম-মাইনের বাবু-মানুষেরা—কেরানি, স্কুলমাস্টার, নার্স, ছোট দোকানদারের দল শহরের জমির আশা ছেড়ে ছিটকে পড়েছে শহর-সীমান্তে, গাঁয়ের ধারে। ছোটোখাটো মাথা গোঁজার মত একটা আশ্রয় তো চাই। পরের জমিতে, পরের বাড়িতে না, নিজের জমিতে, নিজের বাড়িতে। এর চেয়ে বড় আশা, বড় স্বপ্ন মধ্যবিত্তের আর কি আছে! কাজেই পৈতৃক সঞ্চয় নিঃশেষ করে, স্ত্রীর গায়ের গয়না বন্ধক দিয়ে কিংবা প্রভিডেণ্ড-ফাণ্ডের টাকা উঠিয়ে একটুখানি জমি কেনা, তারপর অবশিষ্টাংশের সঙ্গে ব্যাঙ্কের ঋণ কিংবা সরকারি-গৃহ-প্রকল্পের চড়া সুদের ধার যোগ করে ইট বালি লোহা কাঠের টাকা কিস্তিবন্দি হারে মাসান্তে পরিশোধের চুক্তিবদ্ধ হয়ে দেড় দুই কোঠার একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করা—এই সামান্য অথচ গভীর প্রত্যাশার তাড়নায় এই ডাঙাজমিতেও এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মানুষ।

জমির মালিক তালপুকুরের রমজান আলিও মওকা বুঝে সদর থেকে আমিন আনিয়ে ডাঙাজমি ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে নিয়েছে। তিন-চার-পাঁচ কাঠার প্লট। মাঝে মাঝে যাতায়াতের সরু রাস্তা। লম্বালম্বি একটা বড়রাস্তাও দিয়েছে ভবিষ্যতে গাড়িঘোড়া ঢোকার জন্য। তারপর যার কাছে যেমন পেরেছে চড়া দাম আদায় করে দু-তিন বছরের মধ্যে সমস্ত জমি বিক্রি করে সদরের হাটতলায় নিজে

একখানা বড় বাড়ি হাঁকিয়ে বসেছে। তার দুই ছেলে সদরের কোর্টে ওকালতি করে।

ডাঙ্গার সবচেয়ে বেশী প্লট কিনেছেন নিশিন্দার নগেন চৌধুরী। ডাইনে-বাঁয়ে সব মিলিয়ে চার ও পাঁচ কাঠার ছ'খানা প্লট। ঘোষালমশাই কিনেছিলেন তিন কাঠার দু' খানা। তার এক অংশে বাড়ি করেছেন, অন্য অংশ ফাঁকা পড়ে আছে। মাঝে মাঝে শাক সব্জী উৎপাদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু রুক্ষ কাঁকুরে জমিতে ফসল ভাল হয় না। ডাঙ্গায় এখন সব মিলিয়ে পঞ্চাশ-ষাটটি বাড়ি উঠেছে। আরো কিছু ওঠার মুখে। আবার ফাঁকাও পড়ে আছে অনেক জমি। দাম চড়ছে, হাতবদল হচ্ছে, কিন্তু বাড়ি উঠছে না। ফলে ডাঙ্গাজমির কোনো অংশে পরপর কয়েকটা বাড়ি ঘন হয়ে উঠেছে, কোনো অংশে ছাড়াছাড়া বিচ্ছিন্ন ভাব, একটা বাড়ি থেকে আরেকটার দূরত্ব অনেকখানি।

এই অঞ্চল এখনো শহরের মিউনিসিপাল্টিটির অন্তর্গত নয়, নিশিন্দা মৌজার অধীন গ্রাম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত। ফলে ইলেকট্রিকের আলো পৌঁছয় নি, পাকা রাস্তা, পাকা ড্রেনের ব্যবস্থাও নেই। কিন্তু তা নিয়ে বাসিন্দাদের কোনো ক্ষোভ নেই। বরং তারা মিউনিসি-পালিটির অধীনে যাওয়ার কথা শুনলে আতঙ্কিত হয়। কারণ বাড়ির ট্যাক্স তাহলে সাতগুণ বেড়ে যেতে পারে। অঞ্চল-পঞ্চায়েতে বছরে দশ-পনেরো টাকা দিয়ে রেহাই পায় তারা। পৌরসভার খপ্পরে গেলে কোন্-না এক-দেড়শ হবে। গাঁটের কড়ি খসিয়ে বাড়তি ট্যাক্স গোনার সাধ বা সামর্থ্য কোনোটাই পল্লীর মানুষদের নেই। তবে অদূরবর্তী শহরের ইলেকট্রিক লাইটগুলোর দিকে তাকিয়ে তাদের মন চনমন করে। পৌরসভার এক্তিয়ারভুক্ত না হয়েও বিদ্যুতের আলো কিভাবে আনা যায় তার জন্য শলাপরামর্শও করে।

এখান থেকে শহর মাইল দেড়েক, পার্শ্ববর্তী বর্ধিষ্ণু নিশিন্দা গ্রাম মাইল খানেক। লাল ধুলো ও কাঁকরের একটা কাঁচা রাস্তা নিশিন্দা থেকে অঞ্চলটা ছুঁয়ে শহরের দিকে গেছে। উত্তরে তাকালে

ময়ূরাক্ষী নদীর কিছু অংশ চোখে পড়ে। নদীর বুকে ইস্পাতের ব্যারেজ। বর্ষাকালে বাঁধের জল ফুলেফেঁপে ডাঙ্গাজমির অনেক কাছাকাছি এসে পৌঁছয়। তখন সেখানে মাছ ধরার মরশুম শুরু হয়। ডাঙ্গার মানুষেরা সস্তায় মাছ কেনার জন্য ধানমাঠের আলপথ ধরে ব্যারেজে যায়।

নিশিন্দায় হাইস্কুল আছে, ধানকল, আটাকল, খড়কাটার কল সবই আছে। নিশিন্দার সরকারবাবুরা অনেক আগেই ইলেকট্রিক নিয়ে এসেছেন গাঁয়ে। এমন কি, বড় তরফের সরকারদের ঘরে টেলিফোন পর্যন্ত আছে। নিশিন্দার পাকা রাস্তা দিয়ে বাস যায় বক্রেশ্বর কিংবা রাজনগর। শীতের মরসুমে অস্থায়ী তাঁবুর সিনেমা চালু হয়। মেলা বসে। সার্কাস আসে। কিন্তু এই ডাঙ্গার মানুষেরা নিশিন্দার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা পছন্দ করে না। হাজার হোক ওটা তো শহরের বাইরে, খালি পা, উদোম-শরীর চাষা-ভূষোদের গ্রাম-ই! সরকারদের বাদ দিলে আর ক'ঘর ভদ্রলোকই বা বাস করে সেখানে। কাজেই এ-পাড়ার চাকুরিজীবী বাবু-মানুষেরা নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে বড় একটা নিশিন্দামুখো হয় না। তারা শহরের অফিসে-আদালতে কাজ করে, শহরের স্কুলে ছেলেমেয়ে পড়ায়, সেজেগুঁজে শহরের সিনেমাহলে সিনেমা দেখতে যায়। সকলের ঘরেই সাইকেল আছে একখানা করে। তাতে চেপে শহরের বাজারে যায় মাছ আলু শাক সব্জী কিনতে। নিশিন্দার শিবতলায় প্রতি রবিবারে গাঁ-গঞ্জের যে বড় হাট বসে—কদাচিৎ সেখানে যায় আঁখের গুড়, বেতের ঝুড়ি কিংবা বিষ্টুপুর-তাঁতিপাড়ার সস্তা চাদর গামছা তাঁতের কাপড়ের জন্য। রাজনগরের কারখানা থেকে শক্ত শণের দড়ি আসে হাটতলায়। জলে ভিজে সে দড়ি নষ্ট হয় না। ডাঙ্গার মানুষেরা কপিকলের জন্য দড়ি কিনতেও যায়। কেননা সকলের বাড়িতেই ছোট ইঁদারা আছে। শক্ত পাথুরে মাটিতে টিউবওয়েল বসে না। ইঁদারা কেটে জলের সংস্থান হয়।

ডাঙ্গাপল্লীর চারদিকেই ধানমাঠ। নাবাল জমির এখানে-ওখানে

ডোবাপুকুর, ঝোপজঙ্গল। রাত্রিবেলা দলবেঁধে শেয়াল ডাকে, দিনের আলোতেও সাপেরা ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যা হলে ঝিঁঝিঁর শব্দে মাঠ গম গম করে, জোনাকিরা জ্বলে নেভে।

চারদিকে পালানোর অজস্র সুযোগ থাকায় এ-পাড়াটায় প্রায়ই চুরি হয়।

বস্তুত ডাঙ্গাপল্লীর মানুষদের কাছে নিশ্চিন্তে বসবাসের পক্ষে এখন সমস্যা একটাই—চোরের সমস্যা। পল্লীতে সম্ভবত এমন একটা বাড়িও নেই যেখানে চোর ঢোকে নি বা কিছু চুরি যায় নি। থালা বাসন, কাপড়জামা, ট্রাঙ্কস্যুটকেশ—এসব তো আছেই, উঠোনের কয়লা কাঠ, কুয়োর দড়ি, কপিকল, গাছের লাউকুমড়ো, কলার কাঁদিও রেহাই পায় না। এ-পাড়ায় ঢুকে খালি হাতে চোর ফিরে যায় না। কিছু সে নেবেই। ফলে রাত্রি নামলে পল্লীর লোক জলাতঙ্কের মত চোরাতঙ্কে ভোগে।

ঘোষালমশায়ের বাড়িতেও দু'বার চুরি হয়েছে। আরো দু'বার চুরির চেষ্টায় দরজার তালা ভেঙ্গেছে, জানালার শিক বাঁকিয়েছে। সে-সব অবশ্য অনেকদিন আগের কথা।

এই ডাঙ্গাজমিতে প্রথমে যারা এসে বাড়ি তুলেছিলেন শিবচন্দ্র ঘোষাল তাঁদের একজন। পুরনো আমলের মানুষ। সেই কবে কোন্ কালে এন্ট্রান্স পাশ করে সরকারি চাকরিতে ঢুকেছিলেন। দেশভাগের পর অপ্শন দিয়ে চলে আসেন এ-বাংলায়। তারপর এ জেলা সে জেলা ঘুরে শেষপর্যন্ত লালমাটির এই শহরে এসে অবসর নিয়েছেন। রমজান আলি ডাঙ্গাজমি সস্তায় বিক্রি করছে শুনে তিনিই ছিলেন প্রথম খদ্দের যিনি মুসলমানদের কবরখানার সংস্কার উপেক্ষা করে এই ব্রহ্মডাঙায় সাকুল্যে বারোশ টাকায় ছ'কাঠা জমি কিনে নিয়েছিলেন। এত সস্তায় জমি তাঁর পাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু রমজান আলি বুদ্ধিমান। একঘর মানুষ এবং ব্রাহ্মণ মানুষ বসাতে পারলে অন্যদের কাছে চড়াদামে জমি বিক্রির সুবিধা হবে—এটা সে বুঝেছিল। তার হিসেবে ভুল হয় নি।

ঘোষালমশাই জমি কেনার পরেই দাস-বিশ্বাস-বসু-রায়েরা জমি কেনার জন্য ছুটে এসেছিল। ঘোষালমশাই সৎ ব্রাহ্মণ হয়ে যদি গোরস্থানের বাতাস-বওয়া 'অপবিত্র' জমি কিনতে পারেন—তাহলে তাদের আর ভয়ভাবনা কি। কিন্তু এসব পরের কথা। ঘোষালমশাই জমি কিনলেন, তারপর গ্র্যাচুয়িটি আর প্রভিডেণ্ড-ফাণ্ডের সঞ্চিত টাকা ভেঙ্গে বাড়ি তুলতে শুরু করলেন। সেও প্রায় পনেরো বছর আগের ঘটনা।

নতুন বাড়িতে এসে দুটো ছাগল কিনেছিলেন ঘোষালমশাই। একটা গরুও কিনেছিলেন। ভেতরের উঠোনে একপাশে খড়ের চালাঘর তুলে ওদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। একদিন রাত্রে ছাগলদুটো চুরি হয়ে গেল। সকালে উঠে ঘোষালমশাই দেখলেন, চালাঘরের দরজা, উঠোনের দরজা হাট করে খোলা। গরুর গলার দড়িও খুঁটি থেকে কেউ খুলে দিয়েছে। সম্ভবত তাকেও টেনে নেবার চেষ্টা হয়েছিল। সুবিধে হয়নি বলে ছেড়ে গেছে। ষাট টাকা দিয়ে ছাগল দুটো কিনেছিলেন তিনি। একটা মাদী, একটা মরদ। ইচ্ছে ছিল, বংশ বাড়িয়ে ব্যবসা করবেন। রিটায়ারমেণ্টের পর ক'টাকাই বা পেন্সন পান। বড় ছেলে দুর্গাপুরে চাকরি করে। মাসে কিছু টাকা পাঠায়। বাড়িতে চারটে মুখে অন্ন যোগাতে হয়। ঘোষালমশায়ের তো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলে না। কিছু বাড়তি উপার্জনের ফন্দিফিকির করতেই হয়। ছাগলদুটো চুরি যাওয়ায় তিনি খুব চোট খেলেন। মিস্ত্রি ডেকে চালাঘরের দরজায় মোটা লোহার কড়া লাগালেন। মজবুত দেখে তালাও কিনে আনলেন একটা। গরুর নিরাপত্তা বিষয়ে সতর্ক ও সাবধানী হলেন। দুধেল গাই। বাছুর হওয়ার পর দিনে আড়াই-তিনসের দুধ দেয়। বাড়ির জন্য কিছুটা রেখে বাকিটা বিক্রি করেন ঘোষালমশাই। মাসে কিছু টাকা আয় হয়। সে গরু তো চুরি হতে দেওয়া যায় না।

গরু বাঁচল কিন্তু তিন বস্তা সিমেণ্ট চুরি হয়ে গেল কয়েকমাস পরেই। বাড়ির বাইরের অংশ প্লাস্টার করাবেন বলে সিমেণ্ট এনে রেখেছিলেন ঘোষালমশাই। কণ্ট্রোল-দরের সিমেণ্ট। পনেরো বস্তার

জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। তারপর অনেক হাঁটাহাঁটি তদ্বির-তদারকির পর অফিস থেকে সাতবস্তার পারমিট মঞ্জুর হয়েছিল। সদরের নাথু মাড়োয়ারির গুদাম থেকে গরুরগাড়িতে বয়ে এনে গোয়াল-ঘরের এক ধারে ইটের উপর থাকবন্দী সাজিয়ে রেখেছিলেন। পরের মাসে বালি কিনে মিস্ত্রি-মুনিষ লাগাবেন। সাত বস্তা থেকে তিন বস্তা চুরি হয়ে গেল। তালা ভেঙ্গে নয়—দেয়াল কেটে। গোয়াল-ঘরের দেয়াল মাটি দিয়ে গাঁথা, দশইঞ্চি পুরু। কিন্তু প্লাস্টার করা হয় নি। তাতে অবশ্য ক্ষতি ছিল না। রাঢ়ের মাটি সিমেণ্টের মতই শক্ত। ঠিক মত ভেঙ্গেগুঁড়িয়ে ঘাসপাতাপাথর বেছে, জল ঢেলে ময়দার মত মিহি করে মেখে শুকনো ইট গেঁথে তুললে একতলা কেন তিনতলা বাড়িও তিনপুরুষ টিকে যায়। ঘোষালমশাই-সমেত এ-পাড়ার অনেক বাড়ির অনেক অংশই সিমেণ্টের অভাবে মাটি দিয়ে গাঁথা। তাতে বালি কিনতে হয় না, জলে ইট ভেজাতে হয় না, মিস্ত্রি মুনিষের খরচ কম পড়ে, বাড়িঘর সস্তায় হয়। সিমেণ্ট যোগাড়ের ঝামেলা যেমন, খরচও তেমনি। এ-পাড়ার স্বল্পবিত্ত মানুষগুলো ভিত্ থেকে ছাদ পর্যন্ত গোটা বাড়ি আগাগোড়া সিমেণ্টে গেঁথে তুলবে এমন সামর্থ্যের অধিকারী নয়। আর মেয়েদের আব্রু বাঁচানোর জন্য উঠোনের পাঁচিল কিংবা রান্নাঘর-গোয়ালঘর সিমেণ্টে গাঁথার তো প্রশ্নই ওঠে না! ঘোষালমশায়েরও রান্নাঘর-গোয়ালঘর, মানুষ-প্রমাণ উঠোনের পাঁচিল —মাটি দিয়ে গাঁথা। সেই দেয়ালের এক অংশ শাবল দিয়ে খুঁড়ে ইট সরিয়ে সিঁধ কাটা হয়েছে। গোটা তিনেক ইট খসিয়ে নেবার পর শাবলের চাড় দিয়ে আশেপাশের ইট ছাড়িয়ে ফেলা সহজ। ধান-মাঠের দিকে নিরালায় বসে চুপিসারে সিঁধ কেটেছে চোরেরা। তারপর সিমেণ্টের বস্তা মাথায় তুলে পালিয়ে গেছে। সাত বস্তার মধ্যে তিন বস্তার খোঁজ নেই। বাকি ক'বস্তা বাইরে খোলা মাঠে বের করা রয়েছে। নিয়ে যেতে পারে নি। দেখেশুনে মনে হয়, দলে ওরা তিনজন ছিল। তিনবস্তা নেবার পর ঘুরে আসার ইচ্ছে থাকলেও সাহস পায়নি।

সিমেণ্ট চুরি যাওয়ায় ঘোষালমশাই স্তম্ভিত হলেন। এসব বস্তু চুরির কথা তিনি বড় একটা শোনেন নি। তারপর শাবল দিয়ে দেয়ালের ইট সরানো—সেও এক ভয়ানক ব্যাপার! ভাবনাচিন্তায় দুঃখেকষ্টে মুখ কালো করে থানায় গেলেন ঘোষালমশাই। ডাইরি করলেন। বিকেলের দিকে সাইকেলে চেপে একজন সাব্-ইনস্পেকটার সব দেখেশুনে তদন্ত করেও গেল। কিন্তু সিমেণ্টের হদিশ পাওয়া গেল না। ডাঙ্গাপল্লীতে চুরিও বন্ধ হ'ল না।

ঘোষালমশাই বুঝলেন, নিজের নিরাপত্তা নিজের হাতে। এখন তিনি একরকম রাত জেগে নিজের ঘরদরজা নিজেই পাহারা দেন। কোথাও একটু শব্দ উঠলে হাঁকডাক শুরু করেন। কখনো নিঃশব্দে মোটা বাঁশের লাঠিখানা নিয়ে দরজা খুলে উঠোনে নেমে পড়েন। তাঁর তীক্ষ্ণ সতর্কতার ফলে একবার রান্নাঘরের তালা ভেঙ্গেও ঘরে ঢুকতে পারে নি চোরেরা। আর একবার জানালার শিকে লোহা ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে বাঁকা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। ঘোষাল-মশায়ের সঙ্গে চোরদের এখন রীতিমত একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। এবং এরকম ঠাণ্ডা লড়াই অন্য অন্য ঘরেও। কেননা চোরের হাতে চোট্ খাওয়া ঘর পাড়ায় এখন অনেক।

আজও একটু শব্দ শোনা মাত্র বিছানায় উঠে বসলেন ঘোষাল-মশাই। অন্ধকারে তাঁর চোখের দৃষ্টি প্রখর হল। বুকের মধ্যে তীব্র প্রতিশোধের স্পৃহা তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল। অনেক কষ্টে উত্তেজনা চেপে মশারি তুলে বাইরে এলেন। কাওকে ডাকলেন না, চেঁচালেন না। নীচু হয়ে খাটের তলা থেকে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বাঁশের লাঠিখানা তুলে নিলেন। তারপর নিঃশব্দে দরজার উপর-নীচের ছিটকিনি ও মধ্যেকার খিল খুলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বুড়ো হলেও অসম্ভব সাহসী তিনি। একটু বা জেদীও। মনে মনে যে-কাজটা করবেন বলে একবার স্থির করেন তার নড়চড় হয় না। এই বয়সেও পাড়ার আপদে বিপদে

একাই ছুটে যান। রাতবিরাত মানেন না, ছোঁয়াছুঁয়ির বাদবিচারও করেন না। কোনো বিষয়ে তাঁর বিশেষ কোনো সংস্কার নেই। এ পল্লীর মানুষ তাঁকে ভালবাসে, বয়সের গুণে সম্মানও করে।

চোরের কাছে কয়েকবার ঘা খেয়ে ঘোষালমশাই যেন নিজের অজান্তেই ভেতরে ভেতরে অসম্ভব ক্রুদ্ধ আর হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন। যেভাবেই হোক সেই আঘাত ফিরিয়ে দেবার চেষ্টায় লাঠিখানা শক্ত মুঠোতে ধরে উঠোনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর সন্দেহ হ'ল, রান্নাঘরের দেয়াল কেটে সেবারের মতো ইট সরাচ্ছে কেউ।

কিন্তু ঘোষালমশাই উঠোনে নামা মাত্র একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠল। তাঁর স্ত্রী স্নেহলতার ঘুম গেল ভেঙ্গে। অন্ধকারেও টের পেলেন তিনি—শোবার ঘরের দরজা হাট করে খোলা। কে খুলল! কিভাবে খুলল! স্নেহলতা প্রথমটা কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়েভাবনায় নিশ্বাস বন্ধ করে ফেললেন। ঘোষালমশায়ের খাটের পেছন দিকে নীচের মেঝেয় বিছানা পেতে তিনি আর ছোট মেয়ে কালী একসঙ্গে শোন। পাশের ঘরটায় থাকে মেজ মেয়ে পারুল। দুর্গাপুর থেকে বড় ছেলে কিংবা নলহাটীর শ্বশুরবাড়ি থেকে বড় মেয়ে শৈল এলে ও-ঘরটাতেই শোয়। স্নেহলতা হাত বাড়িয়ে কালীকে ঠেলে জাগাতে চাইলেন। কিন্তু ভয়ে হাত সরল না বড় বড় চোখ মেলে তিনি খোলা দরজা দিয়ে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর স্বামী রাতে বাইরে গেলে মেয়েদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে জানান দিয়ে যান। মেয়েরাও বাইরে গেলে বাবাকে ডাকে। কুয়োতলার গায়ে বাথরুম। রাতে সেখানে সাড়াশব্দ না দিয়ে কেউ যায় না। কৃষ্ণপক্ষের রাত হলে লণ্ঠনও জ্বালানো হয়। তাহলে আজ অন্ধকারে এমনভাবে দরজা খোলা কেন?

দাঁতে দাঁত চেপে কিছুক্ষণ নিঃসাড় থেকে স্নেহলতা হঠাৎ প্রবল শব্দে, হিংস্র জন্তুর তাড়া-খাওয়া ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওগো, সব্বনাশ হয়েছে গো, কে কোথায় আছ গো, ঘরে চোর ঢুকে সব নিয়ে গেলো গো—'

শোনামাত্র ঘুম ভেঙ্গে গেল কালী আর পারুলের। তারা কিছু বুঝল না, কিছু দেখল না, কিছু ভাবলও না। একসঙ্গে তীব্র চেরা গলায় চেঁচাতে লাগল—'চোর—চোর—চোর—'

কালী তো চেঁচাতে গিয়ে ভয়ে কেঁদেই ফেলল!

লাঠি হাতে ঘোষালমশাই পা টিপে টিপে কিছুদূর এগিয়েছিলেন —অকস্মাৎ গৃহমধ্যে স্ত্রীকন্যার সরব সম্মিলিত চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ধমকে উঠলেন—'আঃ, চুপ কর! চুপ কর তোমরা, কিছু হয় নি! এই পারুল, এই কালী—আমি, আমি এসেছি বাইরে—'

তাঁর গলা শুনে স্নেহলতা চুপ করলেন। কালী পারুলও থামল। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়েছে। আশেপাশের ঘরবাড়ির মানুষেরা জেগে উঠে 'চোর, চোর' চিৎকার শুরু করেছে। মেয়েবউরা জেগে উঠে লণ্ঠন জ্বালাতে শুরু করেছে। এবাড়ি ওবাড়ির জানালা দিয়ে খোলা মাঠে টর্চের আলো এসে পড়ছে। বয়স্করা ভয়-পাওয়া বাচ্চাদের ধমকাচ্ছেন। সাত আটটা বাড়ি থেকে সাহসী ছেলেরা লাঠি কিংবা বর্শা হাতে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। সরোজদের বাড়িতে বন্দুক আছে—সে চেম্বারে গুলি ভরতে শুরু করেছে।

এখন ডাঙ্গাপল্লী তো আর আগের মত নির্জন নেই। একটি দুটি করে অনেক ঘরবাড়ি উঠেছে। কম করেও পঞ্চাশ-ষাট ঘর মানুষ। ঘোষালমশায়ের উত্তরদিকটা ফাঁকা থাকলেও বাকি তিনদিকে মানুষের বসতি হয়েছে। দেখতে দেখতে কয়েকমিনিটের মধ্যে সবাই জেগে উঠল।

সরোজ শিশির উৎপল কাজলেরা লাঠি-বন্দুক হাতে বাইরে এসে চেঁচাল, 'ভয় পাবেন না আপনারা! কোথায়, কার বাড়িতে চোর ঢুকেছে?'

জটিল দাস বলল, 'তিনকড়ির ঘরে! তার বউই তো চেঁচাল!' তিনকড়ির ভাই বলল, 'বৌ না, মা চেঁচিয়েছে। কিন্তু সে তো পাশের বাড়ির নাড়ুর দিদির গলা শুনে—'

নাড়ুর বাবা লণ্ঠন হাতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'না,

আমার বাড়িতে কিছু হয় নি! ওই পারুলদের বাড়িতে ঢুকেছে—'

ততক্ষণে ঘোষালমশায়ের ঘরেও আলো জ্বলে উঠেছে। স্নেহলতা এ-পাশের দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঘোষালমশাই লাঠি হাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এলেন। স্ত্রীকন্যাদের আচরণে কিছুটা বিব্রত ও লজ্জিত। বাড়িতে সত্যি সত্যি চোর ঢুকেছিল কিনা এ বিষয়ে তিনি তো নিঃসন্দেহ নন! তিনি তো দেখেন নি নিজের চোখে! রান্নাঘর-গোয়ালঘরের তালাও অক্ষত আছে। এমন কি ইঁদারার কপিকল কিংবা দড়িটুকুও খোয়া যায় নি। কিছু একটা শব্দ শুনে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল মাত্র। কিন্তু কালীর মা-টা আচমকা চেঁচিয়ে উঠে এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসল!

ঘুম ভেঙে ছুটে-আসা মানুষগুলোকে এখন কি বলবেন ঘোষালমশাই! সেই মেষপালক ও তার পালে বাঘ-পড়ার গল্প মনে পড়ল। স্ত্রীর উপর বিষম অসন্তুষ্ট হয়ে আরো ক'পা এগিয়ে এসে বললেন, 'ও কাজল! ও সরোজ! আমি ডেকেছি সবাইকে। আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল—'

'কোথায়? কোন্‌দিকে? কি নিয়েছে?'

'না, নেয় নি কিছু! নেবার মত সময় পায় নি। শব্দ শুনেই আমি উঠে পড়লাম যে! উত্তরের পাঁচিল টপকে শালা ধানমাঠে লাফিয়ে পড়ল—'

'ধানমাঠে? আচ্ছা দেখছি আমরা—'

এখন বর্ষাকাল। মাঠে ধানের চারা জল পেয়ে সবুজ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তেমন বড় হয় নি বলে আলপথ ঢাকা পড়ে নি। দু'দিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল। মাঠ ঘাট ভেজা ভেজা। জমির বুকে এখানে-ওখানে জল জমে আছে, কোথাও প্যাঁচপ্যাঁচে কাদা। চোর ধানমাঠে নেমে গেলেও খুব জোরে ছুটতে পারবে না ভেবে সরোজ-শিশির-কাজলেরা দল বেঁধে কিছুদূর এগিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে টর্চ ও লণ্ঠন হাতে গেল দু'একজন। ঘোষালমশাইও গেলেন পেছনে পেছনে। কিছুদূর গিয়ে হাঁক দিয়ে বললেন, 'জলেকাদায়

আর এগিও না তোমরা! একবার পালালে কি আর চোর ধরা যায় বাবা!'

আর মনে মনে স্ত্রীকে তিরস্কার করলেন। ভয়-কাতুরে মেয়েমানুষ সব! টিকটিকির ডাক শুনলে মূর্ছা যায়। কি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসল রাতদুপুরে! জলেকাদায় ছেলেগুলো না-হক নাজেহাল হচ্ছে!

'আর যেও না! ফিরে এসো তোমরা!' ঘোষালমশাই আবার হাঁক দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে সরোজ-শিশিরেরা ধানমাঠের আলেআলে বড়পুকুরের ধারে চলে গেছে। উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেলছে নিশিন্দার দিকে। কিছু দূরেই নিশিন্দাগ্রামের শেষ প্রান্ত। বাউড়িবাগ্‌দীডোমদের বাস ওখানে। ছোট ছোট মাটির ঘর, খড়ের চালা। ডাঙ্গাপল্লীর মানুষদের দৃঢ় সন্দেহ, ওই পাড়া থেকেই রাতদুপুরে চোরেরা উঠে আসে। কেননা ডাঙ্গাপল্লীর ঘরবাড়িউঠোন তাদের নখদর্পণে। দিনের বেলায় ওই পাড়া থেকেই মুনিষ খাটতে আসে তারা। নতুন বাড়ির ভিত্ কাটে, ইঁদারা কাটে, মিস্ত্রিকে ইটমশলার যোগান দেয়। গরুর গাড়িতে বালি পাথর চুণ বয়ে আনে, ঘরামির কাজ করে, খোয়া ভাঙে, লোহা বাঁকায়, বাঁশ খড় দড়ি বেচতে আসে। ওই পাড়া থেকেই ছুতোর মিস্ত্রি এসে দরজা জানালা বানায়। আবার ডাঙ্গাপল্লীর যে-বাবুদের বাসন মাজা, জল তোলা, কাপড় কাচার জন্য ঠিকে-ঝি রাখার ক্ষমতা আছে—তাদের বাড়িতে নানা বয়েসি মেয়েমানুষেরা কাজ করতে আসে ওই পাড়া থেকেই। ডাঙ্গাপল্লীর বাবুরা বলে 'নামুপাড়া' অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর পাড়া। ওই নামুপাড়ার মেয়েমরদেরা ডাঙ্গার বাবুদের ঘরের নাড়ী-নক্ষত্র জানে। কার বউ কি রকম গয়না পরে, কার ঘরে ক'টা কাঁসার বাসন, কার বাড়িতে ক'টা গরুছাগল, কার বাক্সপ্যাঁটরা কোন্ ঘরে কোন্ খাটের তলায় লুকনো থাকে—নামুপাড়ার ঠিকে-ঝিগুলো কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে সব খুঁটিয়ে দেখে যায়। ঘরে গিয়ে সুলুকসন্ধান দেয় মরদদের। মরদেরা আসে রাতের বেলা। মুনিষ খাটার সুবাদে তারা জানে বাবুদের গোয়ালঘর-রান্নাঘরের অবস্থান,

কোন্ দেয়াল কত ইঞ্চি মোটা করে গাঁথা, কোথায় কতটুকু মাটির গাঁথনি, কতটুকুই বা পাকা সিমেণ্টের। হিসেব করে শাবল চালায়, সিঁধ কাটে। ঠিক জায়গা থেকে পছন্দমত জিনিশটি তুলে নিয়ে যায়।

ডাঙ্গাপল্লীর বাবুরা নামুপাড়ার একটা মানুষকেও বিশ্বাস করে না। বলে, 'বাঁশঝাড়ের মত চোরের ঝাড় ওখানে। কচিকাঁচাবুড়ো মাগীমরদ সব চোর! পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোর!' বলে বটে, কিন্তু দিনের বেলা কাজের জন্য আবার ওদেরকেই ডাকতে হয়। এ ডাঙ্গাপল্লীতে মুনিষ-কামিনের কাজ, ঝি-চাকরের কাজ—ওরা ছাড়া আর কে করতে আসবে!

পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে সরোজ শিশিরেরা নামুপাডার দিকে টর্চের আলো ফেলে অকারণেই কিছু হাঁকডাক করে। তারপর ঢালু পাড় বেয়ে আবার সতর্কভঙ্গিতে নীচে নেমে আসতে থাকে। চোরের চিহ্ন মাত্র না পাওয়ায় তারা হতাশ এবং ক্রুদ্ধ হয়।

জটিল দাস বলে, 'আজও ধরা গেল না কোনো শালাকে!'

সরোজ বলে, 'হ্যাঁ, এমনি করে ধরা যায়! তোমার হাতে ধরা দেবে বলে চোরমশাই পুকুরপাড়ে পদ্মাসনে ধ্যানে বসে আছে আর কি!'

শিশির একটা শেয়ালকে লেজ তুলে পালাতে দেখে মুখে বিচিত্র শব্দ করে বলে, 'একবার একটাকে ধরতে পারলে চাকু দিয়ে কেটে লঙ্কা ভরে দেব শর'রে!'

জটিল দাস উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে, 'উঁহু ওতে হবে না। দু'দিন পরে ভাল হয়ে ফের সিঁধ কাটতে আসবে। ধরতে পারলে শালার হাত দু'খানা পাথরে রেখে দশ আঙ্গুল হাতুড়ি দিয়ে ছেঁচে মিহি বালির মত গুঁড়ো করে দেব—যেন শালা আর জন্মে কিছু ধরতে ছুঁতে না পারে!'

থানা-পুলিশে দেবার কথা কেউ ভুলেও বলে না। এ বিষয়ে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মেছে তাদের। শিশিরের বাড়িতে দু'বার

চুরি হয়েছে। জটিল দাসের বাড়িতেও দু'বার। একবার তার যথা সর্বস্ব গিয়েছে। এমন কি তেলচিট্ গামছাখানা পর্যন্ত। শহরে একখানা ছোট দোকান আছে জটিল দাসের। চা বিস্কুট সাবান তেল বিক্রি হয়। মাল কেনার জন্য মাসে একবার কলকাতা যায় সে। ঘরে থাকে বউ বাচ্চা। জটিল বুধবার রাত্রের ট্রেনে যায়, বৃহস্পতিবার রাত্রে ফিরে আসে। ওই সময়টুকু দোকান বন্ধ থাকে তার। বছর পাঁচেক আগে ওই মাল আনতেই কলকাতা গিয়েছিল জটিল। কচি বউটা তখন দশমাসের ভরা পোয়াতি। একা ঘরে রেখে যাওয়ার সাহস পায় নি। নিশিন্দায় বড় শালীর বাড়ি পাঠিয়ে দরজায় শক্ত তালা ঝুলিয়ে গিয়েছিল। পরের দিন কলকাতা থেকে ফিরে দেখে ঘর-দরজা বেবাক সাফ্। দু একটা ছেঁড়া কাঁথা-কানি ছাড়া আর পড়ে নেই কিছুই। বিয়ের নতুন বাসনকোসন, পুরনো থালাবাটি, জামাকাপড়, লেপতোষক, রান্নার হাঁড়িকড়াই —দু'হাতে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে সব। ঘরের খাঁ খাঁ অবস্থা দেখে জটিল দাস হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে। পাড়ার লোকেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে যায়। জটিল ফিরেছে শুনে ঘোষালমশাইও ছুটে আসেন। তার কাঁধে হাত রেখে বোঝানোর চেষ্টা করেন, 'কাঁদ কেন, জটিল। তুমি না পুরুষমানুষ! জিনিশ গেছে আবার জিনিশ হবে। কপাল তো নিয়ে যায় নি সঙ্গে।'

জটিল ভাঙ্গা গলায় বলে, 'বাড়ি করতে গিয়ে আমি যে ধারে দেনায় ডুবে আছি মেসোমশাই। কি দিয়ে কি কিনব!'

ঘোষালমশাই বলেন, 'হবে। সব হবে। এত ভেঙ্গে পড়ো না তুমি।' তারপর অল্পকাল চুপ করে থেকে ঘর-দরজার অবস্থা দেখে বলেন, 'আজ রাতে আমার ঘরেই চাট্টি খাও জটিল। খেয়ে এসে শুয়ে থাক। কাল সকালে বৌমাকে এনে ভেবেচিন্তে যা-হয় করবে।'

কিন্তু জটিলের কান্না থামে না। তার রাতজাগা চোখ, উস্কো-খুস্কো চুল, ভাঙাচোরা কালো রোগা বিপর্যস্ত চেহারা—যেন ঘরে ফিরে ছেলে-বউকে মড়ার খাটিয়ায় শোয়ানো দেখছে সে, এমন কাতর

আকুল ভঙ্গিতে কাঁদতেই থাকে। সেই জটিল দাস চোরের হাত তো পাথরে ছেঁচে গুঁড়ো করতে চাইবেই।

ধানমাঠ ভেঙে আবার ঘোষালমশায়ের বাড়ির কাছে উঠে এল সরোজ শিশিরেরা। ঠিক এইসময় নতুন ছয় ব্যাটারীর জোরালো একটা টর্চের আলো ধানমাঠের বুকে তীর গতিতে ছুটে এসে পড়ল। এক জায়গায় কিছুক্ষণ স্থির থেকে তারপর উজ্জ্বল পরিষ্কার আলোর ছটা চারদিকে বৃত্তাকারে পাক খেতে লাগল। ধানমাঠ থেকে কখনো উঠে গেল পুকুরপাড়ে পাকুড়গাছের মাথায়, কখনো ডানপাশে কবরখানার দিকে। একটু পরেই তীব্র আলোর ঝলক ঘোষালমশায়ের ঘরদরজা আলোকিত করে সরোজ-কাজল-শিশিরের মুখের উপর পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা ভারি গলাও শোনা গেল—'কি? কি হয়েছে ওদিকে? এত গোলমাল কিসের?'

সরোজ শিশিরেরা সবাই অপ্রসন্ন কঠিন মুখে ঘুরে তাকাল। কাজল চাপাগলায় বলল, 'এতক্ষণে জমিদারবাবুর টনক নড়েছে।'

উৎপল ঠোঁট কামড়ে বলল, 'শালা লাটসাহেবের জামাই।'

সরোজ বলল, 'নেমে আসতে পারে না। ছাদে দাঁড়িয়ে মোড়লি মারা হচ্ছে।'

শিশির বলল, 'নামবে কোন্ দুঃখে। ওর শক্তপোক্ত দোতলা বাড়ি। বারান্দায় গ্রীল, জানালায় গ্রীল, সিঁড়ির মুখে কোলাপ্-সেবল্ গেট···ওর তো চোরের ভয় নেই।'

কাজল বলল, 'আসল কথাটাই তো চেপে গেলে শিশিরদা। বল, কাকের মাংস কাকে খায় না।'

জটিল ইঙ্গিতটা ধরতে পারল না। তার অত বুদ্ধি নেই। পড়াশুনাও তেমন নেই। শহরে দোকানদারি করে। নিজের ব্যবসার ভালমন্দটুকুই শুধু বোঝে। সে বোকার মত বলল, 'নগেনবাবু কাক হতে যাবেন কোন্ দুঃখে, আমাদের কাকের পাড়ায় তিনি হলেন গিয়ে ময়ূর। জমিজমাবাড়িঘরপুকুর নিয়ে কেমন পেখম ছড়িয়ে আছেন।

সিমেণ্ট লোহার ব্যবসাখানাও বেশ জাঁকালো হয়ে উঠছে দিনকে দিন—'

কাজল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'জটিলদা, তোমার ঘরের ছাদ ঢালাইয়ের সময় পাঁচবস্তা সিমেণ্ট ব্ল্যাকে কেনো নি? কার কাছ থেকে কিনেছিলে?'

জটিল বলল, 'কিনেছিলাম। ওই নগেনবাবুর গদী থেকেই কিনেছিলাম—'

'বস্তা পিছু কত বেশি দিয়েছিলে?'

'সাত আট টাকা হবে।'

'বস্তা পুরো ছিল, না আধা?'

'তা, অনেকটাই খালি ছিল রে ভাই।'

'তাহলে একবস্তার দাম কত পড়ল হিসেব করে দেখেছ?'

জটিলের হিসেবি বুদ্ধি টনটনে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'দেখেছি, তিনগুণেরও বেশি।'

'তাহলে নগেনবাবু ময়ূর হ'ল কি করে।'

কাজলের কথা বলার ভঙ্গিতে সরোজ উৎপলেরা শব্দ করে হেসে উঠল। জটিলও মত পাল্টে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে, 'ঠিক বলেছ, ময়ূর না, শেয়াল। মুখটা দেখো নি, শেয়ালের মত কেমন লম্বা আর ছুঁচ্‌লো—'

দূরবর্তী দোতলার ছাদ থেকে ছয় ব্যাটারীর টর্চের আলো আবার ঘুরে এসে পড়ল ওদের শরীরে। জটিল একটু সঙ্কুচিত হয়ে কাজল-উৎপলের পেছনে সরে গেল। নগেনবাবুর মত মান্য লোককে শেয়াল-টেয়াল বলে এখন একটু ভয় পেয়ে গেছে। হাজার হোক সে একজন ছোট দোকানদার। তার মুখে কি ওসব কথা মানায়। টর্চের আলোতে নগেনবাবু যদি মুখ দেখে কথাগুলো আন্দাজ করে ফেলেন!

দোতলা থেকে নগেন আবার ভারি গলায় হাঁক দিলেন, 'তোমরা কারা ওখানে? সাড়া দিচ্ছ না কেন?'

এবার ঘোষালমশাই ক'পা এগিয়ে এসে উঁচু গলায় জবাব দিলেন, 'পাড়ার ছেলেরা। চোর ধরতে বেরিয়েছে।'

'চোর ধরতে? তা, জালে পড়ল কিছু?'

ঘোষালমশাই বললেন, 'না, পড়ে নি। ওই হয়রানিই সার। যান, আপনি ঘুমুতে যান।'

ছাদের উপর থেকে আর কোনো উত্তর শোনা গেল না। টর্চও নিভে গেল। সম্ভবত নগেন চৌধুরী ঘুমুতেই গেলেন।

ঘোষালমশাই আকাশের দিকে তাকালেন। তারাগুলো দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে। মনে হ'ল, ভোর হতে খুব বেশি দেরি নেই। চোরেরা তো ভোররাতেই চুরি করতে বের হয়। কিন্তু চোর কি সত্যি এসেছিল তাঁর বাড়িতে? কাজল-উৎপল-সরোজের ঘুম-ভাঙ্গা এলোমেলো শরীরগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার বিব্রত বোধ করলেন ঘোষালমশাই। বললেন, 'যাও, যে যার ঘরে গিয়ে ফের একটু গড়িয়ে নাও গে তোমরা। একটু পরেই তো অপিস-আদালতে ছুটতে হবে—'

সরোজ বলল, 'হ্যাঁ, এখনো দু'তিন ঘণ্টা নিশ্চিন্তে ঘুমুনো যাবে। আমি চললাম।'

কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে সে বাড়ির দিকে হাঁটা ধরল। ঠিক এই সময় শিমূলতলার নিমুদের বাড়ির ও-পাশ থেকে একটা লোক এল ছুটতে ছুটতে। বেঁটেখাটো শরীর, ছোট করে ছাঁটা চুল, উদোম গা, খাকি রঙের ঢোলা হাফ্‌প্যান্ট পরণে। নাম সিদ্ধেশ্বর। সরকারি জীপ-গাড়ি চালায়। তাকে ওভাবে ছুটে আসতে দেখে ঘরমুখো দলটা আবার থমকে দাঁড়াল।

সিদ্ধেশ্বর আরো কাছে এগিয়েএসে ছটফটে গলায় বলল, 'আলো দেখে ছুটে এলাম। আমার সাইকেলটা চুরি হয়ে গেছে—'

সিদ্ধেশ্বরের কথা শুনে সবাই চমকে উঠল। তাহলে চোর তো খালি হাতে ফিরে যায় নি পাড়া থেকে। ঘোষালমশাই কোথায় যেন একটু জোর পেলেন। তাঁর মনের কুণ্ঠিত বিব্রত ভাবটুকু দূর হয়ে গেল

মুহূর্তেই। তাঁর বাড়িতে না আসুক, চোর তো এসেছিল পাড়ায়! তিনি সহসা ভারি উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দেখলে সরোজ! দেখলে কাজল! দেখলে কাণ্ডখানা! ওরা দল বেঁধে এসেছিল। দু'তিন বাড়ি হানা দিয়েছে, আমি ভুল দেখি নি, একটা কিছু ঠিক লাফিয়ে পড়েছে পাঁচিল থেকে—'

সিদ্ধেশ্বর কাঁদ কাঁদ মুখে বলল, 'আমার নতুন সাইকেলখানা বাবু—'

কাজল-উৎপলেরা সিদ্ধেশ্বরের কাছে এগিয়ে এসে লণ্ঠন তুলে তার মুখে আলো ফেলল। রাতের বেলা দেশী মদ খেয়ে সিদ্ধেশ্বর বেহুঁস থাকে, একথা পাড়ার সবাই জানে। এখনো মদের ঘোরে তার চোখ জড়ানো, মুখ দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে। মাতালের কথার ঠিক কি! সরকারি জীপ গ্যারেজে ঢুকিয়ে রাতে ফিরে এসে সাইকেল কোথায় রাখতে কোথায় রেখেছে—তার নিজেরই কি খেয়াল আছে! সরোজ উৎপলেরা তাকে রীতিমত জেরা শুরু করল, 'সাইকেল কোথায় রেখেছিলে তুমি?'

সিদ্ধেশ্বর বলল, 'ঘরেই তো ঢুকিয়েছিলাম!'

'ঠিক মনে আছে?'

'ঠিক!'

'ঘরে ঢুকিয়ে তালা মেরেছিলে?'

'মেরেছিলাম। রোজই মারি।'

'চাবি কই?'

সিদ্ধেশ্বর প্যাণ্টের পকেট থেকে চাবি বের করল—'এই যে! পকেটে নিয়েই শুয়ে পড়েছিলাম।'

'চোর ঘরে ঢুকল কি করে? খিল খুলেছে? ছিটকিনি?'

সিদ্ধেশ্বর ঘাড় নাড়ল, 'না। আমি খিল খুলে এসেছি!'

সরোজ চাপাগলায় তাকে ধমকাল, 'তাহলে চোর ঘরে ঢুকবে কি করে? দেয়াল কেটে ঢুকলেও তো আগে দরজা খুলবে, তারপর সাইকেল বের করবে। না কি?'

উৎপল বলল, 'ঠিকই তো! সাইকেল তুমি ঘরে তোলো নি সিদ্ধেশ্বর। উঠোনেই ফেলে রেখেছিলে—'

সিদ্ধেশ্বর কেমন বিভ্রান্তের মত তাকাল। যেন রাতের নেশা কাটিয়ে সে মনে করার চেষ্টা করল—উঠোনে ইঁদারার গায়ে ঠেসিয়ে-রাখা সাইকেলটা রাতের বেলা শোবার সময় সে সত্যি সত্যি ঘরে তুলেছিল কিনা! নাকি তালা লাগিয়ে শুধু চাবিটাই পকেটে ঢুকিয়ে ঘরে শুয়ে পড়েছিল!

সিদ্ধেশ্বর এ পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা নয়। জমি কিনে সে বাড়ি করে নি। নগেনবাবু একটা প্লটে ছোট ছোট কয়েকখানা ঘর বানিয়েছেন। তারই একটায় ভাড়া থাকে। বছর সাতেক ভাড়ায় আছে বলে পাড়ার লোকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। পাড়ার কাজেকর্মে খাটাখাটুনি করে খুব। দুর্গাপূজার সময় বাঁশ পোঁতা, ত্রিপল খাটানো থেকে শুরু করে রাস্তার গর্ত ভরাট করা, নালা কেটে জল বের করা, সব কাজেই তাকে পাওয়া যায়। কখনো-সখনো সরকারি জীপ্-গাড়িখানাও পাড়ায় নিয়ে আসে। তাতে কারো সিমেন্টের বস্তা, কারো মেয়ের বিয়ের বাজার, কারো নতুন-কেনা আল্না-টেবিল-চেয়ারও বয়ে এনে দেয়। প্রায় সব কাজেই পাড়ার লোকের উপকারে লাগে বলে সিদ্ধেশ্বরকে ভালবাসে সবাই।

সিদ্ধেশ্বরের কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার কিছু বোঝা যাচ্ছে না দেখে কাজল বলল, 'সরোজদা চল, ওর বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে আসি।'

সরোজ তাতে সায় দিল। উৎপলও বলল, 'না দেখলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। চল যাই—'

ঘোষালমশাই বলে উঠলেন, 'আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে!'

কাজল বলল, 'না মেসোমশাই। আপনার গিয়ে কাজ নেই। আমরা এসে খবর দিয়ে যাব।'

জটিল চাপাগলায় বলল, 'যত মাতালের কাণ্ড! আপনি গিয়ে কি করবেন? যান, শুয়ে পড়ুন গে—'

ঘোষালমশাইকে একরকম জোর করেই ঘরে পাঠিয়ে দিল ওরা।

তারপর এগিয়ে গেল সিদ্ধেশ্বরের বাসার দিকে। ততক্ষণে পুবের আকাশ স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। এখানে ওখানে কাক ডাকছে। নগেনবাবুর বাড়ির উঠোন থেকে পুষ্ট মোরগগুলোর উচ্চকণ্ঠের ডাকও শোনা যাচ্ছে। সদানন্দের পিসী মাঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে পুকুরে ডুব-স্নানের জন্য গামছা কাঁধে ধানক্ষেতের আল ধরে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে।

ঘোষালমশাই আর শুতে গেলেন না। নিজের ঘরের বাইরের বারান্দাটুকুতে এসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসলেন। তাঁর স্ত্রী স্নেহলতা আর মেয়েরাও জেগে ছিল। এমনিতেই খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস তাদের। আজ গোলমালে শেষরাতে উঠে পড়তে হয়েছে বলে ঘর-সংসারের কাজ ফেলে আর তো শুয়ে থাকা যায় না। স্নেহলতা স্বামীর কাছে এসে বসলেন। সেজ মেয়ে পারুল রাতের বাসি বিছানাপত্র তুলতে লাগল। ছোট মেয়ে গেল কুয়োতলায় জল তুলতে। ঘোষালমশায়ের ঘরে কাজের লোক আসে না। ঝি-চাকর রাখার ক্ষমতা তাঁর নেই। মেয়ে-বউরাই সব কাজ করে। শুধু নিশিন্দার ঘোষপাড়া থেকে জটা গোয়ালা আসে গরুর দুধ দুইতে। এ কাজটাও ঘোষালমশাই পারেন না এমন নয়, কিন্তু জটাধারীকে রাখা হয়েছে অন্য কারণে। এখন দুটো গরু আছে তাঁর। সের পাঁচেক দুধ হয়। ঘরের জন্য সেরখানেক রেখে বাকিটা বিক্রি করে দেন তিনি। ওই জটা গোয়ালাই দুধ কিনে নিয়ে যায়। ওর ভাইয়ের ছোটখাটো একটা মিষ্টির দোকান আছে সিনেমাহলের গায়ে। দুধ দোয়ানোর জন্য ঘোষালমশাই তাকে বাড়তি পয়সা দেন না। দুধের দামের সঙ্গে হিসেব করে কিছু বাদ দিয়ে দেন। তাঁর নিজের পক্ষে তো হাটে দুধ বিক্রি করতে যাওয়া সম্ভব না। দুটো মেয়ের বদলে ঘরে একটা ছেলে থাকলে হয়ত এই পয়সাটুকুও বাঁচানোর চেষ্টা করতেন ঘোষালমশাই।

স্নেহলতা তার পাশে বসলে তিনি একবার ঘুরে তাকালেন। রাতদুপুরে অকারণে চেঁচিয়ে ওঠার জন্য এখন আর স্ত্রীর উপর রাগ

নেই তাঁর। বরং নিস্তেজ নিরুত্তাপ গলায় বললেন, 'ডাঙা-পল্লীতে যখন দু-একখানা ঘর ছিল—তখন চুরিচামারি হত, সে এক কথা। কিন্তু এখন এতগুলো ঘর, এত মানুষ, তবু তো নিশ্চিন্তে একটু ঘুমুনো যায় না।'

স্নেহলতা বললেন, 'রাতদুপুরে দরজা খোলা দেখে আমার বুকের রক্ত তো হিম হয়ে গেছল।'

ঘোষালমশাই বললেন, 'মেয়েমানুষের কাণ্ড। পাতা নড়লেই মূর্ছা যায়।'

স্নেহলতা অনুযোগ করলেন, 'তুমি একলা আর বাইরে যাবে না।'

ঘোষালমশাই বললেন, 'কেন? কি হবে? ভয় কিসের? খালি হাতে তো যাই নি!'

পারুল বাইরে এসে দাঁড়াল এইসময়, 'বাবা, তুমি চোরটাকে দেখেছিলে?'

ঘোষালমশাই একটু থমকে গিয়ে বললেন, 'ঠিক দেখি নি, তবে সন্দেহ হল, পাঁচিলের উপর যেন বসেছিল—'

'মিস্ত্রি লাগিয়ে পাঁচিলের মাথায় কাঁচের টুকরো গেঁথে দাও বাবা। নগেনবাবুর মত—'

'তা দিলে হয়। কিন্তু সে তো মাটিতে হবে না, সিমেণ্ট চাই! একবস্তা সিমেণ্ট এখন ব্ল্যাকে বত্রিশ টাকা—'

টাকাপয়সার কথা ওঠায় পারুল চুপ করে গেল। তার বয়স সতেরো-আঠারো হলে কি হয় সংসারের আয়ব্যয়ের হিসেব সে বোঝে।

বাইরের আকাশে আস্তে আস্তে সূর্য উঠতে লাগল। তার কোমল রক্তিম আভা গাছপালার মাথায় ছড়িয়ে পড়ল। বাড়ির সামনে পর পর কয়েকটা নারকেল গাছ লাগিয়েছেন ঘোষালমশাই। গাছগুলো এখন বড় হয়ে উঠেছে। দু'একটাতে ফল ধরে। তার মাথায় চিকন সবুজ পাতার বুকে ভোরের আলোর ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে ঘোষালমশাই একটু বিষণ্ণভাবে বললেন, 'ক'বস্তা সিমেণ্ট যোগাড়

করতে পারলে রান্নাঘরের ছাদখানাই তো ঢালাই করে ফেলতাম মা। খড় কিনে কিনে আর পারি না।'

পারুল এ-কথার কোনো উত্তর দিল না, বলল, 'তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও বাবা—আমি চা করতে যাচ্ছি।'

একটু পরেই কাজল ফিরে আসে। একা। মুখখানা থমথমে।

ঘোষালমশাই বলেন, 'কি হ'ল্ বাবা?'

কাজল বলে, 'সাইকেলটা সত্যি চুরি গেছে মেসোমশাই। ভুল করে উঠোনে রেখে দিয়েছিল—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'ওর বউ ছিল না ঘরে? সে-ও কি নেশা করেছিল নাকি। বাইরে অতবড় একটা জিনিশ পড়ে থাকল—'

কাজল বলে, 'সেও খেয়াল করে নি। এখন কপাল চাপড়াচ্ছে। বলে, ওর জমানো টাকাপয়সা সব ভেঙ্গেই সাইকেলখানা নাকি কিনেছিল সিদ্ধেশ্বর—'

স্নেহলতা সব শুনে হঠাৎ বলে ওঠেন, 'তোমরা আবার রাত-পাহারাটা চালু কর কাজল। আমরা বুড়োবুড়ীরা একটু নিশ্চিন্তে ঘুমুই।'

'রাত-পাহারা?' কাজল ঘাড় নাড়ে, 'ও আর চলবে না মাসীমা। কেউ বেরুতেই চায় না।'

ঘোষালমশাইও বলেন, 'কথাটা মন্দ না, আর একবার দেখো না চেষ্টা করে।'

কাজল চুপ করে দাঁত দিয়ে ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখ খোঁটে।

ক'বছর আগে যেবার জটিল দাসের বাড়ি থেকে সর্বস্ব চুরি যায়—সেবার ক'দিনের জন্য নাইট গার্ডের একটা দল তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দিন সাতেক পরেই সেটা উঠে যায়। তারপর কারো ঘরে চুরি হলে কথাটা আবার তোলা হয়—কিন্তু কাজ হয় না। রাত জাগার লোক জোটে না। ঘোষালমশাই এসব জানেন। ডাঙ্গার সব চেয়ে বড় বাড়িখানা নগেনবাবুর হলে কি হয়—ঘোষালমশাই

হলেন পাড়ার আদি বাসিন্দা। বয়সেও সকলের জ্যেষ্ঠ। তিনিই এ-পাড়ার অলিখিত অভিভাবক। তাঁর সঙ্গে শলা-পরামর্শ না করে পাড়ায় কোনো কাজ হয় না।

অল্পকাল চুপ করে থেকে কাজল বলে, 'আপনি আরেকবার কথাটা তুলুন মেসোমশাই। সন্ধ্যাবেলায় আমি না হয় ক'জনকে ডাকি এখানে—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'তা সরোজ শিশিরদের ডাকো। একবার জিজ্ঞেস করে দেখি। যা দিনকাল, নিজেদের ঘরদরজা নিজেরা না সামলালে কে সামলাবে? এই যে সিদ্ধেশ্বরের সাইকেলখানা চলে গেল, আর কি পারবে কিনতে?'

কথা বলার মাঝখানেই পেতলের বালতি হাতে জটাধারী এসে দাঁড়ায়। রোগা কালো চেহারা। মাথায় জটা। গলায় তুলসীর মালা। তাকে আসতে দেখে ঘোষালমশাই উঠে পড়েন। গোয়ালঘরের তালা খুলে দেবেন তিনি। গরুদুটোকে আদর করে বাইরে আনবেন। জটাধারীর দুধ দোয়ানো হয়ে গেলে কাঁসার আধসেরী গ্লাসে মাপ বুঝে নেবেন এটা তাঁর প্রতিদিনের কাজ। তারপর ধানমাঠের ধারে কচিঘাসের জায়গা খুঁজে খুঁটি পুঁতে গরুদুটো বেঁধে রেখে আসবেন। পালে গরু চরতে দেন না তিনি। যতটা পারেন নিজেই দড়ি ধরে চরিয়ে আনেন। ডাঙ্গাপল্লীর চারদিকেই খোলা মাঠ। এখন বর্ষার মরসুমে ঘাসের তেমন অভাব নেই। পালে গরু দিলে পয়সা গুনতে হয় বাগালকে। গোবরটুকুও লোকসান যায়। একপণ ঘুঁটের দামও এখন চার পাঁচ আনা। ঘোষালমশাই সবদিকে নজর রেখে সংসার চালান।

তিনি উঠে গেলে কাজল ঘরের মধ্যে ঢুকল। সে এ-বাড়ির ছেলের মত। কোথাও তার কোনো সঙ্কোচ নেই। তার বয়স বাইশ তেইশ। মাথায় ঘন কালো চুল, উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, লম্বা পাতলা গড়নের শরীর। বছর তিন-চার আগে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ দিয়ে চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করে একটা বছর নষ্ট করেছে

সে। এখনও সারাদিন এখানে ওখানে চাকরির খোঁজ করে আর সন্ধ্যায় কলেজে কমার্স পড়তে যায়। ঘোষালমশায়ের বাড়ির অল্প কিছু দূরেই তাদের ঘর। কাজলের বাবা সেই কোন্ শৈশবেই মারা গেছেন। মা সদর হাসপাতালের নার্স। এখনও চাকরি করেন। তিনি দু'কাঠার একটু জায়গা কিনেছিলেন। ঘোষালমশাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর দেড়খানা ঘর তুলে দিয়েছেন। তাঁর নিজের বাড়ির রান্নাঘর-গোয়ালঘরের কাজ কিছুদিন আগে শেষ হয়েছে। বাঁশ পাটা দড়ি যা কিছু বেঁচেছিল—কাজলের মাকে দিয়েছিলেন তিনি। রোদে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রি-মুনিষের কাজ তদারকি করেছিলেন। কাজল তখন এতটুকু। বই খাতা বগলে হাফপ্যান্ট পরে স্কুলে যায়। তার বোনটা তো বলতে গেলে দাঁড়াতেই শেখে নি। আসলে ওইটুকু কচিকাঁচা বাচ্চা নিয়ে বিধবা হওয়ায় কাজলের মা সুলেখার উপর কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল ঘোষাল-মশায়ের। সুলেখাও মানুষ চিনেছিলেন। সঞ্চিত টাকাপয়সা ঘোষালমশায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি মেয়েমানুষ, হিসেবের কি বুঝি! আপনি দেখেশুনে খরচ করুন দাদা।' তা ঘোষালমশাই-ই সব করতেন। দরখাস্ত লিখে সিমেন্টের পারমিট আনতেন, ইটভাঁটিতে গিয়ে ইটের দরদাম করে ইট কিনে দাম দিতেন, বেলা শেষে মিস্ত্রি-মজুরের পাওনা মেটাতেন। স্নেহ-লতাকে বলতেন, 'এ বেহ্মডাঙ্গায় বাড়ি তুলতে ডাক্তার আসবে না তো কোনোদিন। নার্সই আসুক। তবু রোগে শোকে একটা বল হয়।'

কখনো বলতেন, 'ঠিকমত ট্রেনিং-পাওয়া নার্সেরা ডাক্তারের কান কাটতে পারে। বহরমপুরের হাসপাতালে তো ছিলাম দু'মাস, সব জানা আছে আমার।'

অবসর সময়ে কাজলকে তিনি পড়াতেও বসতেন। পুরনো আমলের মানুষ। অঙ্ক বাংলা সংস্কৃত সবই জানেন কিছু কিছু। বিশেষত ইংরেজিতে যথেষ্ট জ্ঞান আছে তাঁর। কর্মজীবনে সরকারি

অফিসে ইংরেজিতে নোট্ লিখে লিখে হাত পাকা হয়ে উঠেছে। এ পাড়ার যার যত দরখাস্ত এখনো ঘোষালমশাই লিখে দেন। নগেন চৌধুরী পয়সাওলা হলে কি হয় তার পেটে বিদ্যে তো ঢু-ঢু! তাকে সবাই সমীহ করে কিন্তু শ্রদ্ধা করে ঘোষালমশাইকেই।

কাজলের মা ঘোষালমশাইকে ডাকেন 'দাদা' বলে। ভাইফোঁটার দিন স্নান করে কাঁসার রেকাবিতে নাড়ু তক্তিসন্দেশ সাজিয়ে ফোঁটা দিতে আসেন। সঙ্গে নতুন একখানা ধুতিও আনেন। তাঁর কৃতজ্ঞ চিত্তের সামান্য প্রতিদান। ঘোষালমশাই বারণ করলেও শোনেন না। সেই ধুতিখানা পরে দুপুরবেলা কাজলের মা'র বাড়িতে খেতে যেতে হয় তাঁকে। সুলেখা নিজের হাতে দশ বারো রকমের পদ রান্না করেন সেদিন। মোচার ঘণ্ট, এঁচোড়ের ডালনা, ছানার তরকারী. মাছ, মাংস, দই। ঘোষালমশাই খুব বকাবকি করেন কিন্তু খেয়েও ফেলেন সব। আজ দশবারো বছর এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নি।

কিন্তু কাজলের মা 'দাদা' বললে কি হয়, কাজল 'মামা' বলে না ঘোষালমশাইকে। পাড়ার আর দশজনের মত বলে 'মেসোমশাই'। ঘোষালমশাই এ-পাড়ার একরকম সর্বজনীন মেসোমশাই!

বালককাল থেকেই এ-বাড়িতে কাজলের একটা অতিরিক্ত অধিকার সাব্যস্ত হয়ে গেছে। ফলে শোবার ঘর থেকে রান্নাঘর কোথাও যেতে-আসতে বাধা নেই তার। সে সটান চলে এল রান্নাঘরে। সেখানে পারুল উনুনে আঁচ দিয়ে চায়ের কেট্‌লি বসিয়েছে। উনুন থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে অল্প অল্প. কালো কয়লার বুকে লাল আঁচের ঝিকুনিও দেখা যাচ্ছে। পারুলের পরনে লালরঙের ডুরে শাড়ি। শাড়ির নীচে সায়া নেই। গায়ে ছোট ব্লাউজ। এক পিঠ চুল এলোমেলো। ফর্সারঙের গোলছাঁদের মুখখানা সকাল বেলায় দিব্যি স্নিগ্ধ এবং সতেজ দেখাচ্ছে। কাজল জানে, ঘোষালমশায়ের ঘর-সংসারের আসল গৃহিণী এখন পারুল। স্নেহলতা বাতব্যাধিতে

পঙ্গু। বিশেষ করে ডানহাতখানা দিয়ে কোনো ভারি কাজই করতে পারেন না। সংসারের সব দায়দায়িত্ব তাই পারুলের ঘাড়ে। ওই সংসারের চাপে স্কুলের সীমানা ডিঙিয়ে আর কলেজে ঢোকা হয় নি তার। সে সামর্থ্যও অবশ্য ঘোষালমশায়ের নেই। পারুলেরও তার জন্য কোনো দুঃখ আছে বলে মনে হয় না। ঘর-সংসারের কর্তৃত্ব করতে তার বেশ ভালই লাগে।

কাজল ঘরে ঢুকে বলে, 'আমায় একটু চা দিবি পারু?'

পারুল নীচু হয়ে বসে কাপডিস সাজাচ্ছিল। কাজলের কথায় মুখ তুলে চোখের ভুরু টান করে তাকায়। মুখখানা ভারিক্কি গোছের করে বলে, 'বীরপুরুষদের চোর ধরার পাট চুকল?'

কাজল বলে, 'ঠাট্টা করিস না। ধরব, একদিন ঠিক ধরব!'

পারুল বলে, 'ছাই ধরবে তোমরা!'

কাজল বলে, 'সাতসকালে মুখ-ঝামটা দিতে শুরু করলি কেন। দে, চা দে।'

পারুল কেট্‌লির মুখ খুলে আর একটু জল ঢালতে ঢালতে বলে, 'উঁহু, তোমাকে চা দেওয়া হবে না।'

কাজল অবাক হওয়ার ভাণ করে, 'কেন, অপরাধটা কি করলাম?'

'পরশু বিকেলে তোমাকে চিনি খুঁজে আনতে বলেছিলাম, এনেছ?'

'চিনি?' কাজল ঠোঁট উল্টায়, 'তারে চিনি না, আমি চিনি না, সখি!...মানে তার খোঁজ পাই না!'

তার কথা বলার ঢঙে পারুল হেসে ফেলে। গভীর শ্যামল মুখে চিকন সরু সাদা দাঁতের হাসি কাজলের ভারি মিষ্টি লাগে। এইটুকু মেয়ে দেখতে দেখতে তার চোখের সামনে কত বড় হয়ে গেল। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরল। শ্লেটের মত সমান বুক পদ্মফুলের ডাঁটালো কুঁড়ির মত ফুটন্ত রূপ ধরে ঢেউ খেলে উঁচু হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টিতে চকিত চঞ্চল লজ্জার শিহরণ জাগল। হাতেপায়ে এল কোমল-মাংসের পেলবতা।

কাজল একদৃষ্টে পারুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,

'সত্যি বলছি, কাল অনেক খুঁজেছি! আমাদের ঘরেও চিনি নেই। মা স্যাকারিনের বড়ি নিয়ে এসেছে হাসপাতাল থেকে। তোরা নিবি?'

পারুল বলল, 'ধুৎ, স্যাকারিনে আবার চা হয়! মুখ তেতো লাগে। তার চেয়ে গুড়ের চা ভাল—'

'তা গুড়ের চা-ই কর না। দুটো তেজপাতা ফুটিয়ে নে জলে। গুড়ের গন্ধ ঢাকা পড়ে যাবে।...ভাল গুড় এনে দেব নিশিন্দার হাট থেকে?'

পারুল বলে, 'তাই আনবে। আমার চিনির স্টক আজকেই শেষ। ও বেলা থেকে গুড়ের চা!'

পারুল চা বানিয়ে এক কাপ কাজলের হাতে তুলে দেয়। কাজল বাইরে চলে আসে।

ঘোষালমশায়ের বাড়িতে ছেলে নেই। হাটবাজারের অনেক কাজ কাজলকেই করতে হয়। বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্য জিনিশ খুঁজে আনা বুড়োমানুষের কর্ম নয়। পারুল ছোট বোনকে নিয়ে মাঝে-মধ্যে বাজারে যায়—সংসারের তেল সাবান চা বিস্কুট কিনে আনে। ঘোষালমশাই কাঁচা-বাজারে যান কখনো-সখনো। সেদিন বাড়িতে মাছ আসে। বাকি অনেক জিনিশ ঘরে বসেই পাওয়া যায়। নিশিন্দার চাষী-বউরা ডিম বিক্রি করতে আসে—ডিমের সঙ্গে দু একটা লাউকুমড়োও থাকে। মুড়িওলা মুড়ি দিয়ে যায়। বললে, চালও নিয়ে আসে। জটাধারীকে বললে, ক্ষেতের আলু পেঁয়াজ এনে দেয়। দুধের দাম থেকে দাম কাটা যায়। ঘোষালমশায়ের সংসার এমনি করেই চলে। এর মধ্যে যখন যে-টুকুর অভাব ঘটে তা পূরণ করার জন্য আছে কাজল। এখন নিজের ছেলের চেয়েও সে এই পরিবারের বড় অবলম্বন। বুড়ো বাপ মা মরল কি বাঁচল পেটের ছেলে তো খোঁজও নেয় না!

সকালে বাজারে যাওয়ার সময় সাইকেল নিয়ে একবার এ-বাড়িতে ঢুঁ দিয়ে যায় সে। নামে না, সীটে বসে মাটিতে এক পা ঠেকিয়ে

ক্রীং ক্রীং শব্দে বেল বাজায়। এ শব্দের অর্থ বাড়ির সকলেই বোঝে। স্নেহলতা বলেন, 'ও পারু, ওই দেখ, কাজল বাজারে যাচ্ছে।'

পারুল বলে, 'দাঁড়াতে বল মা। নুন আনতে হবে, গুঁড়োমশলা আনতে হবে।'

পারুল বাজারের থলে আর পয়সা এনে কাজলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'বাবার জন্য একতাড়া বিড়িও আনবে মনে করে। এনে চুপি চুপি আমার হাতে দেবে।'

কাজল বলে, 'চুপি চুপি কেন? তুই-ও লুকিয়ে দু'একটা খাস নাকি আজকাল?'

পারুল ভুরু কুঁচকে বলে, 'খেলে দোষ কি? কামিনেরা খায় না?'

'তুই কি কামিন?'

'তবে কি রাজকুমারী? দুধে পা ধুয়ে সোনার পালঙ্কে শুয়ে থাকি? রান্না করা থেকে ঘুঁটে দেওয়া কোন্ কাজটা না করি আমি?'

কাজল হেসে ফেলে, 'বাব্বাঃ, কথা শিখেছিস খুব!'

পারুল বলে, 'শিখলে দোষ কি! কথা শেখার জন্য তো আর পয়সা খরচ হয় না!'

কোনো কোনো দিন বাড়ির সামনে সরু নির্জন রাস্তাটুকুতে বাজার নিয়ে রীতিমত ঝগড়া শুরু হয়ে যায় দু'জনে। পারুল বলে, 'পরশু কি সরষে নিয়ে এসেছ কাজলদা? পোকা খাওয়া, ধুলো-বালি ভর্তি!'

কাজল বলে, 'আমি কি ঠোঙ্গা খুলে দেখে এনেছি!'

'দেখে আনবে না? মাগ্না এনেছ? নিয়ে যাও, পাল্টে আনবে আজ! আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়েও আসবে!'

'যদি পাল্টে না দেয়?'

'রাস্তায় ফেলে দিয়ে নতুন কিনে আনবে। মোটা মোটা দানা, ঝরঝরে পরিষ্কার রঙ্। ওতে ঝাঁঝ হয় বেশী—'

'তোর চেয়েও?'

পারুল চোখ পাকিয়ে তাকায়, 'বেড়ালের মতো মিউ-মিউ-স্বভাবের না হয়ে একটু ঝাঁঝ থাকা ভাল কাজলদা। হাটেবাজারে তাহলে ঠকে আসবে না।'

কাজল একমুহূর্ত চুপ করে থাকে, তারপর সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ বলে বসে, 'যে ঠকায় ঠকাক, তুই যেন ঠকাস নে।' বলে প্যাডেলে চাপ দিয়ে দ্রুতগতিতে সে রাস্তাটুকু পার হয়ে যায়।

পারুল অল্পকাল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। তার ফর্সা কোমল মুখখানা সহসা কেমন গভীর-গম্ভীর হয়ে যায়। বুকের পদ্মকুঁড়িতে শিরশিরানি জাগে। মনের মধ্যে একটা গানের সুর গুনগুনিয়ে উঠতে চায়। কথাটার কি অর্থ ভাবতে ভাবতে সে উঠোনে আসে। এক পাশে খুঁটিতে বাঁধা কচি বাছুরটাকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে মুখে গাল ঘষতে ঘষতে আদর করে চুমু খায়। বলে, 'মা কই? দুধ খাস নি সকালে? তোর পাওনা দুধ আমরা সব খেয়ে ফেলি, না রে?'

রাত-পাহারার কথাটা কাজল ভোলে না। আর একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি! এখন তো বাড়িঘর অনেক বেড়েছে। চেষ্টা করলে চালু হতেও পারে। শিশির-উৎপল-সরোজের বাড়িতে গিয়ে কাজল কথাটা তোলে। ঘোষালমশায়ের নাম করে সবাইকে রাতের দিকে তাঁর বারান্দায় জড়ো হতে বলে। সেবার ওরাই ছিল সকলের আগে। ওদের বাদ দিয়ে পাড়ায় কিছু করা যায় না।

বাজার থেকে ফেরার পথে জটিল দাসের দোকানেও উঁকি দেয় কাজল। বলে, 'আজ রাত্রে একবার পারুলদের ঘরে যাবে জটিলদা। কথা আছে।'

জটিল বলে, 'কি কথা? দুগ্‌গো পুজো নিয়ে?'

কাজল বলে, 'না, তার তো অনেক দেরি। পাড়ায় এত চুরি হচ্ছে, কিছু করা যায় কি না—'

'কি করবে! চোরের রাজত্বে চুরি হবে না তো কি সাধুসন্ন্যেসির দানধ্যান যাগযজ্ঞ হবে!'

কথাটা বলেই জটিল দাস ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকায়। তারপর চাপাগলায় বলে, 'এমনি বললাম! রাজনীতি-টিতি কিছু আমি বুঝি না রে ভাই—'

কাজল হাসে, 'বোঝার দরকার কি! আমরা রাতজাগার দল করব, কংগ্রেস-কমুনিস্টের দল বানাব না তো! তোমার ভয় নেই জটিলদা—'

জটিল দাস কয়েক মুহূর্ত কি ভাবে, তারপর বলে, 'আচ্ছা যাব। একটু কিন্তু রাত হবে ভাই—'

কাজল ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে পাড়ায় ফিরে আসে। জটিলের স্বভাব সে জানে। মাঝে মাঝে ঝোঁকের মাথায় অনেক কথা বলে ফেলে সে। পর-মুহূর্তেই মতটা উল্টে যায়। অস্থিরচিত্ত এবং ভীতু প্রকৃতির মানুষ। শহরে হরতাল ডাকা হলে সকলের আগে দোকান খুলতে যায়। কিন্তু পুরো খোলে না, আধখানা পাল্লা খোলা, আধখানা বন্ধ রেখে উভয়পক্ষকে সন্তুষ্ট করে। ভোটের আগে উভয়পক্ষকেই চাঁদা দিয়ে রসিদ দু'খানা দোকানের কাঠের দেয়ালে, প্রকাশ্য স্থানে আঠা দিয়ে চিটিয়ে রাখে। তখন গাই-বাছুরের পাশে কাস্তে-হাতুড়ির চমৎকার সহাবস্থান হয়। এ নিয়ে পরিচিত কোনো খদ্দের হাসাহাসি করলে জটিল দাস গম্ভীর মুখে বলে, 'গরীবের দুঃখ তোমরা কি বুঝবে দাদা! কত কষ্টে যে দোকানখানা টিকিয়ে রেখেছি। কেউ একখানা বোমা ঝেড়ে দিলে দু'মুঠো খেতে দেবে কেউ?'

ভোটের ঘরে ঝামেলা দেখা দিলে জটিল দাস মাঝ পথ থেকে বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়ে। বলে, 'ভোট মাথায় থাকুক! আপনি বাঁচলে বাপের নাম!'

জটিলের কাছে যে-দল যে-কাগজই নিয়ে আসুক—সে তাতে মোটা কলমে মোটা অক্ষরে নাম সই দেয়। ফলে গণতন্ত্রের উত্থান ও পতন দুই-ই তার দ্বারা সমর্থিত হয়।

কাজল জটিলের স্বভাবচরিত্র জানে। কিন্তু এ নিয়ে কখনো খোঁচা দেয় না। তার স্বভাবের মধ্যে একটা সংযত, সহনশীলতার ভাব আছে। কলেজে ছাত্র-ইউনিয়ন করে সে। এ বছর সংস্কৃতি-সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছে। পাড়াতেও সবসময় কিছু একটা করার চেষ্টা করে। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে নাটক, সরস্বতী পূজায় রবীন্দ্র-নজরুলের গানের আসর, পাড়ার ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠ্যবইয়ের লাইব্রেরি, একটা হাতে-লেখা পত্রিকা—এসব তার কর্মসূচীর অন্তর্গত। পাড়ার আপদে বিপদে কাজলকে পাওয়া যায় সকলের আগে। চাকরি বাকরির খোঁজ খবর, কলেজের ক্লাস করা—এসবের ফাঁকে ফুঁকে আর যে সামান্য সময় তার অবশিষ্ট থাকে—সে-সময়টুকুতে ধানমাঠের আল ভেঙ্গে চলে যায় নিশিন্দায়। সেখানে সে ঠিক কি যে করে ভাল করে জানা যায় না। তবে নানারকম দাবিদাওয়া নিয়ে নিশিন্দার বাউড়িমুচিচাষীদের মিছিলগুলো যখন এই অঞ্চলের কাঁচারাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে সদরের ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টের দিকে ছুটে যায় তখন সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত কাজলকেও দেখা যায় তাদের সঙ্গে। নিশিন্দার প্রাইমারি স্কুলের হেড্‌মাস্টার শরৎ চক্রবর্তী আর বেসিক ট্রেনিং স্কুলের সেলাই-শিক্ষিকা রেবা নন্দীর ঠিক পাশেপাশেই সে পথ হাঁটে। তখন তার ধুলো ভরা পা, রোদে পোড়া মুখ, স্পষ্ট গলার আওয়াজ—এ-পাড়ার অনেককেই অবাক করে!

ঘোষালমশায়ের বারান্দায় সন্ধ্যার কিছু পরে পরেই দু'একজন করে আসতে থাকে। সকলের আগে আসে সরোজ। তার কাঁধে বন্দুক ঝোলানো। সে জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসের কেরাণী। শিকার করা, মাছ ধরা তার শখ। বন্দুকটা বাবার আমলের। বাবা ফরেস্ট অফিসের চাকুরে ছিলেন। বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হত। সুন্দরবনেও কাটিয়েছেন দীর্ঘকাল। তখন বন্দুকের লাইসেন্স পেয়েছিলেন। এ জেলায় এসে রিটায়ার করার আগে চার মেয়ের বিয়ে দিয়ে একরকম নিঃস্ব হয়েছেন। ফলে ডাঙ্গাপল্লীতে বাড়ি।

বন্দুকটা রেখেছেন সঙ্গে। সেটা নিজের জন্য নয়, সরোজের শখে। তারপর দেখেছেন, রেখে ভালই হয়েছে। এই নির্জন ব্রহ্মডাঙায় বন্দুক একটা বড় ভরসা। ঘরে থাকলে মনের সাহস বুকের বল বাড়ে। বন্দুকের জন্যই কখনো চোর ঢুকতে সাহস পায় নি তাঁর বাড়িতে। আর শুধু তাঁর নয়, পাড়ার পক্ষেও বন্দুক একটা বড় শক্তি। এটা বিক্রি করার কথা ভেবেও তাই মত পাল্টেছেন তিনি।

ময়ূরাক্ষীর পাড়ে শালবনে তিতির পাখির বাসা আছে। তিতিরের মাংস সুস্বাদু। সাঁওতালেরা তীর দিয়ে তিতির মারে। সরোজ একবার একজন সাঁওতাল মুনিষকে দিয়ে তিতির আনিয়ে মাংস রান্না করে খেয়েছিল। তারপর থেকে মাঝে মাঝে বন্দুক কাঁধে সাইকেলে চেপে সে শালবনে যায়। কখনো শিকার পায়, কখনো পায় না। আজও শিকার পায় নি। তবে আশেপাশের লোকজনের অনুরোধে সাঁওতাল-পাড়ার ক্ষেপে-যাওয়া একটা কুকুরকে গুলি করে মেরেছে। কুকুরটা গাঁয়ের বেশ কয়েকজনকে কামড়ে শালবনে আশ্রয় নিয়েছিল। ফেরার সময় কৃতজ্ঞ সাঁওতালেরা নামমাত্র মূল্যে তাকে একটা বড় সাদা রঙের মুরগী দিয়েছে। সেটা দড়িতে বেঁধে সাইকেলে ঝুলিয়ে সে পাড়ায় ফিরেছে। তারপর একটা ছেলের হাত দিয়ে সাইকেল সমেত মুরগী ঘরে পাঠিয়ে বন্দুক হাতেই চলে এসেছে ঘোষালমশায়ের বারান্দায়।

সে আসার একটু পরেই এসেছে কাজল। সাইকেলটা বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে সে সোজা ঢুকে গেছে ঘরে। ভেতরের দিকের বারান্দায় বসে পারুল তখন আটা মাখছিল। তার পাশে ছোট একটা তোলা উনুন। তাতে ডাল কিংবা তরকারি ফুটছে।

কাজল এগিয়ে এসে তার ঝোলা থেকে রুমালে-বাঁধা গোলাকার একটা পুঁটুলি বের করে পারুলের সামনে নামিয়ে দিয়ে বলে, 'এই নে!'

পারুল অবাক হয়ে বলে, 'কি আছে ওতে?'

'কেন? চিনি!'

পারুলের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যেন একটা সোনার গয়না পেয়ে গেল সে। বলে, 'কোথায় পেলে কাজলদা ?'

'অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি। এক কেজি আছে।'

'কত দাম পড়ল ?'

দামের কথায় কাজল একটু থমকায়। খোলাবাজারে চিনি সে পায় নি। মাস দুই পাওয়া যাচ্ছে না। শহরে-গ্রামে চিনির অভাবে চায়ের দোকানগুলো বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। গুড়-বাতাসার দামও চড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। মিষ্টির দোকানগুলোর অবস্থা কাহিল। সুপুরির মতো একটা রসোগোল্লার দাম আটআনা। মাঝে মাঝে বাজারের দু'একটা বড় দোকানে চিনির বস্তা নামার খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু চোখে দেখা যায় না। কাজলকে যারা চেনেনা —তারা তাকে চিনি দেয় না। যারা চেনে তারাও দেয় না। এই ছেলেটা আরো কিছু ছেলের সঙ্গে শহরের দেয়ালে চোরাকারবারী আর মজুতদারের বিরুদ্ধে লালকালিতে লেখা পোস্টার চিটিয়ে বেড়ায়। কাজেই চড়া দামে একে তো চিনি বেচা যায় না। আবার কাজলের পক্ষেও ওভাবে চোরের মত চুপিচুপি চড়াদামে চিনি কেনা মুস্কিল। তার বিবেকে বাঁধে, মর্যাদায় বাঁধে। এই উভয় সংকটের মধ্যে সে বাজারের নানু পালকে ধরেছিল। নানু পাল হাসপাতালের কিচেনে শাকসব্জী সরবরাহ করে। কাজলের মা'র সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে। কাজলকেও চেনে। সেই নানু পালই কাজলের কাছে রুমাল চেয়ে নিয়ে এক কেজি চিনি এনে দিয়েছে। আড়াইগুণ বেশি দাম। পারুলের কাছে দাঁড়িয়ে দামের কথা বলতে কাজল তাই সঙ্কোচ বোধ করে। কেমন যেন অস্বস্তি হয়। প্রথমত পারুলদের সংসারের অবস্থা তার অজানা নয়। দ্বিতীয়ত ন্যায্যদামে চিনি কিনতে না পারার ব্যর্থতাকে সে নিজের কাছেই নিজের হার বলে মনে করে। তাছাড়া পারুলের কাছে আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার একটা সুন্দর সুযোগও সে হাতছাড়া করতে চায় না। সে হঠাৎ বলে বসে; 'কণ্ট্রোল-দামেই পাওয়া গেছে পারুল। এক পয়সাও বেশি দিতে হয় নি।'

পারুল একটু যেন সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কাজলের দিকে তাকায়। সংসারের খুঁটিনাটি যেমন তার নখদর্পণে, বাজারের হাল-চালও তেমনি সবই তার জানা। কোনো কোনো দিন ছোট বোনকে নিয়ে সে নিজেও তো যায় বাজারে। সে বলে, 'এতটা চিনি তুমি কন্ট্রোল-দামে পেয়ে গেলে কাজলদা? কোন্ দোকানে পেলে? জয়কালীর দোকানে?'

কাজল বিরক্ত হয়ে বলে, 'তোর অত খবরে কি দরকার। আমি লাইন দিয়ে এনেছি।'

পারুল আর কিছু বলে না। আটা-মাখা হাতে রুমালের গিঁট খুলে কাগজের ঠোঙ্গা বের করে। তারপর থাবায় নাচিয়ে মুখ শুকনো করে বলে ওঠে, 'এক কেজি তো নেই কাজলদা! অনেক কম আছে।'

'কম আছে। কে বলল?'

'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।'

পারুল কালীকে ডেকে বলে একটা খালি হরলিকসের শিশি আনতে। শিশি এলে তাতে চিনি ঢালে পারুল। সব মিলিয়ে দেড় শিশির মতো হয়। পারুল বলে, 'দেখলে তো কাজলদা? হরলিকশের একশিশিতে খাঁটি পাঁচশো চিনি ধরে। দেড় শিশির মত হল। তোমাকে প্রায় দু'শ চিনি কম দিয়েছে—'

কাজলের মুখও কালো হয়। বুকের মধ্যে একটা অসহায় রাগ ক্রোধ গর্ গর্ করে ওঠে। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু রাগটা কার উপর, কেন—এইমুহূর্তে তার মীমাংসা করতে পারে না বলে কিংবা অদৃশ্য শত্রুকে এইমুহূর্তে হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না বলে সমস্ত ঝাঁঝ গিয়ে পড়ে পারুলের উপর। তিক্ত গলায় ধমকের মত বলে ওঠে, 'যা পেয়েছিস তুলে রাখ! অত চুলচেরা মাপামাপির দিন নেই এখন—'

তারপর আর দাঁড়ায় না। থমথমে মুখ নিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে আসে। চিনি-সংগ্রহের সমস্ত গৌরব তার ধূলিসাৎ হয়েছে।

বাইরে তখন শিশির উৎপলও এসে গেছে। কাজল একপাশে

দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিঃশব্দে বসে পড়ে। দরজার কাছে একটা লণ্ঠন কালো ধোঁয়া ছড়াতে থাকে। বাইরের অন্ধকারে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকে। মাঝে মাঝে ধানমাঠে শেয়ালের ডাক শোনা যায়। গোটা পল্লী অন্ধকারে ডুবে থাকে, মানুষজনের বড় একটা সাড়া পাওয়া যায় না। ঘোষালমশায়ের আধডজন নারকেলগাছের মাথায় শ্রাবণের বাতাস ঝির ঝির শব্দ তোলে। ক'দিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না বলে মাঠঘাট আবার রুক্ষ হয়ে উঠেছে। একধরণের ভ্যাপসা গরমে গা হাত পা জ্বালা করে। সরোজ গায়ের জামা খুলে ফেলে। উৎপল শিশির বাড়ি থেকে গেঞ্জি পরেই এসেছে। শুধু জটিল দাসের এখনো দেখা নেই। আটটায় দোকান বন্ধ করে সে আসবে।

ঘোষালমশাই হঠাৎ পারুলকে ডাকেন, 'দুটো বিড়ি দিয়ে যা তো মা!'

পারুল উত্তর দেয়, 'সন্ধ্যেবেলা দুটো দিয়েছি না? এখন আর পাবে না!'

ঘোষালমশাই মুখ ভার করে বলেন, 'মেয়ের শাসন দেখেছ তোমরা! বিড়িটুকু পর্যন্ত লুকিয়ে রাখে!'

সরোজ বলে, 'ভালই তো করে মেসোমশাই। আপনার তো হাঁপানির টান আছে। বিড়িসিগ্রেট খাওয়া ভাল না।'

'এই বয়সে আর ভালমন্দ!' ঘোষালমশাই জোরে শ্বাস টানেন, 'যা দিনকাল পড়েছে, বেঁচে আর কি সুখ আছে বাবা?'

'সে তো ঠিকই!' বয়স্কের মতো মুখ করে শিশির উত্তর দেয়।

এইসময় জটিল আসে। পরনে লুঙ্গি, খালি গা, হাতে জ্বলন্ত লণ্ঠন। একবার ডাঙ্গাপল্লীতে অন্ধকারে সাপের গায়ে পা দিয়েছিল সে। তবে সেটা ছিল হেলে সাপ। তার বিষ নেই। গরু-চরানো বাগালগুলো অনেকসময় সে সাপের লেজ ধরে বন্‌বন্‌ ঘুরিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু জটিল ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর থেকে অন্ধকারে লণ্ঠন কিংবা টর্চ না নিয়ে পাড়ায় বের হয় না। খুব সতর্ক ভঙ্গিতে আলো ফেলে পথ দেখতে দেখতে আসে।

জটিল বারান্দায় উঠে একপাশে বসে নিজের কণ্ঠনখানা নিভিয়ে দিল। উৎপল সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'দেখলেন মেসোমশাই, কেমন হিসেবি বুদ্ধি! যতটুকু তেল বাঁচে!'

উৎপলের কথায় সবাই হেসে উঠল। কিন্তু জটিল আহত ভঙ্গিতে উত্তর দিল, 'তুমি কি বুঝবে! দিনরাত ভূতের মতো খেটে পয়সা রোজগার করতে হয় আমাকে। খাটিয়ায় শুয়ে থাকলে তো আমার গায়ে শিউলি ফুলের মতো পয়সা ঝরে না।'

জটিলের কথায় উৎপলের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। জটিল দাস এমন ভাবে পাল্টা খোঁচা মারবে, সে ভাবতে পারে নি। ডাঙ্গার পুবদিকে কাজলদের বাড়ি ছাড়িয়ে পাশাপাশি জটিল আর উৎপলদের বাড়ি। মধ্যবর্তী হাতখানেক জমির সীমানা নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে একটা গোলমাল আছে। উৎপলদের রান্নাঘর, কুয়োতলা, ল্যাট্রিনের জল ওই গলিপথে জমা হয়। জটিল দাস বলে, ওই জমিটুকু তার। ইট গুঁজে প্রায়ই বাইরে থেকে ড্রেনের মুখ বন্ধ করে দেয় সে। উৎপলরা ভেতর থেকে বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে মুখ খুলে দেয়। এই নিয়ে উৎপলের মা'র সঙ্গে জটিলের বউয়ের মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়। জটিল কিছু নিরীহ ও নির্বিরোধী বলে খুব বেশি চিৎকার করার সাহস পায় না। সে এসে ঘোষালমশায়ের কাছে নালিশ করে। উৎপলও আসে একই নালিশ নিয়ে। ঘোষালমশাই বলেন, 'আমিন এনে ম্যাপ দেখে জমি মাপিয়ে নাও তোমরা।' পরামর্শটা দু'পক্ষই মেনে নেয় কিন্তু কেউ আমিন আনে না। ঝগড়াটুকুও টিকে থাকে।

উৎপল কাজ করে ময়ূরাক্ষী ব্যারেজে। টোল-ট্যাক্স আদায়ের কাজ। ব্যারেজের উপর দিয়ে যত রকমের গাড়ি যায়—ঢোকার মুখে টাকা দিয়ে কুপন কাটতে হয় তাদের। ও-পাশে কুপন জমা দিলে তবে ছাড় পায়। বাস, ট্রাক, জীপগাড়ি, গরুর গাড়ি—পয়সা না গুণে কারো ব্যারেজের রাস্তা পার হবার উপায় নেই। দিনেরাতে চব্বিশ ঘণ্টা সরকারী লোক থাকে ডিউটিতে। উৎপলও ওই কাজ করে। গ্রীষ্মকালের রাতে ডিউটি পড়লে ছোট খাটিয়া পেতে বাইরে

শুয়ে থাকে সে। একটু পরে পরে ট্রাক যায় মশানজোড় হয়ে ছুমকার দিকে। গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার টাকা ছুঁড়ে দেয়। সবসময় যে কুপন পায় এমন নয়। মালভর্তি ট্রাকের জন্য কুপন কাটলে পাঁচ টাকা, না কাটলে ছ'টাকা। কুপনের টাকা সরকারি তহবিলে যায়। কুপন না-কাটা-টাকা হিসেবের বাইরে, যারা ডিউটি দেয় তাদের উপরি-পাওনা। ডিউটির শেষে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। ড্রাইভারেরা সব জানে। পাঁচ টাকার কাজ ছ'টাকায় হলে তারাও কুপনের জন্য মাথা ঘামায় না।

উৎপল বি-এ পাশ করে বছর তিনেক চাকরির জন্য বসে থেকে শেষপর্যন্ত ওই কাজে ঢুকেছে। বেতন সামান্য কিন্তু উপরিটুকু আছে বলে পুষিয়ে যায়। তার ঘরে মা বাবা ভাই বোন নিয়ে পোষ্য অনেক। সে নিজেও গত বছর বিয়ে করেছে। উপরি-পয়সার আয়ে একখানা বাড়তি ঘরও তুলে নিয়েছে। পাড়ার সবাই এসব কথা জানে। জটিলও জানে। তাই খাটে শুয়ে পয়সা রোজগারের কথা বলে উৎপলকে খোঁচা দিল সে।

কিন্তু নিঃশব্দে হজম করার পাত্র উৎপলও নয়। গম্ভীর আর রাগী গলায় সেও বলে উঠল, 'আমি তো খাটিয়ায় শুয়ে পয়সা কামাই, কিন্তু সেবার তোমার দোকানে বাজারের মানুষ হামলা করেছিল কেন জটিল?'

জটিল অসঙ্কোচে উত্তর দেয়, 'বেবিফুডের জন্য। অনেক কষ্টে কলকাতা থেকে কয়েক কৌটা এনেছিলাম, সবাইকে দেব কি করে?'

'সেজন্য না। চড়া দাম নিচ্ছিলে তুমি। ব্ল্যাক!'

'চড়া দামে কিনে এনেছিলাম যে!'

হঠাৎ ঘোষালমশাই বাধা দেন, 'কি ছেলেমানুষি শুরু করলে তোমরা? কাজের কথা কখন হবে?'

পরিবেশ সহজ করার জন্য সরোজ বন্দুক তুলে হাসিমুখে বলে, 'একদম চুপ কর জটিল! আর একটা কথা বললেই গুড়ুম্!' জটিলের মুখেও হাসি ফোটে। বেশিক্ষণ রাগ করে থাকার মানুষই

সে নয়। বুকটা ফুলিয়ে বলে, 'পাথর হয়ে গেছে দাদা, টকাস্ করে গুলি ফিরে যাবে!' তারপর উৎপলের দিকে তাকিয়ে আপোষের গলায় বলে, 'রাগ করো না তুমি। মহাজনের কাছে ধারেদেনায় বিকিয়ে আছি। দোকানে বিক্রিবাট্টা ভাল না হলে মাথার ঠিক থাকে না আমার। তবে কেরোসিন বাঁচাচ্ছি বলে খোঁটা দিলে। দু'দিন যাক—সারা বাজার ঘুরেও এককৌটা তেল পাবে না। আমার কাছে খবর আছে। সাঁইথিয়ার মহাজনের গদী থেকে শুনে এসেছি আমি—'

শিশির বলে, 'সে কি কথা! তাহলে তো কালই দু'এক টিন তুলে ফেলতে হয়।'

এতক্ষণ কাজল একটা কথাও বলে নি। একটু অন্যমনস্কের মত বসে ছিল। আসলে পারুলকে ওভাবে ধমকে আসায় তার মন খারাপ করছিল। এবার রুক্ষ গলায় বলে ওঠে, 'কত কিনবে মানুষ? কার কত পয়সা আছে? আজ চিনি নেই, কাল কয়লা নেই, পরশু কেরোসিন নেই—'

শিশির কাজলকে থামিয়ে দেয়, 'থাক কাজল, হাটবাজার নিয়ে এখন একটা বক্তৃতা শুরু করে দিও না তুমি। তোমার তো আবার ওসব মুখস্ত করা আছে!'

কাজল বলে, 'মুখস্ত করব কেন! বাজারে গেলেই হাড়েহাড়ে টের পাই যে।'

ঘোষালমশাই সমর্থন করেন কাজলকে। বলেন, 'কাজল তো ঠিকই বলেছে। তোমাদের চেয়ে বয়সে ছোট হলে কি হবে—ওর বুদ্ধি খুব পাকা, নজর খুব ধারালো। খুব হিসেব করে কথা বলে ও।'

জটিল বলে, 'হ্যাঁ, মেসোমশাই, আমাদের পাড়ায় ওর মত ছেলে আর একটাও নেই!'

প্রশংসায় কাজল লজ্জা পায়। বলে, 'ওসব কথা থাক, রাত হয়ে যাচ্ছে, নাইটগার্ডের কথাটা তুলুন মেসোমশাই।'

ঠিক এইসময় ধানমাঠের বুক থেকে নারকেলগাছের মাথা ছুঁয়ে বাড়িঘরদরজার উপর দিয়ে জোরালো একটা আলোর বৃত্ত

ঘুরে ফিরে কবরখানার দিকে ছুটে যায়। একটুপরে আবার ঘুরে আসে। নগেনবাবুর ছয় ব্যাটারীর টর্চ। তার মানে, শহর থেকে বাড়ি ফিরেছেন। চাকরদের দরজাজানালা বন্ধ করতে বলে ছাদের উপর উঠে চারপাশ দেখে নিচ্ছেন। বাড়ির আনাচেকানাচে, প্রশস্ত উঠোনের আমকাঁঠালের ছায়ায় লেবুতলায়, গোয়ালঘরের ফাঁক-ফোকড়ে কেউ যদি লুকিয়ে থাকে!

আলোর বৃত্তটা আর একবার ঘুরে যেতেই উৎপল বলে, 'নাইট গার্ড দিতে হয় দাও, কিন্তু পাড়ায় ইলেকট্রিক লাইট আগে আনা দরকার। লাইট এলে চুরি অনেক কমে যাবে।'

ঘোষালমশাই সায় দেন, 'সে তো ঠিকই। তোমরা তো একবার দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়েছিলে আমার কাছে। কি হ'ল তার?'

কাজল উত্তর দেয়, 'কিছুই হয়নি। আমি তো প্রায়ই ঘোরাঘুরি করি ইলেকট্রিক-অফিসে। সেদিন সরোজদাও ছিল সঙ্গে। ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার সাফসুফ বলে দিল, এখন চাদ্দিকে পাওয়ার ক্রাইসিস। নতুন লাইন দেওয়া হবে না!'

ঘোষালমশায়ের মত ঠাণ্ডা মানুষও এবার রেগে ওঠেন, 'পাওয়াণ ক্রাইসিস! অকর্মা অপদার্থের দল সব। পঁচিশবছর রাজত্ব চালিয়ে ভেড়ুয়ারা এখন বলছে কিনা পাওয়ার ক্রাইসিস! এ দেশের আর কি হবে! বিদ্যুৎশক্তিই হ'ল গিয়ে সবকিছুর মূল শক্তি, সেখানেই কিনা ঘাটতি—'

সরোজ বলল, 'আরো নাকি বাড়বে মেসোমশাই। বড় বড় শহর অন্ধকারে ডুবে থাকবে, কলকারখানার চাকা বন্ধ হবে—'

জটিল দাস উৎকণ্ঠিত গলায় বলে, 'তাহলে জিনিশপত্র তো আর পাওয়াই যাবে না সরোজদা!'

'পাওয়া যাবে, অল্প-স্বল্প! সে তোমার-আমার কেনার ক্ষমতা হবে না—'

কথার মধ্যে পারুল দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'অনেক রাত হ'ল যে বাবা, খেয়ে নাও তুমি!'

'কত রাত হ'ল? ক'টা বাজে?' ঘোষালমশাই জিজ্ঞেস করলেন। সরোজের হাতে ঘড়ি ছিল, সে দেখে বলল, 'পৌনে দশটা মেসোমশাই!'

ডাঙ্গাপল্লীর পক্ষে পৌনে দশটা অনেক রাত। ঘরে ঘরে বাচ্চারা শুয়ে পড়েছে। সারাদিনের কাজকর্মের ক্লান্তিতে মেয়েবউরা ঢুলতে শুরু করেছে। ঘন অন্ধকার পাড়ার বুকে চেপে বসেছে।

ঘোষালমশাই বলেন, 'তাহলে আজকের মত বাড়ি যাও তোমরা।'

সরোজ বলে, 'কিন্তু কথাটা তো শেষ হল না মেসোমশাই।'

ঘোষালমশাই বলেন, 'ওই তো হ'ল! নাইটগার্ড চালু হবে আবার। পাড়ায় এখন অনেক ঘর হয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বল। নামের একটা লিস্টি তৈরি কর। তারপর বড় দেখে একটা মিটিঙ্ ডাকো। সবাই আসুক—'

কাজল বলে, 'তাই হোক। কাল থেকেই কথা বলা শুরু করব আমরা!'

বাড়ি যাওয়ার আগে জটিল কাগজ পাকিয়ে ঘোষালমশায়ের আলো থেকে লণ্ঠনটা আবার জ্বালিয়ে নেয়। পারুল আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে দেয়ালের এককোণে খাড়া-করানো বন্দুকটা ভয়ে ভয়ে হাতে নিয়ে বলে, 'গুলি ভরা আছে নাকি সরোজদা?'

এ-পাড়ার সরোজ-শিশির-উৎপলদের কাছে পারুলের কোনো সঙ্কোচ নেই। বন্দুকটা নিয়ে সে একটু নাড়াচাড়া করে। মসৃ কাঠের বাঁটে হাত বোলায়। লোহার ঠাণ্ডা নলে হাত রাখার সময় গা শির শির করে। বলে, 'ঘোড়া টিপলে দুটো নল দিয়ে একসঙ্গে দুটো গুলি বেরোয় সরোজদা?'

সরোজ বলে, 'তুই বন্দুক চালানো শিখবি পারুল?'

পারুল বলে, 'ধেৎ!'

'কেন? ধেৎ কেন? আমার বোনকে তো শেখাচ্ছি আমি—'

'যাঃ, মেয়েরা আবার বন্দুক ছোঁড়া শেখে নাকি?'

'কেন শিখবে না? আমি বইয়ে পড়েছি—ভিয়েৎনাম বলে একটা

দেশে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরাও বন্দুক চালায়। একটু বড়ো হয়ে মেশিনগান পর্যন্ত। আমি ছবিও দেখেছি!'

কাজল একটু চমকে সরোজের দিকে তাকায়। অস্পষ্ট আলোতে মুখটা ভাল দেখা যায় না। সে বলে, 'ভিয়েৎনামের বই আমিও পড়েছি সরোজদা।'

পারুল আস্তে আস্তে বন্দুকটা সরোজের হাতে তুলে দেয়। কাজলকে বলে, 'তোমার রুমাল আমি সাবান দিয়ে কেচে দিয়েছি। কাল বাজার যাবার সময় নিয়ে যাবে।'

এরপর দিনতিনেক কাজলের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। এমন কি পারুলের সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘোষালমশায়ের বাড়িতেও আসে না। সংসারে টুকিটাকি অনেক জিনিশে টান পড়ে। পারুল কাজলের খোঁজে ওদের বাড়ি যায়।

কাজলের মা বলে, 'সে তো এখানে নেই পারুল। বোলপুরে গেছে।'

'কেন? বোলপুরে কেন?'

'ওদের কলেজের ছাত্রদের কি একটা জেলা-সম্মেলন চলছে।'

'ও।'

'কেন? খুঁজছিস কেন ওকে?'

সুলেখার কথায় হঠাৎ কেমন যেন লজ্জা পেয়ে যায় পারুল। মুখ নামিয়ে বলে, 'আমি খুঁজব কেন। বাবা ডাকতে পাঠালেন ওকে।'

কাজলের মা খুঁটিয়ে পারুলের মুখ দেখেন। তারপর বলেন, 'আমি ওবেলা যাব দাদাকে দেখতে।'

কাজলের বোন এসে বলে, 'পারুলদি, তোমার কাছে কাপড়ের লাল পাড় আছে?'

'কেন, লাল পাড় দিয়ে কি হবে?'

'স্কুলের হ্যাণ্ড-ওয়ার্ক। আসন তৈরি করেছি। লাল পাড় দিয়ে চারপাশ মুড়তে হবে।'

'আছে মনে হয়। আমি খুঁজে রাখব।'

এইসময় সদানন্দের পিসী উঠোনের দরজা ঠেলে সসঙ্কোচে চোরের মত ঢোকে। ছোটোখাটো কালোরঙের মানুষটি। মাথার সামনের দিকটায় চুল নেই। পেছনের কয়েকগাছা বড়ির মত খোঁপা বাঁধা। কপালে নাকের ডগায় তিলকের ফোঁটা। একটা ময়লা খাটো ধুতি পরণে। তার নানা জায়গায় সেলাই করা। বুকের দুধ শুকিয়ে আমসি। ডান পাশেরটা উদোম হয়ে ঝুলে আছে। পিসীর ভ্রূক্ষেপ নেই। লাজলজ্জার বয়স সে হয়ত পার হয়ে যায় নি কিন্তু মস্তিষ্কের সুস্থতার বিলক্ষণ অভাব ঘটেছে।

তাকে কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাজলের মা বলেন, 'কি গো, কি হ'ল তোমার?'

সদানন্দের পিসী অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলে, 'কাজলার মা, তোমাগো হাসপাতালে বিষ নাই?'

সুলেখা হেসে বলেন, 'থাকবে না কেন? বড় বড় শিশি ভর্তি বিষ আছে।'

'আমারে একটু-নি আইনা দিবা? আর ত একতিলও বাঁচনের মন নাই আমার!'

'বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছ বুঝি?'

'কাইজ্যা? হে তো মুখে হয়! হেরে ডরাই না। কাইল রাতে খুন্তি দিয়া মারছে আমারে। ঘর থনে বাইর কইর‍্যা খিল দিছে। উঠানে বইয়া রাইত কাটাইলাম! হাচা কই না মিছা—নিজের চক্ষু দিয়া দেখ তুমি—'

বলতে বলতে উর্দ্ধাঙ্গের সবটুকু কাপড়ই খুলে ফেলে পিসীর ঘুরে দাঁড়িয়ে পিঠ দেখায়। ধারালো নখের আঁচড়ের মত কয়েকটা রক্তাভ দাগ ছাড়া তেমন গুরুতর কিছু দেখা যায় না। তবু পিসীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কাজলের মা বলেন, 'ইস্! খুব মেরেছে তো!'

সদুর পিসী এবার হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে, 'আমারে মাইরা

ফেলাইব। একদিন দা-ও দিয়া কুপাইয়া আমার গলা ছুইখান কইরা দিব।'

পারুল বলে, 'অ পিসী, কাঁদছ কেন?'

পিসী বলে, 'কান্দুম না? হকাল থনে দাঁতে কুটা কাটি নাই। খিদায় আমার প্যাটের নাড়ীভুঁড়ি জ্বলে—'

কাজলের মা জানেন, পারুলও জানে—এটাই আসল কথা। সকাল থেকে খাওয়া জোটে নি পিসীর। সতুর বউ খেতে দেয়নি তাকে। এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। তখন সতুর পিসী পাড়ায় বেরোয় খাদ্যের সন্ধানে।

সুলেখা বলেন, 'গুড় দিয়ে চাট্টি মুড়ি খাবে? মুড়ি আছে ঘরে।'

সতুর পিসী সঙ্গে সঙ্গে কান্না থামায় কিন্তু শব্দ করে নাক দিয়ে জল টানতে থাকে। কাপড়ের আঁচল মেলে ধরে বলে, 'তাই দাও কাজলার মা, জল দিয়া ভিজাইয়া খামু।'

মা'র ইঙ্গিতে কাজলের বোন গৌরী মুড়ি এনে দেয়। সতুর পিসী আঁচলে মুড়ি নিয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করে। বিষের কথা তার আর মনেও পড়ে না।

একটু পরে পারুলও চলে যায়। ছুপুরের রান্না সেরে একফাঁকে সে এসেছিল এ-বাড়িতে। তার এখনো স্নান হয় নি।

ঝাঁ ঝাঁ ছুপুরে ডাঙ্গাপল্লীর মাঠঘাট তেতে ওঠে। বর্ষাকাল, তবু ক'দিন ধরে বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। কচিধানের রং পাঁশুটে হয়ে উঠছে। বড়পুকুরে ছুনী লাগিয়ে জল তুলছে চাষীরা। ডাঙ্গাপল্লী থেকে তাকালে তাদের রোদে পোড়া কালো শরীর দেখা যায়।

পারুল চলে গেলে কাজলের মা একরাশ জামাকাপড় নিয়ে কুয়োতলায় আসেন। কুয়োতলার তিন পাশে কলাগাছ, সূর্যমুখী লঙ্কার চারা, একটা বিলেতি আমড়ার গাছ। আগে ডাঙ্গার কাঁকুরে মাটিতে কোনো ফসল হত না। বাড়িঘর ওঠার পর মানুষের যত্নে, পরিশ্রমে ও প্রয়োজনে রকমারি শাকসব্জি জন্মাচ্ছে। কুয়ো খুঁড়ে নতুন মাটি উঠেছে, বাড়ির ভিৎ থেকেও মাটি উঠেছে,

অনেকে ধানমাঠের পুকুর থেকে মুনিষ লাগিয়ে বাঁকে করে কাদামাটি তুলে এনেছে। সেসব মাটিতে এখন গাছপালা জন্মায়। নগেনবাবু ছাড়া ফুলের চাষ অবশ্য কেউ করে না। লাউকুমড়ো লাগায়, আলু কপি বেগুন ফলানোর চেষ্টা করে, কলাগাছ নারকেলগাছের চারা বসায়। অভাবের সংসারে খাদ্যবস্তু ফলিয়ে যেটুকু পয়সা বাঁচানো যায়—প্রাণপণে তার চেষ্টা করে।

কাজলের মা কুয়োতলার বাঁধানো শানে কাপড়ে সাবান ঘষতে ঘষতে সন্তুর পিসীর কথা ভাবেন। ও-সংসারের সবকিছু জানা আছে তাঁর। এই ছোট পাড়ায় সকলের ঘরের কথাই সকলে জানে। চেষ্টা করলেও গোপন রাখা যায় না। কাজলের মা আবার একটু বেশি জানেন। কেননা তিনি সদর হাসপাতালের পুরনো নার্স। পাড়ার অনেক গোপন গুহ্য সংবাদ নানাসূত্রে তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। ওই যে নগেনবাবু এক বিধবা যুবতী শালীকে এনে বাড়িতে ভরে রেখেছেন—বছর চারেক আগে তার পেট-খসানোর খবরট কাজলের মা ছাড়া এ পাড়ার আর কে জানত! হাসপাতালের যে ডাক্তারকে বাড়িতে ডাকিয়ে এনে মোটা টাকা খাইয়ে ওই জীবহত্যাটি করেছিলেন নগেন চৌধুরী সেই ডাক্তারবাবুই এখান থেকে বদলি হয়ে যাওয়ার আগে অন্তরঙ্গ দু'একজনকে বলে গিয়েছিলেন। কাজলের মা'র কানেও এসেছিল কথাটা। তিনি পাড়ায় কাউকে কিছু বলেন নি। এমন কি ঘোষালমশাইকেও না। নগেনবাবু প্রতিপত্তিশালী পয়সাওলা মানুষ। ভাল না করুক মন্দ করার অনেক ক্ষমতা আছে তার।

কিন্তু সন্তুর পিসীর ব্যাপারটা খুব বিচিত্র। কাজলের মা যত ভাবেন ততই অবাক হন। মানুষের চরিত্রের জটিলতা তাকে বিস্মিত করে। সন্তুর পিসীর জন্য এক এক সময় বড় কষ্ট হয় তাঁর, আবার সন্তুর বউটার জন্যও হয়।

একদিন সন্তুর বউ এসেছিল তাঁর কাছে। মাঝে মাঝেই আসে। হাসপাতাল থেকে বিনিপয়সায় জ্বরজ্বারি গা-ব্যথা পেটব্যথার ওষুধ

আনতে বলে। শুধু সে না, পাড়ার অনেকেই বলে। কাজলের মাকে অনেকের জন্যই অনেকরকম ওষুধ আনতে হয়। দরকার হলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে দিতে হয়, ধরাধরি করে ভর্তিও করে দিতে হয়। ডাঙ্গাপল্লীতে কারো কিছু হলে যতক্ষণ না শহরের ডাক্তারবাবুর সন্ধান পাওয়া যায়—ততক্ষণ সকলেই কাজলের মা'র খোঁজ করে।

সেদিন সন্তুর বউ এসে চুপি চুপি বলেছিল, 'দিদি, তোমার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে?'

কাজলের মা অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'কেন? ঘুমের ওষুধ দিয়ে কি হবে? রাতে ঘুম হয় না তোমার?'

'আমার জন্য না! ওই ক্ষেপী পিসীটার জন্য!'

কাজলের মা'র কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। ভয়ঙ্কর একট সন্দেহ। সন্তুর বউয়ের মতলবটা কি? সে কি ঘুমের ওষুধ জড়ো করে একদিন একসঙ্গে খাইয়ে পিসীকে মেরে ফেলতে চায়? সংসারের বাড়তি বোঝা, গলার কাঁটা দূর করতে চায়! ভেবে কাজলের মা কেমন শিউরে উঠেছিলেন। দীর্ঘকাল হাসপাতালে কাজ করছেন তিনি। এরকম কত ঘটনাই তো দেখেছেন!

সন্তুর বউয়ের বয়স কম। সন্তু কাজ করে আবগারি অফিসে। সামান্য পিওনের কাজ। বিয়ের আগে নিশিন্দাগ্রামের একটা মাটির ঘরে মাসিক পাঁচটাকায় ভাড়া থাকত। ডাঙ্গাপল্লীতে জমি বিক্রি হচ্ছে শুনে অফিসে ধারদেনা করে শ তিনেক টাকা যোগাড় করে। বিধবা পিসীর একছড়া সোনার হার আর চারগাছা চুরি ছিল। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেটুকুও বিক্রি করে আঠারোশ টাকা পায়। কোণার দিকে দু কাঠা জমি কিনে সদানন্দ বাড়ির ভিৎ কাটে। মিস্ত্রিমজুরের সঙ্গে নিজেই খাটাখাটুনি শুরু করে। কোদাল দিয়ে মাটি কাটে, ইট বয়ে দেয়, মশলা মাখে। কিন্তু এত করেও একখানার বেশী ঘর হয় না এবং তারও ছাদ ঢালাইয়ের আগেই পয়সা শেষ হয়। সদানন্দ মরিয়া হয়ে তখন নিশিন্দার পালু মালাকারের মেয়েকে বিয়ে করে

নগদ বারোশ টাকা পণ পায়। জামাই অপিসে চাকরি করে এবং নিজের পাকা কোঠাবাড়ি হতে চলেছে—এই আবেগে পালু খুশি হয়েই তাকে বারোশ টাকাসমেত কন্যা সম্প্রদান করে। সেই টাকায় সদানন্দ ছাদ ঢালাই করে দরজা জানালা বসায়। রান্নাঘর নেই, কুয়ো নেই, শুধু একখানা ঘর আর উঠোন ঘিরে হাত তিনেক উঁচু একইটের পাঁচিল। পাঁচিলের একপাশে স্যানিটারি পায়খানা —তার ছাদ নেই, এক টুকরো ছেঁড়া ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। পালু মালাকার মেয়ের মুখ চেয়ে ল্যাট্রিন-তৈরির টাকাটাও দিয়েছে। ডাঙ্গা-পল্লীতে শহুরে বাবুদের সঙ্গে বসবাস। সেখানে মেয়ে তো আর গাড়ু গামছা হাতে ধানমাঠে যেতে পারে না!

কাজলের মা জানেন, ধারেদেনায় সদানন্দ ডুবে আছে। মাইনের অর্ধেক টাকাও ঘরে আনতে পারে না। এই অবস্থায় সংসারে যা হয় – পিসীর সঙ্গে বউয়ের নিত্যি ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে। কোনো কোনোদিন পিসীর জন্য রান্নাও করে না। সন্তুর পিসী পাড়া ঘুরে চাল যোগাড় করে। কাঠকুটো যোগাড় করে। তারপর উঠোনের একপাশে ইট সাজিয়ে উনুন বানিয়ে মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটিয়ে খায়। সন্তুর বউ ফিরেও তাকায় না।

অবশ্য পিসীও যন্ত্রণা কম দেয় না তাকে। সুযোগ পেলেই খাটের তলা থেকে তরিতরকারি চুরি করে। আঁচলে বেঁধে চিঁড়ে-মুড়িগুড় নিয়ে পালায়। মশলাপাতি লুকিয়ে রাখে। বউয়ের গলার আটআনা সোনার সরু হারখানাও নাকি একদিন ঘুমের মধ্যে সরিয়ে ফেলে উঠোনে মাটির তলায় পুঁতে ফেলেছিল। সন্তু এসে তার মাথায় শাবল তুলতেই চিৎকার করে পাড়া মাথায় তুলে লোক জড়ো করে সবাইকে শুনিয়ে বলেছিল, 'আমার সোনাটুকুন বেচ্‌লি ক্যান তুই! দে, আমারে ফিরাইয়া দে, আমি চইলা যামু যেহানে তুই চক্ষু যায়!'

সন্তুর বউ এখন আর সহ্য করতে পারে না পিসীকে। প্রকাশ্যেই বলে, 'মাগী তুই মর, মর, মর! জ্যান্ত পাঁটা মানৎ আমার—'

সন্তুর পিসী বুকপিঠের কাপড় আলগা করে উঠোনে ধেই ধেই নাচতে নাচতে বলে, 'তরে খাইয়া মরুম। তর হাড়মাংসরক্ত বেবাক খাইয়া মরুম! এই খাই, এই খাই—'

বলতে বলতে হিংস্র ভঙ্গিতে দু' হাত মুখের কাছে ঝাঁকিয়ে দাঁত কড়মড় করে হাড় চিবিয়ে খাওয়ার ভঙ্গি করে!

এমন অবস্থায় সন্তুর বউ যদি পিসীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে চির-কালের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে তা হলে আশ্চর্য হবার কি আছে!

কাজলের মা খুব তীক্ষ্ণ চোখে সন্তুর বৌয়ের মুখ দেখেন। কমবয়েসি মেয়েমানুষ। এখনও বাচ্চাকাচ্চা হয় নি। মুখখানা কচিকাঁচা। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটাখাটুনিতেও শরীরের লাবণ্য ঝরে যায় নি। হাত পা দিব্যি পুষ্ট, ডাঁটালো। কথাবার্তা-চলাফেরায় একটু চঞ্চল ছটফটে ভাব। সে কি সত্যি পিসীটাকে সরিয়ে ফেলতে চায়? কাজলের মা চোখমুখ গম্ভীর করে ভারি গলায় বলেন, 'ডাক্তার লিখে না দিলে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয় না!'

সন্তুর বউ উসখুস করে। কিছু যেন বলতে চায়, বলতে পারে না। কাজলের মা বুদ্ধিমতী। হাসপাতালে রকমারি মানুষের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা। মানুষের মুখ-চোখ দেখে শরীরের অসুখ, মনের অসুখ আঁচ করতে পারেন। সন্তুর বৌয়ের টসটসে যৌবনের ছটফটে ভাব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জরিপ করে তিনি প্রশ্ন করেন, 'তোমার পিস্‌শাশুড়ি সারারাত ঘুমোয় না? রাত জেগেও ঝগড়া করে নাকি?'

'না দিদি। তা না—'

'তবে কি? বল, খুলে বল আমাকে। ঘুমের ওষুধ বেআইনি জিনিশ! জানাজানি হলে পুলিশ আসবে কিন্তু!'

পুলিশের নাম শুনে সন্তুর বৌয়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়। গাঁয়ের লেখাপড়া না-জানা মূর্খ মেয়ে সে। কাজলের মা'র সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কেন! মুখ কালো করে বলে, 'থাক দিদি, আমার ওষুধ চাই না!'

'বারে, চাইলে যে একটু আগে ?'

সন্তুর বৌ যেন জাঁতাকলে পড়ে যায়। ভয়ভাবনায় ক্লিষ্ট মুখে তাকায় এদিকেওদিকে। তারপর আরো কাছে সরে এসে চোখ নামিয়ে লজ্জাজড়ানো গলায় ফিসফিস করে বলে, 'তোমাকে বলতে দোষ কি দিদি, তুমি তো ডাক্তারের মতই। লোকে বলে, ওঝাবদ্যি আর গুরুর কাছে কোনো কথা লুকোতে নেই—'

সন্তুর বৌ আস্তে আস্তে সব কথা খুলে বলে।

দিনের বেলা যেমন হোক, রাত্রে একখানা ঘর নিয়ে হয় মুস্কিল। কে কোথায় শোবে ? ঘরের একদিকে একখানা তক্তাপোষ, অন্যদিকে হাঁড়িকুড়ি বাক্সপ্যাঁটরা—সংসারের টুকিটাকি নানান জিনিশ। মাঝখানে হাতদুই ফাঁকা জায়গা। সন্তু আর সন্তুর বৌ তক্তাপোষে শোয়। পিসী নীচে। কিন্তু পিসী সারারাত ঘুমোয় না। শিয়রের কাছে আবার আলোও জ্বালিয়ে রাখতে চায়। আলো নিবিয়ে দিলে অন্ধকারে কে নাকি তার বুকে পাথর চাপা দিতে আসে !

সন্তু বিছানায় শুয়ে গজগজ করে, 'পিসী, আলো নেবাও। তেল সস্তা হয়েছে ? পয়সা লাগে না কিনতে ?'

পিসী কল ঘুরিয়ে পল্‌তে নামিয়ে দেয়। কিন্তু নেবায় না। একটু পরেই হাত বাড়িয়ে আবার উস্কে দেয়। সারা ঘর আলো হয়ে যায়।

সন্তুর বউ ছিটকে সরে আসে স্বামীর কাছ থেকে। সন্তু রেগে উঠে যা মুখে আসে গাল দেয় পিসীকে। একেক দিন বিছানা থেকে উঠে এসে দরজা খুলে টেনেহিঁচড়ে বাইরেও বের করে দেয়। তখন রাতদুপুরে শুরু হয় পিসীর মড়াকান্না। আশেপাশের ঘরের লোক ঘুম ভেঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়ে টর্চ লাঠি হ্যারিকেন নিয়ে ছুটে আসে। সন্তুর পিসী কাঁদতেই কাঁদতেই বলে, 'আমার পয়সায় ঘর। আমার গলার হার বেইচা, চুড়ি বেইচা, আমারে পথে বসাইয়া ঘর বানাইল সন্তু। এহন আমারে শুইবার দেয় না ঘরে, ঘরে থনে উঠানে ছুইড়া ফ্যালায়। কুত্তাকুত্তির কাণ্ড দেখ তোমরা—'

সন্থ রাগে কাঁপে। সন্থর বৌ কাঁপে লজ্জায়।

প্রতিবেশীরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পিসীকে আবার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু পিসী ঘুমায় না। সারারাত পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকে।

একেকদিন চুপিসারে সন্থর বিছানার মশারি তুলে উঁকি মারে পিসী। সন্থর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে, 'ওঠ! ডর লাগে আমার! কে য্যান পাথর বসাইতে আইল বুকে, অ সন্থ—'

তারপরই সন্থর বৌয়ের প্রায় নগ্ন এলোমেলো শরীরের দিকে তাকিয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে। বলে, 'মরণ! অ মাগী! তর কাপড় কোন্‌হানে—'

শুনতে শুনতে স্তব্ধ হয়ে যান কাজলের মা। তার প্রৌঢ় মুখেও লজ্জার ঘন ছাপ পড়ে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন তিনি। কিন্তু সন্থর বৌয়ের চোখে জল টল মল করে। নতমুখে পায়ের নখ খুঁটতে খুঁটতে সে বলে, 'লজ্জা দিদি! কি লজ্জা! আমি ঘরে থাকি কি করে! ঘর যে নরক করে দিল দিদি! আমার মানুষটা কোনদিন না খুনই করে ফেলে পিসীকে—'

বোলপুর থেকে ফিরে এলে ঘোষালমশাই কাজলকে ডেকে পাঠান। কাজলের মা নালিশ করে গেছেন তাঁর কাছে। ছেলে পড়াশুনা করে না, নিয়মিত কলেজে যায় না। রাস্তাঘাটে মিছিল নিয়ে বেরোয়, পোস্টার মেরে বেড়ায়। হাসপাতালের সহকর্মীরা সতর্ক করেছে কাজলের মাকে। কাজলের মা ঘোষালমশাইকে বলেছেন। ধরতে গেলে তিনি তো ও-বাড়িরও অভিভাবক। কাজল তাঁর কথা শোনে। তাঁকে মান্য করে।

ঘোষালমশাই কাজলকে বারান্দায় বসিয়ে কিছুটা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করেন, 'যখন ছাত্র, তখন তো ছাত্রের মতই থাকতে হবে, নাকি? পড়াশুনা বাদ দিলে চলবে কি করে? মিছিল-মিটিঙে কি পরীক্ষা পাশ হবে?'

কাজল খুব বিনয়ের সঙ্গে জবাব দেয়, 'এসবও একরকম পড়াশুনা মেসোমশাই!'

ঘোষালমশাই খুশি হন না। বলেন, 'সবকিছুরই একটা সময় আছে বাবা। আগে পড়া শেষ করে স্বাবলম্বী হও। তারপর যা খুশি করবে।'

কাজল আর উত্তর দেয় না। চুপ করে কি যেন ভাবে। এই সমাজে স্বাবলম্বী হওয়া যে সহজ নয়, ক'পাতা পড়ে কয়েকটা পরীক্ষায় পাশ দিলেই যে তা হওয়া যায় না, হয়ত তার কথাই ভাবে। কিন্তু বুড়োমানুষটির সঙ্গে আর তর্ক করে না। ভেবেচিন্তে অন্য কৌশল নেয়। স্নেহলতাকে ডেকে বলে, 'ও মাসীমা, বারান্দায় একটা আলো থাকত আগে, এখন নেই কেন? অন্ধকারে মশা কামড়াচ্ছে—'

মাসীমা ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দেন, 'থাকবে কি করে! শহর থেকে কেরোসিন তো উধাও! তোমার মেসোমশাই বুড়োমানুষ, টিন নিয়ে সকালে সারা বাজার খুঁজে এসেছেন—'

কাজল বলে, 'জটিল তো সেদিন ওইকথাই বলেছিল। শুধু কেরোসিন না মাসীমা, আর কদিন পরে চালও উধাও হবে। খরা শুরু হয়েছে। মহাজনেরা পুরনো চাল লুকিয়ে ফেলছে—'

'তাহলে কি হবে বাবা?' মাসীমার কণ্ঠে উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 'চিনি নেই, কয়লা নেই, কেরোসিন নেই। চালটুকুও পাওয়া যাবে না? মানুষ বাঁচবে কি করে?'

'আর কেমন দাম বাড়ছে জিনিশের?'

'সে তো রোজই বাড়ছে, বাবা!'

'ওই দাম কমানোর জন্য, লুকিয়ে-রাখা জিনিসপত্র বের করার জন্য আমরা মিছিল করি, পোস্টার লিখি, মিটিং ডাকি। ভাল করি না মাসীমা?'

স্নেহলতা তৎক্ষণাৎ বলেন, 'কর না আবার! ঠিক কর!'

ঠোঁটের কোণে মিটিমিটি হাসি ফুটিয়ে কাজল বলে, 'কাল ডি, এমের অফিস ঘেরাও করবে ছাত্ররা। পরশু আসবে কৃষক মিছিল—'

মাসীমা বলেন, 'রাখ ঘেরাও করে। গাঁ-ঘরের গরীবমানুষ গুণ গাইবে বই নিন্দে করবে না তোমাদের।'

কাজল আর কিছু বলে না। ঘোষালমশায়ের দিকে তাকায় আর হাসে। অন্ধকারে হাসিটা অবশ্য দেখতে পান না তিনি। কিন্তু মনে মনে কাজল ও স্নেহলতা উভয়ের উপরেই অসন্তুষ্ট হ'ন। পারুল বুঝে ফেলে সব। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে শুনছিল ওদের কথা। কাজলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি খুব চালাকি করলে কাজলদা! প্যাঁচে ফেলে মাকে দলে টেনে নিলে।' মা'র দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি ভারি বোকা আছ মা! দেখছ বাবা কাজলদাকে বকছে—'

পারুলের মা'র হুঁস হয়, 'কেন, বকছে কেন ছেলেটাকে?' পারুল বলে, 'বকবে না! ক'মাস বাদে টেস্ট পরীক্ষা, আর দিব্যি উনি অষ্টাঙ্গে ধুলো মেখে মিছিল মিটিঙ্ করে বেড়াচ্ছেন। তিন দিন তো বাড়িতেই ছিলেন না বাবু—'

এবার স্নেহলতার মুখ গম্ভীর হয়, 'না বাবা, ওসব কি কথা! কত কষ্ট করে তোমার মা পড়ার খরচ যোগাচ্ছেন—'

এবার কাজলের হাসি গুটিয়ে যায়। ভুরু কুঁচকে সে তাকায় পারুলের দিকে। পারুল আর কথা বলে না, মিটি মিটি হাসে।

একটু পরেই সরোজ আর উৎপল আসে। কোনো ভূমিকা না করেই সরোজ বলে, 'নাইটগার্ড নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে মেসোমশাই।'

ঘোষালমশাই বলেন, 'কেন, ঝামেলা কিসের?'

'পাড়ায় অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা, একপক্ষ রাজি হয় ত অন্যপক্ষ বেঁকে বসে।'

'কেন? বেঁকে বসে কেন?'

'সে অনেক কথা মেসোমশাই। কেউ বলে, বাড়িতে একা পুরুষ-মানুষ, বেরোই কি করে! কেউ বলে, নাইট ডিউটি, সময় কই? কেউ বলে, রাতে বেরুলেই বুকে সর্দি বসবে! একেকজনের একেক রকম অজুহাত—'

কাজল বলে, 'সে তো হবেই সরোজদা। এ যে মধ্যবিত্তের পাড়া। আরো বোঝাতে হবে মানুষকে। কাল আমি ঘুরব পাড়ায়—'

সরোজ একটু ভেবে বলে, 'না কাজল, তুমি একা ঘুরবে না। তাতে কেস্ আরো কেঁচে যাবে। রাজনীতির গন্ধ খুঁজবে অনেকে। বরং মেসোমশাইকে নিয়ে বেরোয়—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'ঠিক আছে, আমিও যাব সঙ্গে, বুঝিয়ে বলব সবাইকে।'

কিন্তু পরের দিন ঘোষালমশায়ের আর বেরুনো হয় না। সারা সকাল তিনি ঝাঁটা কোদাল খুরপি হাতে গোয়ালঘর পরিষ্কার করেন। অনেকদিন হাত দেওয়া হয়নি। গরুর চোনা আর গোবরের সঙ্গে খড়ের কুচি, ঘাস-পাতা-তরকারির খোসা মিলেমিশে পচেহেঁজে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এ অবস্থায় গাইদুটোর অসুখও হতে পারে। স্নেহলতার উপর রান্নার ভার ছেড়ে দিয়ে পারুলও তাঁকে সাহায্য করে। কুয়ো থেকে বালতি বালতি জল তোলা হয়। ঘোষালমশাই কোদাল দিয়ে চেছে চেছে মেঝে পরিষ্কার করেন। মেঝে বাঁধানো নয়, শুধু ইট পাতা। ইটের ফাঁক থেকে খুরপি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নোংরা তোলেন। ঝাঁটা দিয়ে দেয়ালের ঝুল ঝাড়েন। পচা দড়ি খড় এক জায়গায় জড়ো করে পারুলকে বলেন, 'ঝুড়ি করে বাইরে লেবুতলায় রাখ পারু। সার হবে।' তারপর জল ঢেলে গোটা ঘর সুন্দর করে ধুইয়ে দিতে দিতে ছোট মেয়েকে বলেন, 'দৌড়ে একবার কাজলদের বাড়ি যা তো। একটু ফিনাইল চেয়ে নিয়ে আয়। চাদ্দিকে ছড়িয়ে দিই।'

এইসময় এক কাণ্ড হয়। ঘরের কোণা থেকে ইটের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ একটা সাপ উঠে আসে। গোয়ালঘরের চারদিকে কোনো জানালা নেই। একটি মাত্র দরজা। সাপটা দ্রুতগতিতে দরজার দিকে এগোয়। ঘোষালমশাই লাফ দিয়ে একপাশে সরে যান। ভয় পান না, চিৎকার করেন না। এই ডাঙ্গাপল্লীতে সাপ কিছু নতুন

বস্তু নয়। ধানমাঠ থেকে প্রায়ই উঠে আসে। ঘোষালমশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাপের দিকে নজর রেখে পায়ে পায়ে এগুতে থাকেন। হাত দুই লম্বা খয়েরি রঙের সাপটা দরজা ডিঙিয়ে বাইরে আসে। পরিষ্কার আলোতে তার শরীর দেখে দাসমশাই চমকে ওঠেন। এতো হেলে নয়, বিষাক্ত সাপ! কি ভাগ্য, গরুছুটোর ক্ষতি করে নি।
বাইরে এসে ঘোষালমশাই সরু কিন্তু শক্ত দেখে একখানা বাঁশ তুলে নেন। তারপর সাপটা সরসর করে এগিয়ে তুলসীমঞ্চের কাছে গিয়ে একটু থামা মাত্র ঘোষালমশাই গায়ের সমস্ত জোর একত্র কবে মাথায় আঘাত করেন। পারুল কুয়ো থেকে জল তুলছিল। শব্দ শুনে সে বলে ওঠে, 'কি হ'ল বাবা? কি?'

ঘোষালমশাই জবাব দেন না। আহত উদ্যতফণা সাপটার মাথায় আরো কয়েকবার আঘাত করে ঘাড়মাথা থেঁৎলে দেন। তারপর পরিশ্রমে উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকেন।

পারুল এগিয়ে এসে শিউরে ওঠে, 'বাবা, এ যে কেউটে মনে হচ্ছে!'

ঘোষালমশাই হাঁফাতে হাঁফাতে বলেন, 'না, কেউটে না, কেউটের রং এমন খয়েরি হয় না। অন্য জাতের, বিষ আছে।'

বাঁশের ডগায় সাপটা তুলে তিনি নিজেই ধানমাঠে ফেলে দিয়ে আসেন।

অতিরিক্ত খাটাখাটুনি, জল ঘাঁটাঘাঁটি আর অবেলায় স্নান—এসব কারণেই বিকেলের দিকে গা গরম হয়ে জ্বর এসে যায় ঘোষাল-মশায়ের। হাঁপানির টানও ওঠে। পাড়ায় ঘুরবে বলে কাজল খোঁজ করতে এসে দেখে, মোটা কাঁথা গায়ে জড়োসড়ো শুয়ে শীতে কাঁপছেন ঘোষালমশাই। চোখ জবাফুলের মতো লাল। মাসীমা এক পাশে বসে আছেন। পারুল পায়ের পাতায় গরম তেল ঘষে দিচ্ছে।

কাজল বলে, 'হঠাৎ জ্বর এল যে? মেসোমশায়ের এমন তো হয় না।'

পারুল এবং স্নেহলতা উভয়েই ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, 'হবে না! এই

বয়সে জলেকাদায় এত পরিশ্রম। জটাধারীকে বললে সে একটা মুনিষ এনে সাফ করিয়ে দিত—'

ঘোষালমশাই বিড়বিড় করেন, 'বিনিপয়সায় দিত? মজুরি লাগত না? বাড়তি আছে দুটো টাকা ঘরে?'

কাজল ধমকের মত বলে ওঠে, 'আঃ, আপনি আবার কথা বলছেন কেন? চুপ করে শুয়ে থাকুন!'

যেন এখন সে-ই এই রুগ্ন মানুষটির অভিভাবক।

পারুলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আর একটা কাঁথাকম্বল চাপা দে পারুল। থার্মোমিটার আছে? নেই? আমাদের ঘরে আছে। তুই যাতো কালী—'

কালী গিয়ে গৌরীর কাছে চেয়ে থার্মোমিটার নিয়ে আসে। কাজল জ্বর পরীক্ষা করে বলে, 'একশ এক। অত ভাবনার কিছু নেই। মা ডিউটিতে গেছে। আমি ওষুধ নিয়ে আসব হাসপাতাল থেকে—'

ঘোষালমশাই বলে ওঠেন, 'একটু কার্বোলিক এসিড চেয়ে আনবে তো বাবা, গোয়ালঘরে রেখে দেব। সাপের উৎপাত হচ্ছে—'

ওষুধ নিয়ে ফিরে আসতে কাজলের কিছুটা রাতই হয়। এ বাড়ি তখন প্রায় অন্ধকার। মশারি খাটিয়ে স্নেহলতা আর কালী শুয়ে পড়েছে। পারুল ঘোষালমশায়ের ঘরে বসে লণ্ঠনের মৃদু আলোতে গৌরীর আসনের চারদিকে লাল পাড় সেলাই করে দিচ্ছে। ওই কাজটা গৌরী শেষপর্যন্ত তার ঘাড়েই চাপিয়ে গেছে।

বাইরে সাইকেলের শব্দ হতেই পারুল বুঝতে পারে কাজল এসেছে। তার সাইকেলের বিশেষ শব্দটুকুও তার চেনা। সে এসে দরজা খুলে দেয়। কাজল ঘরে ঢুকে ওষুধপত্র বুঝিয়ে দিয়ে বলে, 'এরি মধ্যে রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল পারুল?'

পারুল বলে, 'রান্নাবান্না আবার কি। এখন একবেলা উনুন ধরাই। রাতের রুটি-তরকারি দুপুরে করে রাখি। অত কয়লা কোথায় পাব?'

ঘোষালমশাইও ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর জ্বরও একটু কমেছে। শ্লেষ্মাজড়িত গলার ঘড়ঘড়ানির সঙ্গে নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাজল আর পারুল ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

শ্রাবণ শেষ হতে যাচ্ছে—কিন্তু বৃষ্টি নেই। নির্মেঘ আকাশে আজ ফুটফুটে জ্যোৎস্না। উঠোনের গাছপালা, তুলসীমঞ্চ, কুয়োতলার বাঁধানো চাতাল—সাদা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাজল মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে বলে, 'কিসের একটা সুন্দর গন্ধ আসছে পারুল?'

পারুল বলে, 'গন্ধলেবুর। বড় বড় লেবু ধরেছে গাছে। নেবে দুটো?'

কাজল হেসে ফেলে, 'ধেৎ, লেবু দিয়ে কি হবে?'

'কেন? ডালে মেখে খাবে। খুব সুন্দর লাগে!'

বলতে বলতে পারুল কুয়োতলায় নেমে যায়। ও-পাশটায় লেবু গাছ। সারাক্ষণ জল পেয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ডালপালা ছড়িয়ে দিব্যি ঝাঁকালো হয়ে উঠেছে। বড় বড় লেবুও ধরেছে অনেক। পারুল কিন্তু লেবু তোলে না। রাতে গাছের ফল তুলতে নেই। কয়েকটা কচিপাতা ছিঁড়ে তেলোতে রেখে দু'হাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে ফিরে এসে কাজলের মুখের সামনে হাত ছড়িয়ে বলে, 'দেখ কাজলদা, কি সুন্দর গন্ধ! কোথায় লাগে তোমার দামি সেণ্ট!'

কাজল হঠাৎ পারুলের দুটো হাত ধরে ফেলে। তারপর নিজের গালে কপালে ঠোঁটে নরম হাতদুটো ঘষতে ঘষতে বলে, 'সত্যি রে পারুল, ভারি মিষ্টি গন্ধ!'

পারুলের সারা শরীর কেমন যেন অবশ হয়ে যায়। লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে মুখ। বুকের ভেতর থরোথরো কাঁপুনি জাগে। এমন কাণ্ড যে করবে কাজল—সে তো ভাবে নি। হাতদুটো সবলে টেনে নিয়ে ছটফটে ভঙ্গিতে একটু পিছিয়ে যায় সে। বড়ো বড়ো দুই চোখের পাতা টান-টান করে ধনুকের মতো ভুরু বাঁকিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে বলে, 'তুমি তো ভারি দুষ্টু হয়ে উঠেছ কাজলদা। দাঁড়াও, বাবাকে বলে বকুনি খাওয়াচ্ছি তোমায়!' বলেই কিন্তু ঝর ঝর করে হেসে ফেলে।

নাইটগার্ডের ব্যাপারটা পাকাপাকি কিছু হবার আগেই পাড়ায় সাংঘাতিক রকমের চুরি হয়ে যায় আরেকটা। নগেনবাবুর বাড়ির কাছেই চন্দ্রনাথবাবুর ছোট একতলা বাড়ি। চন্দ্রবাবু একটা সাব্ পোস্টাফিসের পোস্টমাষ্টার। সাইকেলে রোজ ষোলমাইল যাতায়াত করে অফিস করেন। গরমে খোলা জানালার ধারে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল তার বউ। মই লাগিয়ে কাঁচ-বসানো উঁচু-পাঁচিল টপকে চোরেরা উঠোনে নামে। তারপর জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে একজন চন্দ্রবাবুর বউয়ের কানের একটা দুল, অন্যজন ডানহাতটা শক্ত থাবায় ধরে ক'গাছা চুড়ি টেনে-হিঁচড়ে খুলে নেয়। এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে যে ঘুম ভেঙে চন্দ্রগিন্নী চিৎকার করার আগেই চোরেরা পালিয়ে যায়।

পাড়ার লোক জড়ো হয়ে দেখে, চন্দ্রগিন্নী ভয়ে আতঙ্কে হতজ্ঞান, কাপড়জামা এলোমেলো, থর থর করে ঠোঁট কাঁপছে, কানের লতিতে জমাট রক্তরেখা। চন্দ্রবাবু মধ্যবয়স্ক রোগা পাতলা দুর্বল মানুষ। তিনিও উদ্‌ভ্রান্ত অপ্রকৃতিস্থের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। তখন ভোররাত। সরোজ বন্দুক নিয়ে ছুটে গিয়ে ধানমাঠের কাছে দাঁড়িয়ে ফাঁকা আওয়াজ করল। উৎপল কাজলেরা বর্শা আর টর্চ হাতে পুকুরপাড় অব্দি ছুটে গেল।

অসুস্থ শরীর নিয়েও ঘোষালমশাই ছুটে এলেন। তাঁকে দেখে চন্দ্রবাবু বিড় বিড় করে বললেন, 'থাকব না। এ পাড়ায় আর থাকব না আমি।'

ঘোষালমশাই চন্দ্রবাবুর পাশে বসে তার পিঠে হাত রেখে বোঝাতে লাগলেন, 'ও চাঁদুবাবু, বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখ। বুঝদার মানুষ তুমি, বাড়ি বিক্রির কথা কেন তুলছ? শহরে গেলে কি পার পাবে? শহরে চুরি হয় না?'

চন্দ্রবাবু বলেন, 'চুরি কোথায়, এ ত ডাকাতি!'

উৎপল কাজলরা ফিরে আসে। যথারীতি নগেনবাবু দোতলার ছাদের উপর থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছয় ব্যাটারীর টর্চ ফেলেন। খরায় ঝলসে-যাওয়া ধানমাঠে, গাছগাছালির মাথায় সে আলো ছায়াময় বৃত্ত

তৈরি করে ঘুরপাক খায়। পাড়ার বেওয়ারিশ কুকুরগুটো চিৎকার করতে থাকে। সিউড়ি-ইলামবাজার বাসের ড্রাইভার নরেন গোঁসাই আসে ছুটতে ছুটতে—'বাবু, আমার মইটা পাচ্ছি না, নতুন বাঁশের মই—'

সকলেরই মুখ থমথমে, গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সত্যি তো, চুরি তো বলা যায় না একে, রীতিমত বলপ্রয়োগ করে ডাকাতি! এরপর কোন্‌দিন সশব্দে দরজা ভেঙ্গে ঢুকবে ঘরে। পুরুষের ঘাড়েগলায় দা'-এর কোপ বসিয়ে মেয়েদের গা থেকে গয়নাগাটি খুলে নেবে।

ঘোষালমশাই তাকান সরোজের দিকে, 'কি করবে? থানায় যাবে নাকি একবার?'

'থানায়? থানায় গিয়ে কি হবে?' অনেকগুলো গলা প্রায় একসঙ্গে সরব হয়ে ওঠে, 'এ পাড়ার কোন্‌ চুরির কি বিহিত হয়েছে থানায় গিয়ে?'

সিদ্ধেশ্বর এসেছিল। সে বলে ওঠে, 'আমি তো থানায় গিয়েছিলাম, সাইকেল চুরির ডাইরি করতে। বড় দারোগাবাবু উল্টে ধমকাল আমাকে, 'নিজেদের জিনিশ নিজেরা সামলে রাখতে পার না!'

একজন বলল, 'আমাকেও দারোগা বলেছিল, 'আপনাদের ঢিলেমির দোষেই চোরেরা এমন প্রশ্রয় পাচ্ছে। একটু সজাগ থাকতে পারেন না? রাতে ঘুমোন কেন বেহুঁস হয়ে!'

যেন চোরের না, অপরাধ এই পাড়ার মানুষদেরই!

এখন চুরিচামারি হলে আর থানায় যেতে চায় না তারা। থানা সম্পর্কে বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের। কম করে হলেও ত্রিশচল্লিশটা চুরি হয়েছে পাড়ায়, একটারও কি কিনারা হয়েছে? একটা থালা-বাটিগ্লাসও কি উদ্ধার করে দিতে পেরেছে ওরা? বছর তিন-চার আগে থানায় গেলে কখনো জীপগাড়ি হাঁকিয়ে, কখনো সাইকেল ছুটিয়ে তবু দু'একজন তদন্তে আসত, এদিকওদিক ঘোরাঘুরি করত, একে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করত, ধমকধামক দিত—এখন আর কেউ আসে না। সাধারণ একটা সিপাই পর্যন্ত না। থানায় গেলে কপাল

ভুরু কুঁচকে বলে, 'ওসব ছিঁচকে চোরের পেছনে ছুটে বেড়ানোর সময় নেই আমাদের। দেখছেন না জেলার হালচাল? আমাদের এখন মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল অবস্থা—'

অথচ অবস্থাটা কি এবং কেন ভেঙে বলে না। পাড়ার ছা-পোষা মানুষগুলো কেরানি-পিওন-ড্রাইভার-স্কুলমাস্টারেরা পরিষ্কার করে কিছু বুঝতেও পারে না। এমনিতে এই রুক্ষ-লালমাটির অঞ্চল চিরকালের শান্ত ভদ্র নিরীহ অঞ্চল। সেই কবে কোন্‌কালে সাঁওতালেরা একবার ক্ষেপে উঠেছিল। সিধু কানুর নেতৃত্বে 'হুল্' হয়েছিল। রাঙামাটি কালো সাঁওতালের লাল রক্তে আরো লাল হয়েছিল। একশ বছর আগের সেই বড় লড়াইটার কথা বাদ দিলে এ অঞ্চলে আর কোনো বড় রকমের গোলমাল হয় নি। স্বাধীনতার যুদ্ধ হয় নি, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয় নি, মেদেনীপুরের মত স্বদেশী আন্দোলন হয় নি, চট্টগ্রামের মতো অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয় নি, ফসলের তে-ভাগা নিয়ে সুন্দরবনের মত লড়াই হয় নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একটা বোমাও পড়ে নি। এই শান্ত শীতল নিরাপদ অঞ্চলে এমন কি ঘটল বা ঘটতে যাচ্ছে—যার জন্য তাদের 'কুকুর পাগল' অবস্থা? রাজনগর-মল্লারপুর-নলহাটি এলাকায় কিছু কিছু কৃষক-আন্দোলনের কথা অবশ্য জেলার কাগজগুলিতে প্রচারিত হয়েছে। জমি দখলের জন্য কিছু দলবদ্ধ চেষ্টার কথা শোনা গেছে। ফসলের মরসুমে ধান কাটা নিয়ে জোতদারদের লোকের সঙ্গে চাষীদের কিছু কিছু সংঘর্ষও হয়েছে, দূর কোন্ গাঁয়ে কাদের হাতে যেন একজন জোতদার খুন হয়েছে, আর কারা যেন রামপুরহাটের কাছে ছোট একটা গ্রাম্য থানার উপর চড়াও হয়ে দুটো বন্দুক চুরি করে নিয়ে গেছে—ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত এইসব ঘটনাকেই কি তারা 'মাথার ঘা' বলে নির্দেশ করছে?

সে যা-ই হোক, এখন থানায় গেলে তারা থালাবাসন গরুছাগল চুরির ডাইরি নিতে প্রকাশ্যেই অস্বীকার করে। রুষ্ট ভঙ্গিতে বলে, 'নিজেরা যা হয় করুন গে মশাই, আমাদের জ্বালাবেন না।'

ডাঙাপল্লীর দরিদ্র মানুষেরা চোরের সন্ধানে কখনো-সখনো নিশিন্দা

থেকে ভাঙ্গা শিবমন্দিরের পূজারীকে ধরে আনে। সে নাকি গুণীন। বাণ মারতে জানে, কড়ি চালাতে, বাটি চালাতে জানে। কখনো কারো বুড়ো আঙ্গুলের নখে পুরু করে কাজল লেপে দিয়ে মন্ত্রপাঠ করে বলে, দেখো দিকিন বাবা, চেনাজানা কারো মুখ ভেসে উঠছে কি না! উঠছে না? ভাল করে দেখ—'

একবার সরোজের নখেও সে কাজল লাগিয়েছিল। সরোজ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'দেখতে পাচ্ছি ঠাকুরমশাই, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—'

গুণীনের সারা শরীর আবেগে দুলে উঠেছিল, 'কার মুখ বাবা? কার মুখ?'

সরোজ বলেছিল, 'বগা মুচি আর লখা ডোমের।'

গুণীন একগাল হেসে বলেছিল, 'ঠিক দেখেছ বাবা। বগা-লখা নিশিন্দার নাম করা চোর। চোরের দল আছে তাদের। দু'মাস ফেরার ছিল, আবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে।...আর কি দেখছ বাবা?'

সরোজ আরো গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'নিশি স্যাকরা আর মদন সরকারের মুখ!'

শোনা মাত্র সাপের ল্যাজে পা পড়ার মত আঁতকে উঠেছিল গুণীন! ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। সরোজ হাসছিল ঠোঁট টিপে টিপে। কাজল উৎপল জটিলেরাও হাসছিল। গুণীন ভয় পেয়ে বলেছিল, 'ওরা যে গাঁয়ের মাথা বাবা! বগা-লখার সঙ্গে ওদের মুখ কেন ভেসে উঠবে? ভাল করে দেখ বাবা আরেকবার—'

বস্তুত, এ পাড়ায় কারা নিয়মিত চুরি করতে আসে, কারা সেই চোরাইমাল কেনে, ধীরে সুস্থে কারা অন্যত্র পাচার করে, কার মারফৎ কোথায় পাচার হয়, এ সব তথ্য এ পাড়ার মানুষজনের কাছে আজ আর অজানা নয়। ঘরের মেয়েবউরাও জানে। সব চেয়ে বেশী জানে থানা পুলিশ। নিশিন্দার মদন সরকারের ধান-চালের গদীতে হানা দিলে কিংবা তার অনুগত বশংবদ নিশি স্যাকরার ঘরে তল্লাসি চালালে এ পাড়ার অনেক কাঁসাপিতল সোনারূপার

খোঁজ পাওয়া যায়। চাই কি, চন্দ্রগিন্নীর চুড়ি ক'গাছা আর কানের মাকড়িটা আজ সকালেই পাওয়া যেতে পারে নিশিনাথের ঘরে। কিন্তু কে যায়? কে খোঁজ করে? সরকারবাবুরা হলেন নিশিন্দার তাবৎ সম্পত্তির মালিক। জমিজমাপুকুর আড়ৎ ধানকল গমকল আশেপাশের সাতখানা গাঁয়ের ব্যবসা বাণিজ্য। অঞ্চলপঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ তারা, জেলা পরিষদের মাননীয় সদস্য। এ তল্লাটের বড়ো-লোকী রাজনীতিতে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তারা বেঁকে বসলে বিধানসভার প্রার্থী মনোনয়ন হয় না, চাঁদা না দিলে ভোটের খরচে টান ধরে। তারা সন্তুষ্ট না থাকলে পুলিশের চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে, থানার ও. সি দূরদূরান্তে বদলি হয়ে যায়।

তবে রাজনীতিতে মিল থাকলেও এখন ভাইয়ে ভাইয়ে তেমন মিল নেই। জমিজমা বিষয়সম্পত্তির স্বত্বস্বামিত্ব নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা চলছে দীর্ঘকাল। ওই মামলা করে-করেই ছোটভাই মদন সরকার নিঃশেষ হতে বসেছে। হাটতলার গদীতে ধান চাল কেনাবেচার ব্যবসাটুকু ছাড়া এখন তার উপার্জনের প্রায় সব পথই বন্ধ। জমিজমাপুকুর, সঞ্চিত অর্থ, সোনাদানা সবই সদর কোর্টের সরু খাল দিয়ে হাইকোর্টের প্রশস্ত নদীতে ভেসে গেছে। কাকা জ্যাঠার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কে কখন কার মাথায় লাঠি বসায় ঠিক নেই। ওদিকে সর্বজ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন সরকার মেজভাই নকুল সরকারকে খুনের আসামী করে মামলা লড়ছেন। নকুল নাকি সম্পত্তির লোভে বৃন্দাবন সরকারের একমাত্র সন্তানকে ডাবের জলের সঙ্গে পোকা মারার তরল বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিল। সেই মামলাও এখন হাইকোর্টে। বৃন্দাবনের ছেলে খোকন নকুলের বিরুদ্ধে নিশিন্দায় দল গড়েছে। সুযোগ পেলেই সে নাকি কাকার মুখে ডাবের জলের বদলা হিসেবে গঙ্গাজল দেবার ব্যবস্থা করবে!

কাজল নিশিন্দায় যাতায়াত করে। শরৎ মাস্টারের কাছে সে সব শোনে। কিছু নিজের চোখেও দেখে। পাড়ায় এসে সরোজ শিশিরদের কাছে গল্প করে। বলে, 'এমনিতে নিজেদের মধ্যে মুখ

দেখাদেখি বন্ধ, খুনোখুনিও হতে পারে, কিন্তু দু'একটা ব্যাপারে একসঙ্গে আবার সুন্দর মিলে যায় সবাই। যখন নিশিন্দার মুনিষ-কামিনরা ধান মাঠে বাড়তি মজুরি চায় কিংবা ফসলের ভাগ নিয়ে এককাট্টা হয়ে লড়াই শুরু করে—তখন। সরকারগোষ্ঠীর যে যেখানে আছে খুড়োজ্যাঠা জামাই ভাগ্নে সবাই তখন দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৃন্দাবন যদি বলে, 'শালা', নকুল বলে, 'শুয়োরের বাচ্চা,' আর মদন চোখ রাঙিয়ে বলে, 'বাঞ্চোৎ! দল পাকানো হচ্ছে!' বৃন্দাবনের ছেলে খোকন সরকার হুমকি দেয়, 'হাতে দেখছি আবার লাল ফলেগ্। গলাটা একটানে ছিঁড়ে ফেলব মুরগীর মত!' তখন আমাদের ওই উনি—'

চোখের ইশারায় কাজল নগেনবাবুর বাড়ি দেখিয়ে বলে, 'উনিও ঘাপটি মেরে থাকেন পেছনে! আর থাকে বগা মুচি লখা ডোমের মত দাগী আসামীরা। লাঠি হাতে খাড়া থাকে।'

সব শুনে সরোজ বলে, 'হ্যাঁ, ওদের প্রশ্রয়েই তো বগা-লখাদের এত সাহস। বুকের পাটা ফুলিয়ে চুরি করতে বেরোয়—'

শিশির বলে, 'ওদের জন্যই তো থানা পুলিশ চোখ উল্টে থাকে। সরকারবাবুদের পোষা চাকর তো সব—'

জটিল বলে, 'লুঠের ভাগও পায় তারা। থানার সঙ্গে মাসকাবারি ব্যবস্থা আছে।' বলেই সে ঘাবড়ে যায়। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে, 'আমি অবশ্য ঠিক জানি না। পাঁচজনে বলে তাই বললাম!'

এ অবস্থায় হাতে নাতে চোর ধরতে না পারলে এবং ধরার পর তার শারীরিক দণ্ডবিধানের কিছু ব্যবস্থা নিজেরা না করতে পারলে—চুরি বন্ধ হওয়া অসম্ভব।

সুযোগ বুঝে ঘোষালমশাই চন্দ্রবাবুর উঠোনে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে বলেন, 'থানায় যদি যাবে না, তাহলে কি করতে চাও তোমরা? বল, কি করতে চাও?'

সরোজ আর কাজল পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। চোখে

চোখে কিছু কথা হয়। সরোজ বলে, 'আপনি বলুন মেসোমশাই, আপনার কথাই আমরা শুনব—'

কাজলও গলা চড়িয়ে বলে, 'হ্যাঁ মেসোমশাই। আপনি পাড়ার সবচেয়ে পুরনো মানী মানুষ, আপনি বলুন, আপনার কথা সবাই শুনবে!'

তখন ঘোষালমশাই চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে জোর গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে বলেন, 'নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদের হাতে। থানা পুলিশের ভরসায় থাকলে সর্বস্ব যাবে আমাদের। আজ চন্দ্রবাবুর বউয়ের গায়ে হাত দিয়েছে, কাল আরেকজনের শরীর ধরে টানাটানি করবে। ঘরের মেয়েবউয়ের ইজ্জত নষ্ট হবে। পাড়ায় নাইটগার্ড চালু কর তোমরা! পারলে কাল থেকেই—'

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সায় দেয় সবাই। সরোজ বলে, 'কাল রবিবার। কালই মিটিঙ্ ডেকে দিন মেসোমশাই—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'ডাকা হ'ল। কাল বিকেল তিনটেয় আমার বাড়িতে মিটিঙ্ ডাকা হ'ল। সবাই আসবে তোমরা—'

পারুল মুখ ভার করে বলে, 'এ বাড়িতে মিটিঙ্ ডাকলে কেন বাবা? এত লোক কোথায় এসে বসবে? কিসে বসবে?'

ঘোষালমশাই বলেন, 'বাইরে ঘাসের উপর বসবে। সরোজ একটা সতরঞ্চি দেবে। তুই চাটাই দুটো পেতে দিবি।'

পারুল বলে, 'তা না হয় বসল কিন্তু চা দিতে হবে না তো বাবা?'

এবার ঘোষালমশাই বিব্রত হন। এর আগে পাড়ায় দুর্গাপূজা নিয়ে, ইলেকট্রিক-লাইট আনা নিয়ে, যাত্রা করানো নিয়ে ছোটবড়ো অনেক মিটিঙ্ হয়েছে তার বাড়িতে। একটু চা তিনি খাইয়েছেন সবাইকে। পারুল এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে কাপ ডিস যোগাড় করে এনেছে। ঘরে গরুর দুধ আছে। কষ্ট হলেও বাড়তি চা-চিনিটুকু তিনি কিনে এনেছেন। কিন্তু এবার এতগুলো মানুষের জন্য চিনি

কোথায় পাওয়া যাবে? ঘোষালমশাই বলেন, 'গুড়ের চা-ই দিস পারু। সকলেই তো জানে। সব বাড়িতেই তো এক অবস্থা।'

পারুল রাজি হয় না। বলে, 'না বাবা, পাড়ায় নিন্দে হবে।'

জটিল এসে সমস্যার সমাধান করে, 'বাতাসা পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসা দিয়ে চমৎকার চা হবে পারুল—'

পারুল বলে, 'বাতাসা তো ঘরে নেই জটিলদা।'

জটিল বলে, 'আমি নিয়ে আসব বাজার থেকে। তুই কিছু ভাবিস না।'

নাইটগার্ডের বিষয়ে জটিলের খুব উৎসাহ দেখা যায়। মাল আনতে তাকে এখন ঘন ঘন কলকাতা যেতে হয়। বউটা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে একা ঘরে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। কলকাতায় গিয়ে রাতের কথা ভেবে স্বস্তি পায় না সে। এবার নিশ্চিন্ত হবে।

কিন্তু বাতাসার পয়সা সে নিজে দেয় না। সরোজ-শিশির-উৎপল-দের কাছে গিয়ে চাঁদা আদায় করে। চিনি অদৃশ্য হওয়ায় বাতাসার দামও তো দ্বিগুণ হয়েছে। অত পয়সা সে কোথায় পাবে? তার ছোট দোকানের লাভের গুড় তো মহাজনরূপী পিঁপড়েরাই চুষে খায়।

বিকেলের দিকে উৎপল একটু খোঁচা দেয় জটিলকে, 'কমিশন রাখো নি তো জটিল?'

জটিল রাগ করে না। বরং হেসে বলে, 'রেখেছি। দুটো বাতাসা। পারুলের হাতে ঠোঙা দিয়ে দুটো বাতাসা মুখে ফেলে জল খেলাম এক ঘটি।'

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে পাড়ার লোকজন আসা শুরু হয়। নারকেলগাছের তলায় সতরঞ্চি ও চাটাই বিছিয়ে বসার জায়গা হয়েছে। দুপুরে স্নান করার আগে পারুল ঝাঁট দিয়ে রেখেছিল। কাজল এসে সব পেতেপুতে দিয়েছে। পাড়ায় মিটিঙ্ করার মতো বড় ঘর নগেনবাবুর ছাড়া কারো নেই। কিন্তু ও-বাড়িতে যেতে অনেকেরই আপত্তি। আবার নগেনবাবুও কেরানি-ড্রাইভার-পিওন জাতের মানুষদের ঘরে এনে মাখামাখি পছন্দ করেন না।

নিশিন্দার নকুল সরকারের ঘরজামাই ছিলেন নগেনবাবু। নিশিন্দার মানুষেরা এখনো তাকে বলে 'জামাইবাবু'। বিয়ের আগেই নকুল সরকারের মেয়ের মাথার চুল প্রায় সব উঠে গিয়েছিল। ডান হাত ও ডান পা খানাও কিছু অবশ হয়েছিল। অন্যথা গায়ের রং চমৎকার ফর্সা, নাক চোখ মুখও অসুন্দর নয়। বিয়ের আগে নকুল মেয়ের জন্য কলকাতার নিউমার্কেট থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকা খরচ করে চুল আনিয়েছিল। মেয়েমানুষের মাথার আসল চুল। আঁচড়ানো যায়, বিনুনী করা যায়, খোঁপা বাঁধা যায়। মাথায় পরে থাকলে মেয়েদের পাকা চোখেও আসল-নকল ধরা পড়ে না। পাড়ার দুর্গাপূজার মণ্ডপে সামান্য খুঁড়িয়ে যখন দু'একবার এসে প্রতিমাদর্শনে দাঁড়ায় সে—তখন মেয়েরা অবাক চোখে তার পিঠময় ছড়ানো চুল দেখে। তার নকল চুলের খবর নিশিন্দা থেকে এপাড়ার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে।

মেয়ের শারীরিক অবস্থা জেনেবুঝে পঁচিশ বিঘা জমি, পঁচিশ হাজার নগদ টাকা এবং চল্লিশভরি সোনার কড়ারে তাকে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়েছিলেন নগেন চৌধুরী। নকুলের ওই একটি মাত্র মেয়ে, তাকে সে দূরগ্রামে পরের বাড়িতে পাঠাতে চায়নি। নগেন একদা বার তিনেক হোঁচট খেয়ে বি-এ পাশ করেছিলেন। কিছুদিন কলকাতায় থেকে আইনও পড়েছিলেন। সরকার বংশে এর চেয়ে বিদ্বান জামাই আর কখনো আসে নি। কাজেই নকুলও খুব খুশি হয়েছিল। কিন্তু সে খুব হিসেবী লোক। জমিটা দানপত্র হিসেবে রেজেষ্ট্রি করেছে মেয়ের নামে। সোনা ভরে রেখেছে নিজের সিন্দুকে। আর নগদ টাকা দিয়ে শহরে সিমেণ্ট লোহা রং-এর দোকান বানিয়ে দিয়েছে নগেনকে—কিন্তু সেটাও মেয়ের নামেই।

নিশিন্দায় ভাইয়ে ভাইয়ে গোলমাল পাকিয়ে ওঠায় সাবেক কালের বাড়িঘর দরজা যখন ভাগাভাগি হ'ল—তখন নগেন নিজের গ্রামের পৈতৃকসম্পত্তিটুকু বিক্রি করে ডাঙ্গায় এসে বাড়ি তুললেন।

নকুলের তাতে অমত ছিল না। ডাঙ্গাটা তো নিশিন্দার মধ্যেই। মাঠে মাঠে হেঁটে গেলে বিশ মিনিটের পথ। নগেন ওখানে থেকে নিজের জমিজমাও দেখাশুনা করতে পারবেন।

কিন্তু ডাঙ্গাপল্লীর দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষেরা নগেনবাবুর বিশাল বাড়িটা সুনজরে দেখল না। তারপর ধারেদেনায় ডুবে বাড়ি শেষ করতে গিয়ে যখন এক বস্তা সিমেন্টও চড়াদামে কিনতে হ'ল ওই নগেনবাবুর দোকান থেকেই—তখন মনে মনে রীতিমত রুষ্ট হ'ল। লোকটার চোখে পর্দা নেই, শরীরেও নেই মানুষের চামড়া, থাকলে প্রতিবেশীকে আপদে বিপদে কেউ ধারে ক'বাণ্ডিল লোহার শিক কিংবা ন্যায্যমূল্যে এক বস্তা সিমেন্ট দেয় না।

এ অবস্থায় নগেনবাবু ঘর ছেড়ে দিলেও কে যাবে তার বাড়িতে মিটিঙ্ করতে? ওঠ-বসা চলে সমানে সমানে, জেলে জলে কি মিশ্ খায়! এপাড়ার মানুষদের কাছে ঘোষালমশায়ের চাটাই-পাতা আঙিনাই ভাল। মানুষটার পয়সা না থাক, দরদ আছে। সুখেদুঃখে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। নগেনবাবুর মত উঁচু ছাদে দাঁড়িয়ে শুক্‌নো গলায় মোড়লি করে না।

মিটিঙ্ শুরু হওয়ার মুখে কাজল বলে, 'কে কে আসে নি একবার দেখো তো সরোজদা।'

সরোজ বলে, 'নিমু আসে নি। নগেনবাবুও না।'

কাজল বলে, 'নিমুকে তো আমি আজ সকালেও বলে এসেছি। নগেনবাবুকে মেসোমশাই নিজে বলেছেন।'

সরোজ বলে, 'দাঁড়াও, লোক পাঠাচ্ছি।'

পাড়ার কমবয়েসি দু'জন ছেলেকে দু'দিকে পাঠানো হয়। কিন্তু নিমুর কোনো খোঁজই পাওয়া যায় না। নগেনবাবু ঘুমোচ্ছিলেন। উঠে হাতেমুখে জল দিচ্ছেন। আসবেন।

ঘোষালমশাই বলেন, 'তাহলে একটু অপেক্ষা কর তোমরা পাড়ার মান্যগণ্য লোক উনি। আসতে দাও তাকে।'

কাজল অসন্তুস্ট ভঙ্গিতে গজগজ করে, 'নিমুটাকে এত করে

বললাম—'

জটিল খুব চাপাগলায় বলে, 'তোমার বলাকে ও ভারি কেয়ার করে! মেয়েছেলের পেছনে শিস্ বাজিয়ে সিনেমাহলে টিকিট ব্ল্যাক করছে দেখোগে!'

বলেই আশেপাশে চোখ ছোট করে তাকায়। কেউ শোনে নি তো! কাজলকে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে, 'দু'কান হয় না যেন ভাই। নিমু শুনলে বোমা মেরে দোকানখানা উড়িয়ে দেবে।'

কাজল হাঁটুতে চিমটি কেটে ওকে থামায়। এসব কথা এখানে বলার দরকার কি! অকারণে একটা ঝামেলা পাকিয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া নিমুর স্বভাবচরিত্র যা-ই হোক—পাড়ায় কোনো উৎপাত করে না। ওর মতো ভয়ডরহীন গোঁয়ার প্রকৃতির ছেলে নাইটগার্ডের পক্ষে খুবই দরকারি। তাকে অবহেলা করা যায় না।

একটুপরেই ঢলঢলে পা-জামার উপর সোনার বোতামআঁটা সাদা পাঞ্জাবি গায়ে নগেনবাবু আসেন। লম্বা স্বাস্থ্যবান শরীর। রং কালো হলেও মসৃণ চর্বি থেকে একরকমের চিকণ উজ্জ্বলতা ঠিক্‌রে পড়ছে। বোতাম খোলা এবং গেঞ্জি না-থাকায় তাঁর বুকের কোঁকড়ানো ঘন কালো লোম দেখা যায়। হাতে সোনালি রঙের সিগেরেট কেস্, সবুজ রঙের জাহাজ-প্যাটার্ণের লাইটার। তিনি আসা মাত্র সভায় একটু চাঞ্চল্য দেখা দেয়। জটিল খুব সতর্কভঙ্গিতে বেশ খানিকটা পিছিয়ে যায়। কাজল লাল ফ্ল্যাগ নিয়ে মিছিল-মিটিঙ্ করে। তার গা ঘেঁষে ঘন হয়ে বসে থাকাটা নগেনবাবু যদি ভাল চোখে না দেখেন! ঝুঁকি নেবার কি দরকার! সে ছাপোষা দোকানী মানুষ। তার মহাজনেরা তো সব নগেনবাবুদেরই দলের লোক। এক ঝাঁড়ের বাঁশ!

ঘোষালমশাই অতিথি-আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বলেন, 'আসুন নগেনবাবু, আসুন!' নিজের পাশে আদর করে ডেকে বসতে দেন তাঁকে। নগেনবাবু বসতে বসতে বলেন, 'বেশিক্ষণ থাকতে পারব না কিন্তু। জরুরী কাজ আছে শহরে।'

কাজল বলে, 'জানি, আর. টি. এ-র মিটিঙ্ হচ্ছে এস-ডি-ও-র অফিসে। আপনি তো এবার একটা বাসরুট পাচ্ছেন নগেনদা।'

নগেনবাবু ভুরু কুঁচকে তাকান কাজলের দিকে, 'তুমি তো অনেক খবর রাখ দেখছি।'

কাজল মুখখানাকে আরো নিরীহ ও বিনয়ী করে, 'রাখব না? পাড়ার লোকের খবর পাড়ার লোক না রাখলে কে রাখবে?'

সরোজও সমর্থন করে কাজলকে, 'ঠিকই তো! তাছাড়া এ তো সুখবরই। কোন্ রুটটা পাচ্ছেন নগেনদা? সিউড়ি-বাঁকুড়া?'

জটিল ফস্ করে বলে বসে, 'বাঁকুড়ায় আমার শ্বশুরবাড়ি। এবার বিনি-ভাড়ায় চলে যাব! টিকিট লাগবে নাতো নগেনদা?'

নগেনবাবু রুক্ষচোখে জটিলের দিকে তাকান। জটিলের মুখ শুকিয়ে যায়। মিনমিনে গলায় বলে, 'না, মানে একটু কমেসমে যাওয়া যাবে।'

নগেনবাবু বলেন, 'মিটিঙ্ শুরু করুন আপনারা।'

তাঁর বলার ভঙ্গিটা অনেকটা হুকুমের মত শোনায়। ঘোষাল-মশাইও সেটা বুঝতে পারেন। তাঁর আত্মসম্মানে যেন একটু খোঁচা লাগে। মুখখানা গম্ভীর করে বলেন, 'আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম নগেনবাবু। এবার তাহলে শুরু হোক। পাড়ায় নাইট-গার্ড চালু করা নিয়ে মিটিং ডেকেছি সবাই। চন্দ্রবাবুর ঘরে কি ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেল! চারদিকে জিনিসপত্রের দর বাড়ছে, মানুষের অভাব বাড়ছে। চুরিও বাড়ছে সঙ্গে সঙ্গে—'

নগেনবাবু বাধা দেন, 'এর মধ্যে জিনিসপত্রের দরাদরি, অভাব-অনটনের কথা কেন? পাড়ায় চুরির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?'

ঘোষালমশাই বলেন, 'তা একটু কিছু আছে বই কি, নগেনবাবু। আমি তো গোড়া থেকেই আছি এ ডাঙ্গায়। আগে ছ'মাসে ন'মাসে একবার চুরি হত। এখন তো ফি-হপ্তায় চোর আসছে। শুনছি শহরেও চুরিচামারি শুরু হয়েছে—'

নগেনবাবু বলেন, 'আমাদের পাড়ায় চোর আসে নিশিন্দার ওই

মুচিবাউড়িডোমপাড়া থেকে। শালোরা তিনমাস চাষে খাটে, বাকি ন'মাস চুরি করে। অভাবে না, স্বভাবে চোর, জন্মচোর এক একটা, মায়ের পেট থেকে পড়েই সিঁধকাঠি হাতে নেয়।'

নগেনবাবুর কথা শুনে কেউ কেউ হাসে। তাকে খুশি করার ভঙ্গিতে একজন বলে, 'ঠিক বলেছেন নগেনবাবু! তবে পেট থেকে পড়ে সিঁধকাঠি নেয় না, ওটা হাতে নিয়েই পড়ে।'

কাজল আর সরোজ ঘুরে তাকায় তার দিকে। কেদার মল্লিক। টাকমাথা রোগাটে মানুষটা। জেলার এস. পি অর্থাৎ পুলিশের বড় কর্তার অফিসের টাইপিস্ট। হাতবদল-হওয়া একখণ্ড জমি কিনে বাড়ি তুলছেন। অর্ধেক শেষ হয়েছে—বাকিটা সিমেন্টের অভাবে আটকে গেছে। খুব সম্ভব নগেনবাবু তাকে সিমেন্ট দেবার আশ্বাস দিয়েছেন। নগেনবাবুকে সমর্থন জানিয়ে সে দাঁত বের করে হাসতে থাকে।

কাজলের মুখ গম্ভীর হয়। সে বলে ওঠে, 'এ কি কথা বলছেন নগেনদা? জন্মেই কেউ চোর হয়?'

'হয় না?'

'না, হয় না।'

'তবে কিসে হয়?'

'পরিবেশের দোষে, সমাজের দোষে, শিক্ষার দোষে চোর হয়। চোর হয়ে কেউ জন্মায় না, জন্মের পর চোর বানানো হয়।'

নগেনবাবু এবার থমথমে মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন কাজলের দিকে। তারপর রূঢ় গলায় বলেন, 'হুঁ, ঠিক বলেছ তুমি। শিখিয়ে পড়িয়েই চোর বানানো হয়। আর এ ব্যাপারে কমুনিস্টরাই তো গুরু হে! ছিঁচকে চুরিতে হাত পাকিয়ে এখন ফসল চুরি, জমি চুরি, মাছের ভেড়ি চুরি শুরু করেছে। দেখছেন না আপনারা কাগজে? কাগজ তো মিথ্যে লেখে না মশাই।'

কেদার মল্লিক বলে ওঠে, 'তা তো লেখেই না। আমাদের জেলাতেও শুরু হয়েছে ওসব। এস. পি. সাহেব জরুরী মিটিঙ্ ডেকেছেন দারোগাবাবুদের—'

কি কথা থেকে কি কথা! সভার মানুষগুলো উসখুস করে। এসব জমিজমা ফসলভেড়ির কথা তাদের পছন্দ নয়। তারা এসেছে ঘরের কাঁসাপেতল, গরুছাগল, হারআংটি কানের দুল বাঁচাতে। জমি চুরি কিংবা ফসল চুরির কথা শুনে তারা কি করবে। তাদের তো এক ছটাক ধানের জমিও নেই কোথাও। যার আছে তার চুরি হোক, লুঠ হোক, পুড়ে যাক, ভেসে যাক, তাদের কি!

কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙ্গলের চোখ দপদপ্ করে। সরোজের মুখের রেখা কঠিন হয়। জবাবটা কি-ভাবে, কোন্ ভাষায় দেওয়া যায় ভাবতে থাকে। তাদের নিরুত্তর দেখে নগেনবাবু আরো উৎসাহ পেয়ে বলে ওঠেন, 'দেশে কমুনিস্টরা যত বাড়ছে—চুরি ডাকাতি লুঠপাটও তত বাড়ছে। ওদের শায়েস্তা করলেই সব বন্ধ হয়ে যাবে দেখবেন!'

এইসময় সভার পেছন দিক থেকে একটি ছেলে উঠে দাঁড়ায়। কাজলেরই সমবয়সী। পাজামা পাঞ্জাবি পরনে, চোখে চশমা, গায়ের রঙ্ উজ্জ্বল শ্যাম, মাথার চুল পাঁশুটে, কোঁকড়ানো। দাঁড়িয়ে স্পষ্টগলায় বলে, 'কমুনিস্টদের স্বভাবচরিত্রের হিসেব পরে হবে নগেনবাবু। নিশিন্দার মুচিবাউড়িদের কথাও পরে হবে। এই পাড়ায় কণ্ট্রাক্টরদের সিমেন্ট আর রেলের লোহা চুরি করে চড়াদামে কে বেচে তার হিসেবটাই আগে হয়ে যাক তাহলে!'

যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ে! নগেনবাবুর কালো মুখ আরো কালো হয়ে পরে রাগে ফুলে ওঠে! কপাল ভুরু কুঁচকে যায়। জ্বলন্ত চোখে তিনি তাকান ছেলেটির দিকে, 'তুমি কে হে? কাদের বাড়ির ছোক্রা? পাড়ায় দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না!'

ছেলেটি নির্ভয়ে উত্তর দেয়, 'আমি হরিপদ গাঙ্গুলির ছেলে, নিশিন্দার শরৎ চক্রবর্তী আমার মামা হয়।'

শরৎ-মাস্টারের নাম শুনে নগেন চৌধুরী কেমন যেন মিইয়ে যান। রাগে কাঁপা হাতে লাইটার জ্বালিয়ে সিগেরেট ধরান। উত্তেজনায় ঘন ঘন সিগেরেট টানতে থাকেন। তাঁর চোখের সাদাজমিতে একটা লালচে আভা ফুটে থাকে।

এবার কাজলও বলে ওঠে, 'সিমেন্ট লোহা চুরির কথা আমিও কিছু কিছু জানি নগেনদা—'

নগেনবাবু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ান। চাপা গলায় গর্‌গর্‌ করে বলেন, 'কমবয়সে দেখছি অনেক বেশি জেনে ফেলেছ তোমরা! দেখো, নিজেরাই একদিন চুরি হয়ে যেও না যেন!'

কাজল উত্তর দেবার আগে শরৎ-মাস্টারের ভাগ্নে বলে ওঠে, 'গেলামই বা! ভরা বানের নদী থেকে এক ঘটি জল গেল আর এল কি এসে যায় তাতে? বান ঠিক ডাকবেই!'

কাজল ঘুরে আশ্চর্য হয়ে তার মুখ দেখে। সরোজও অবাক ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই উজ্জ্বল কালোরঙের ছেলেটি কখন সভায় এসে বসল!

ঘোষালমশাইও ছেলেটিকে লক্ষ্য করেন। হাত তুলে ইঙ্গিতে তাকে থামতে বলে নগেনের দিকে তাকিয়ে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, 'কাজের কথা হচ্ছে না। কেবল আজেবাজে কথা।'

সরোজ বলে, 'হ্যাঁ, মেসোমশাই, কাজের কথা তুলুন।'

চন্দ্রবাবুরাও বলে সে কথা। ক্রমে তারাও অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল। গোড়ায় রাগটা পড়েছিল কাজলের উপর। হাজার হোক নগেনবাবু একজন বয়স্ক মানুষ, পয়সাকড়িও আছে, তার উপর নিশিন্দার সরকার-পরিবারের জামাই, মান্যগণ্য লোক। তুলনায় কাজল অনেক ছোট—বয়সে, বংশমর্যাদায়। নগেনের মুখে মুখে ও-ভাবে তর্ক করা ভাল লাগে নি তাদের। কিন্তু এখন বাতাস বইছে উল্টো মুখে। শরৎ-মাস্টারের ভাগ্নে সিমেন্ট-লোহার কথা তোলায় আর কাজলও তাতে যোগ দেওয়ায়—উভয়েই নিঃশব্দ সমর্থন পেয়ে গেছে পাড়ার মানুষদের। মুখে কিছু বলছে না বটে, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে খুশির ঝিলিক ফুটিয়ে তারা সপ্রশংস ভঙ্গিতে ওদের মুখ দেখছে। কেন না, বাড়ি তুলতে গিয়ে ঠেকায়বাধায় সকলকেই চোরাই দামে সিমেন্ট কিনতে হয়েছে নগেনের গদী থেকে। তার উপর একবস্তার জায়গায় আধবস্তা মাল। বস্তার মুখের তার কাটা, সীল ভাঙা।

দেখলেই বোঝা যায়, গুদামে প্রায় অর্ধেক মাল সরিয়ে নতুন করে সেলাই করা হয়েছে। নগেন অবশ্য সরাসরি ব্ল্যাক করেন নি, কায়দা করে বলেছেন, 'মাল তো আমার দোকানে নেই। তবে পাড়ার লোক যখন ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে! টাকা রেখে যান, ও বেলা দেখি কার গুদামে কি পাওয়া যায়—'

পাড়ার লোক তো ঘাস খায় না। সব বোঝে। কিন্তু বুঝেও নিরুপায়। বিয়ের পিঁড়িতে কনে বসিয়ে মেয়ের বাপকে যেমন বরপক্ষের হাজার বায়না মানতেই হয়, মেয়ে উঠিয়ে নেওয়া যায় না, তেমনি বাড়ির কাজে নেমেও ইচ্ছে করলেই থেমে পড়া যায় না। ছাদ ঢালাই হতে হতে হঠাৎ যদি পাঁচবস্তা সিমেন্টে টান ধরে, কিংবা সব কাজের শেষে হঠাৎ মেঝেটুকু যদি আটকে যায়—তাহলে মানুষ কি করবে! চীন-ভারত যুদ্ধ সিমেন্টের বাজার আক্রা করেছে। তার উপর উৎপাদনে ঘাটতি আর বণ্টন ব্যবস্থায় বৈষম্য তো আছেই। নগেনবাবুরা তার সুযোগ নিয়েছেন পুরো মাত্রায়। আর ডাঙ্গাপল্লীর অভাবী মানুষের ঋণের জালে আরো একটা নতুন গিঁঠ পড়েছে।

কাজলদের কথায় সেই ক্ষতস্থানে ঘা পড়ে। সবাই একসঙ্গে এমনভাবে তাকায় নগেনের দিকে যেন আজকের আসরে তিনিই প্রধান অপরাধী। তাঁর বিচার হচ্ছে। আর মনে মনে কাজল আর ওই চশমা-পরা ছেলেটির তারিফ করে। হ'লই বা ছেলেমানুষ, পাঞ্জা লড়তে জানে বটে! দিল তো নগেন চৌধুরীর থোঁতা মুখখানা ভোঁতা করে!

ব্ল্যাকে সবচেয়ে বেশি সিমেণ্ট কিনেছিলেন চন্দ্রবাবু। ঠাণ্ডা নিরীহ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বিরক্ত হয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ফেলেন, 'আমাদেরও অন্য কাজকম্ম আছে নগেনবাবু, মিটিঙ্‌টা হতে দিন। কথা বলে আর কথা বাড়াবেন না—'

নগেনবাবু গম্ভীর গলায় বলেন, 'শুরু করুন না আপনারা। কে ধরে রেখেছে?' বলে একটা সিগেরেট থেকে আরেকটা ধরিয়ে নেন।

তখন আস্তে আস্তে কাজের কথায় ফিরে আসে সবাই। নাইট-

ডিউটি ক'টা থেকে শুরু হবে, কখন শেষ হবে, একরাত্রে ক'জন ডিউটি দেবে, তার সময়ক্ষণসংখ্যা ঠিক করা হয়। এরপর ঘর প্রতি লোকের হিসেব করে ডিউটি-লিস্ট তৈরির কাজ—

ঘোষালমশাই উৎসাহে আবেগে বলে ওঠেন, 'আমার নামও রাখবে তোমরা। আমিও একদিন রাত জাগব।'

নগেনবাবু হঠাৎ আসর ছেড়ে উঠে পড়েন, 'লিস্ট থেকে আমাকে যেন ভাই বাদ রাখবেন আপনারা।'

শুনে অনেকেই কড়া চোখে তাঁর দিকে তাকায়। সরোজ বলে, 'কেন, এই তো ঠিক হ'ল, শিশু বৃদ্ধ আর রুগী ছাড়া সবাই অন্তত: একরাত ডিউটি দেবেন।'

সেই চশমা পরা ছেলেটি বলে, 'দেবেন না কেন? আপনি শিশু না বৃদ্ধ?'

কে যেন চাপা গলায় টিপ্পনি কাটে, 'না কি মেয়েছেলে!'

নগেনবাবুর চোখের সাদা জমি আরো লাল হয়। ঘোষাল-মশাই তাড়াতাড়ি সামাল দেন, 'আঃ, তোমরা চুপ কর!' নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ছেলেছোকরার কথা অত ধরবেন না নগেন-বাবু। কাকে কি বলতে হয় সে জ্ঞান কি ওদের আছে! আপনি বড়োলোক মানুষ, আমাদের সঙ্গে কোন্ দুঃখে রাত জাগবেন? আপনার বাড়িতে তো চাকরবাকর আছে, যেদিন পালি পড়বে একজনকে পাঠিয়ে দেবেন—'

নগেনবাবু বলেন, 'তা হতে পারে। তাতে আপত্তি নেই আমার।' কথা শেষ করে উপস্থিত সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা ধরেন। কাজল চেঁচিয়ে বলে, 'আপনার কিন্তু পাঁচ টাকা চাঁদা ধার্য্য হ'ল নগেনদা—'

নগেন উত্তর দেন না। ঘুরে দাঁড়িয়ে কাজলের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে যান।

চাঁদার কথা শুনে পল্লীর নিম্নবিত্ত মানুষগুলো আবার উসখুস করে ওঠে। কেন, চাঁদা কেন, চাঁদা দিয়ে কি হবে? সরোজ তাদের

বোঝায়, 'কিছু কিছু তো লাগবেই মাসে। দু' একটা টর্চ কিনতে হবে, ব্যাটারি কিনতে হবে, একটু চায়ের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। আপনারা একটাকা করে দেবেন মাসে—'

সদানন্দ উঠে দাঁড়ায়, হাত জোড় করে বলে, 'আমি অত পারব না। আমার ক্ষমতা নাই।'

সরোজ বলে, 'ঠিক আছে, তুমি যা পারো দিও।'

এ-পর্বটা শেষ হতে না হতে আবার একটা গোলমাল পাকিয়ে ওঠে। প্রায় সবাই ডিউটি চায় শনিবার রাত্রে। তাহলে রবিবারটা ঘুমিয়ে সোমবারে অফিসে আদালতে বেরুনো যাবে। শরীরের উপর চাপ পড়বে না। এই নিয়ে জটিলের সঙ্গে স্কুলমাস্টার শশাঙ্ক হাজরার কিছু কথা কাটাকাটিও হয়ে যায়। জটিল বলে, 'আপনার আবার শনি-রবি কি শশাঙ্কদা? বছরে দশমাসতো ছুটি!' শশাঙ্ক রেগে গিয়ে বলে, 'বাজে বকো না জটিল। বসিয়ে বসিয়ে স্কুল মাইনে দেয় না আমাকে।' জটিল হাসে, 'না তো কি? ক'দিন যান স্কুলে? একটু কড়া রোদ উঠলে বন্ধ, একটু জোরে জল নামলে বন্ধ, একটু দমকা বাতাস বইলে—'

সুযোগ বুঝে উৎপল ধমকায় জটিলকে, 'স্কুলকলেজ নিয়ে কথা বলতে আস কেন তুমি! করছ দোকানদারি, ওসবের মর্ম তুমি কি বুঝবে!'

খোঁচা খেয়ে জটিলের হাসি গুটিয়ে যায়। বলে, 'গোলামি তো করছি না! স্বাধীন ব্যবসা!'

সরোজ বিরক্ত হয়ে বলে, 'আবার শুরু করে দিলে তোমরা। ও-ভাবে দিন বাছাই করা যাবে না। লটারি হবে। দিন নিয়ে লাক্ ট্রাই! বলুন সবাই রাজি কিনা—'

শেষপর্যন্ত লটারিই সাব্যস্ত হয়। অনেকগুলো টুকরো কাগজে সোম থেকে রবি পর্যন্ত দিনের নাম লিখে ভাঁজ করে একত্রে মিশিয়ে ধরা হয় সকলের সামনে। যে যেমন দিন তুলবে তাকে ডিউটি দিতে হবে সে দিনই। এর অন্যথা চলবে না। তবে কেউ যদি কারো

সঙ্গে পরস্পরের সম্মতিক্রমে দিনবদল করতে চায়—তা পারবে। সভায় অনুপস্থিত অথচ ডিউটি দেবার যোগ্য এমন মানুষের নামেও লটারি হবে। তার কাগজ তুলবেন ঘোষালমশাই। এ বিষয়ে পরে তার ওজরআপত্তি মানা হবে না।

লটারিতে দেখা যায় কাজলের ডিউটি পড়েছে সরোজ, নিমু আর শশাঙ্ক মাস্টারের সঙ্গে। বুধবারে জটিলের ডিউটি পড়েছে মোটর-মেকানিক নরেন, সিদ্ধেশ্বর আর নগেনবাবুর চাকরের সঙ্গে। এতে জটিলের মুখ ভার। সে প্রকাশ্যেই বলে, 'শালা যেমন ফাটা কপাল! কথা বলার লোক থাকল না একটা।'

উৎপল ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, 'কেন, ঠিকই তো হয়েছে। যার যেখানে স্থান।'

কাজল অবাক হয়ে জটিল ও উৎপলের মুখ দেখে। নরেন, সিদ্ধেশ্বর কিংবা নগেনবাবুর চাকরের তুলনায় নিজেকে কত উঁচুতে মনে করে জটিল। আবার জটিলের চেয়ে উৎপল নিজেকে কত বড় ভাবে! এইটুকু ছোট পাড়ায় ক'ঘর মাত্র মানুষের মধ্যে মনের কি বিচিত্র ভাগাভাগি! সে কিছু না বলে আস্তে আস্তে চশমা-পরা ছেলেটির কাছে এগিয়ে আসে। ঘন হয়ে বসে বলে, 'মানস, তুমি কখন এসেছ?'

মানস বলে 'সকালে নেমেছি।'

'মা বাবাও এসেছেন?'

'বাবা আসেন নি। মাকে সঙ্গে এনেছি।'

'ছুটি আছে? থাকবে কিছুদিন?'

'থাকতে পারি।'

'ডিউটি দেবে নাকি আমাদের সঙ্গে?'

'দিলে হয়। জুড়ে দাও কোনো দলে—'

ঘোষালমশাই হাত তুলে ডাকেন মানসকে। সে উঠে গিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। ঘোষালমশাই আদর করে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'বাবা কেমন আছেন? মা? তোমার পড়া শেষ হতে আর কত বাকি?'

এমন সময় পারুল বড় একটা কেট্‌লিতে চা আনে। তার পেছনে প্লাস্টিকের ঝুড়িতে কাপ বয়ে আনে কালী। এতগুলো লোকের সামনে বেরুতে হবে বলে পারুল যেন একটু সেজেছে। মোটা করে বিনুনি ঝুলিয়ে চুল বেঁধেছে। গোলাপী রঙের শাড়ি পরেছে। মুখে সামান্য পাউডার, ভুরুতে কাজল-পেন্সিলের টানও দিয়েছে। গলায় চিক চিক করছে একছড়া রূপোর হার। ওর ছিমছাম শরীর আর গোলছাঁদের মুখখানা খুব নরম আর মিষ্টি দেখাচ্ছে।

কালী সকলের হাতে কাপ দেয়। পারুল চা ঢেলে দেয়। কাজলের কাপে চা দিতে দিতে ঠোঁট চেপে হাসে। চাপা হাসিতে ওর চোখমুখ ঝিকমিক করে। চা নিয়ে কাজল ঘোষালমশায়ের কাছে এসে বলে, 'কাল থেকেই তাহলে ডিউটি শুরু হোক মেসোমশাই—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'হোক। তোমাদেরই তো ডিউটি আছে। নিমুকে শুধু খবর দাও।'

পারুল মানসকে চা দিতে এলে কাজল বলে, 'চিনতে পারছিস তো পারুল?'

পারুল বলে, 'বারে, চিনব না কেন? পাড়ায় নতুন কুটুম নাকি! আমাদের মানসদা। আমাকে সাইকেলে চড়া শিখিয়েছিল—'

মানস বলে, 'ভুলে যাস নি? চালাতে পারবি এখন?'

'কে জানে, অনেকদিন তো চড়ি না।'

'আচ্ছা, কাল একবার পরীক্ষা হবে।'

পারুল হেসে ফেলে, 'ধেৎ।'

মানসও হাসে, 'ও, এখন খুব বড় হয়ে গেছিস বুঝি!'

'আর তুমি ছোটটি আছ।'

মানস আর পারুলের দিকে তাকিয়ে কাজল সহসা কেমন বিষণ্ণতা বোধ করে। যেন মনের মধ্যে অকস্মাৎ একটা একাকীত্বের বোধ চেপে বসে। মানস কবে কখন পারুলকে দু'হাতে শরীর বেষ্টন করে সাইকেল চালানো শিখিয়েছিল—সে কথা কাজল এখন আর ভাল করে মনে করতে পারে না—কিন্তু দুই কিশোর-কিশোরীর পরস্পর-

সংলগ্ন একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠ ছবি মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠায় কেমন যেন অস্থিরতা অনুভব করে। খুব খুঁটিয়ে একবার পারুলের, আরেকবার মানসের মুখ দেখতে থাকে সে।

এমনসময় সদানন্দের পিসী একটা কাঁসার বাটি হাতে হন্‌হন্ করে হেঁটে আসে। চারপাশের লোকজনের প্রতি তিলমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে পারুলের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'এক বাটি আটা দিবি আমারে? রাত্তিরে দুইহান রুটি বানাইয়া খামু। আছে? দিবি?'

পারুলের হাসিহাসি মুখখানা শুকিয়ে যায়, নীচু গলায় বলে, 'বারে, পরশু যে দিলাম। রোজ কোথায় পাব?'

সদানন্দ বসেছিল তখনও। নরেন আর সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে কথা বলছিল। পাড়ায় থাকলেও একসঙ্গে বসে সুখদুঃখের কথা বড় একটা বলাবলির সুযোগ তো হয় না। ছেঁড়া কাপড় পরা, আধ্-পাগলা পিসীকে দেখে লজ্জায় অপমানে তার মুখ ভারি হয়ে ওঠে। কড়া গলায় বলে, 'এই পিসী! ঘরে যাও বলছি!' পিসী সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায়। চিলের মত চেরা গলায় চেঁচিয়ে বলে, 'ক্যান যামু? খাইতে দেয় তর বউ আমারে? শুইতে দেয়? পাড়ার পাঁচজন আইছে এহানে, হগলেরে কমু আমি তগোর কথা—'

সদানন্দ রাগে গর্জে ওঠে, 'এই পিসী! ভাল হবে না বলছি!'

পিসী বলে, 'চখ্যু রাঙাইস না! বউয়ের মাই-চুষা পুরুষ তুই! তরে আমি ডরাই! দে, আমার গয়না ক'হান ফিরাইয়া দে! তগো মুখে মুইত্যা কাইলই বাড়ি ছাইড়া যামু আমি—'

সদানন্দের মুখে আর কথা সরে না! রাগেদুঃখে বাক্যহীন হয়ে পিসীর দিকে লাল চোখে তাকিয়ে থাকে। পিসী হঠাৎ ক'পা এগিয়ে এসে খপ্ করে ঘোষালমশায়ের একখানা পা চেপে ধরে কাঁদতে শুরু করে। বিচিত্র সুরের কান্না। চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল পড়ে না। ভাঙাগলায় গোঙানির মত প্রবল শব্দ হয়। ঘোষালমশাই পা টানতে টানতে বলেন, 'আঃ, কি কর ক্ষীরোদা, ছাড়, পা ছাড়!'

পিসী বলে, 'দাদা তুমি বিচার কর! বিচার কর! আমারে ক্যান খাইতে ছায় না অর বউ, ক্যান ঘরে ছুইবার ছায় না—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'চুপ কর ক্ষীরো! ঘরের কথা এত বাইরে বলতে নেই। আটা দেবে তোমাকে পারুল। নাও, চা খাও এখন—'

'চা? কই চা?'

পারুল তাড়াতাড়ি পিসীর বাটি টেনে নিয়ে অনেকখানি চা ঢেলে দেয়। পিসীর কান্না থেমে যায়। রাগও ঠাণ্ডা হয়। দু'হাতে বাটি ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে। তারপর চুমুক দিয়ে বলে, 'মিঠা কম। আট্টু চিনি দে আমারে!'

রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে কাজলের ঘুম আসে না। নানা রকম ভাবনাচিন্তায় মনটা অস্থির উত্তপ্ত হয়ে থাকে। কাল থেকে পাড়ায় নাইটগার্ড চালু হবে—সে এক চিন্তা। নগেনবাবুকে খোঁচা দেওয়া হয়েছে, রাগ করেই আসর থেকে উঠে গেছেন তিনি, তাঁর জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি কাজল দেখেছে—সেটাও চিন্তার কারণ। তাছাড়া আছে মানস—তার কথাও কাজল ভুলতে পারে না। সব মিলিয়ে কাজলের মনের মধ্যে এলোমেলো চিন্তার একটা জট পাকিয়ে ওঠে। মানসের কথাই তাকে বেশী ভাবায়। আজকের আসরে মানসের কাছে তার একটা সূক্ষ্ম পরাজয় ঘটেছে। নগেনবাবুর সিমেণ্টচুরি লোহাচুরির প্রতিবাদ তার গলা থেকে প্রথম শোনা যায় নি। সে হয়ত একটু ভয় পেয়েছিল। এক পাড়ায় বাস করে নগেনবাবুর মত বয়স্ক বিত্তবান লোকের মুখের উপর রূঢ় কথা বলার সাহস পায় নি। সে যখন ইতস্তত করছিল তখন মানস সোজা সটান দাঁড়িয়ে কেমন নির্ভয়ে নগেনের গালে একটা চড় কষিয়ে দিল! আসর ভাঙার পর পাড়ার লোকেরা মানসের কথা বলাবলি করছিল। তাদের চাপা সুরের গুন্ গুন্ গুঞ্জন থেকে মানস-সম্পর্কে টুকরো-টুকরো প্রশংসার শব্দগুলো ছিটকে এসে কাজলের কানে বাজছিল। সে কি তাতে খুশি হচ্ছিল?

বলতে গেলে, এ পাড়ার সঙ্গে মানসদের তো আর বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। আজকের আসরে সে তো একরকম বহিরাগত, উড়ে এসে জুড়ে বসার সামিল। তার কাছে কাজলের হেরে যাওয়া উচিত হয় নি! এ পাড়ার সুখেদুঃখে সে দীর্ঘকাল জড়িয়ে আছে। একমাত্র নগেনবাবু ছাড়া পাড়ার মানুষেরা কাজলকেই তাদের ছোটখাটো নেতা বলে মনে করে। রোগেশোকে, দুর্গাপূজায়, বিয়েবাড়িতে, মড়া পোড়ানোয়, কি অন্নপ্রাশনে তারই ডাক পড়ে সকলের আগে। কাজল উপস্থিত না থাকলে পাড়ার কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে হয় না। মানস কি তার সেই মর্যাদার আসনে আজ একটু চিড় ধরিয়ে দিয়ে গেল না?

মানস শরৎ-মাস্টারের ভাগ্নে। নিশিন্দার শরৎ-মাস্টার চাষী-মজুর-বর্গাদারদের নিয়ে দল বাঁধেন। ধুলো পায়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। এলাকার কৃষক সমিতি, ক্ষেত মজুর সমিতির তিনি সম্পাদক। সরকারবাবুদের সঙ্গে তাঁর আকৈশোর লড়াই। ঘরবাড়ি পুড়েছে কয়েকবার, জেল খেটেছেন বছর সাতেক, মাথা ফাটিয়ে হাসপাতালে থেকেছেন কয়েক মাস। ফিরে এসে আবার নেমে পড়েছেন নিজের কাজে। এখন শরৎ-মাস্টারের এক ডাকে সাত গ্রামের সাত হাজার ক্ষেতমজুর লাঠি হাতে জড়ো হয়। সরকারবাবুরা এখন ভয়ে ভয়ে তাকে এড়িয়ে চলে। মুখোমুখি হলে আপোষ করার চেষ্টা করে, অন্তরালে জেলে পাঠানোর চক্রান্ত। কখনো নিঃশব্দে খুন করার কথাও ভাবে। কিন্তু সম্মুখ-সংঘর্ষে নামার সাহস পায় না।

শরৎ-মাস্টারের ছোট বোনের ছেলে মানস। শহরের স্কুল-কলেজে পড়ে তিনি বি.এ পাশ করেছিলেন। নিশিন্দা গ্রামে তিনি প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। জেলার একমাত্র সরকারি স্কুলের একজন শিক্ষকের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন শরৎ-মাস্টার। তিনি ডাঙ্গা-পল্লীতে জমি কিনে একখানা ছোট বাড়ি করেছিলেন। ঘোষালমশাই বলেন, সেটা ছিল ডাঙ্গার চতুর্থ বাড়ি। প্রথম বাড়ি তাঁর, দ্বিতীয়

নিমুদের, তৃতীয় সরোজদের। তারপর এল মানসেরা। তখন মানস স্কুলে পড়ে। বাবার সঙ্গে সাইকেলের পেছনে ক্যারিয়ারে বসে বই-খাতা হাতে স্কুলে যেত, বাবার সঙ্গেই ফিরত। একটু বড় হলে বাবা তাকে ঘন সবুজ রঙের ছোট একখানা সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। ডাঙ্গার মাঠে পারুলকে সেই সাইকেলে চাপা শিখিয়ে-ছিল মানস। পারুল তখন ফ্রক-পড়া মেয়ে। টুকটুকে লাল ফিতে দিয়ে মাথার চুল ঝুঁটি করে বেঁধে, হাতে সোনালী রঙের কাঁচের চুড়ি পরে বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে সাইকেলখানা নিয়ে ডাঙ্গার মাঠ চষে বেড়াত পারুল। ঘোষালমশাই বকাবকি করলেও শুনত না।

মানস পড়াশুনায় ভাল ছিল। জেলার মধ্যে দ্বিতীয় হয়ে বৃত্তি পেয়ে যেবার সে স্কুলফাইন্যাল পাশ করল মানসের বাবাও প্রোমোশন পেয়ে বদ্‌লি হলেন কলকাতার একটা সরকারী স্কুলে। ছেলের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে বদ্‌লিটা খুশি মনেই মেনে নিলেন তিনি। ডাঙ্গার বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় বাসা ভাড়া করলেন। এসব বছর পাঁচেক আগের কথা। মানস এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্স নিয়ে এম.এ পড়ে। সামনেই তার ফাইন্যাল পরীক্ষা।

কাজল তাকে পাড়ায় পেয়েছিল বছর দুই-তিন। তারই সমবয়সী সে। পড়াশুনায় নানা বাধাবিঘ্ন না ঘটলে কাজলও হয়ত এতদিনে এম.এ পড়ত।

ডাঙ্গার বাড়িটা ভাড়া দিয়েছিলেন মানসের বাবা। ছুটিছাটায় কখনো এলে নিশিন্দায় শরৎমাস্টারের ঘরে উঠতেন। নিজের বাড়িটাও ঘুরে দেখে যেতেন একবার। মানস কদাচিৎ আসত এ-পাড়ায়।

মানসের বাবার জায়গায় যিনি বদলি হয়ে এসেছিলেন সেই শশাঙ্ক মাস্টারই ভাড়ায় ছিলেন ওদের বাড়িতে। ডাঙ্গায় জমি কিনে নিজের বাড়িতে উঠে যাওয়ায় মানসদের বাড়িটা সম্প্রতি খালি পড়েছিল। অনেকদিন পরে মা-কে নিয়ে মানস আবার নিজের বাড়িতে এসেছে।

নিশিন্দার সরকারদের কীর্তিকলাপ মানসের অজানা নেই। নগেন চৌধুরীর কুকীর্তিও তার জানা। শরৎমাস্টারের বোনের রক্ত যার শরীরে বইছে—সে তো বুক ফুলিয়ে সরকারবংশের ভাইভাগ্নে জামাইদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেই। শরৎ-মাস্টারের ঘর-পোড়ানোর কথা, মাথা ফাটানোর কথা, চক্রান্ত করে জেল খাটানোর কথা—মানস কি আর জানে না! তার রক্তের মধ্যে যে জ্বালা আছে, যে ঘৃণা-বিদ্বেষ-ক্রোধ আছে—আর আছে যে তেজ ও সাহস সে তো এক হিসেবে শরৎমাস্টারেরই দান। রক্ত থেকে রক্তে সংক্রামিত। কাজলের সেই উত্তরাধিকার কই? সে সামান্য নার্সের সন্তান। অভাবে দারিদ্র্যে পিষ্ট হতে হতে বড়ো হয়ে উঠেছে। তার পিতৃ-পরিচয় লুপ্ত, মাতৃপরিচয়ও এ-সমাজে মর্যাদার নয়। কাজল জানে, তার কোনো পুরনো সঞ্চয় নেই, নেই পূর্বপুরুষের কোনো সম্পদ। আছে শুধু আপন পরিশ্রমের উপার্জন। নিজের অভিজ্ঞতায় নিজের সঞ্চয়-ভাণ্ডার গড়ে তোলা। তাকে অনেক লড়াই করে নীচু থেকে উঁচুতে উঠতে হচ্ছে। এ অবস্থায় মানস যা বলতে পারে, এখুনি কাজল তা বলতে পারে না। বলা উচিত হয় না।

বিষয়টা এভাবে চিন্তা করে কাজল যেন একধরণের সান্ত্বনা পায়। এবং মানসের উপর তার মনটাও নরম হয়ে ওঠে। তার সন্দেহ থাকে না, মানসও রাজনীতিতে ঢুকেছে। এ সেই রাজনীতি। না-হলে ওভাবে কথা সে বলতে পারত না। সঙ্গে সঙ্গে মানসকে তার নিকট আত্মীয় মনে হয়। যেন একই রণাঙ্গনের দুই সৈনিক—যেখানে শরৎমাস্টার উভয়ের সেনাপতি।

কাজল অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে সামনে ভয়ঙ্কর একটা দিন আসছে। চারদিকে আকাশের কোণে কোণে রক্ত মেঘে তার ঝড়ের নিশানা। হাওড়া হুগলী চব্বিশ পরগণায় কৃষকেরা জমিদখল ফসলদখলের লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। জোতদার জমিদারের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে রক্ত ঝরছে ধানের মাটিতে। গ্রামে গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে, হাজার হাজার সি. আর. পি এসেছে, উত্তরবঙ্গের

পার্বত্যভূমিতে নকশালবাড়ি খড়িবাড়ির চারদিকে মিলিটারির তাঁবু স্থায়ী হয়ে বসেছে। কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে ফুটে উঠেছে হরতাল-ধর্মঘট-গণআন্দোলনের ডাকের পাশে রক্তবর্ণ নতুন লিখন—সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার ঘোষণা, রাইফেলকে শক্তির উৎস বলে নির্দেশ, গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলার রণধ্বনি। এখানে ওখানে রাইফেল-বন্দুক ছিনতাই হচ্ছে, পুলিশ-জোতদার খুন হচ্ছে, গোপনে গড়ে উঠছে এক সশস্ত্র বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি—চীনের মহান নেতা মাও-সে-তুঙ্ যার চেয়ারম্যান। এই পার্টির কি রূপ, কি কর্মসূচী, কি রণকৌশল কাজল জানে না। এই জেলার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে এখনো তার ঢেউ এসে পৌছয় নি। বিক্ষিপ্তভাবে একটা-দুটো ঘটনা ঘটেছে মাত্র। কিন্তু তার মধ্যেই ফুটে উঠছে প্রলয়ের সঙ্কেত।/ শরৎমাষ্টারের মুখ গম্ভীর হয়েছে। ছাত্রদের সচেতন অংশের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। জেলাস্তরে পার্টি-নেতৃত্ব ঘন ঘন গোপন বৈঠক ডাকছেন। পুলিশের উপরমহলে রদবদল হচ্ছে। বাঙালি এস. পির বদলে একজন পাঞ্জাবিকে আনা হয়েছে। জেলা শাসকের বদলির কথা শোনা যাচ্ছে। থানার ও.সি পাল্টাপাল্টি হচ্ছে। এসবকিছুই যেন ভয়ঙ্কর একটা সময়ের ইঙ্গিত বয়ে আনছে।

বোলপুরের ছাত্র সম্মেলনে গিয়ে কাজল নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছে। সম্মেলন চলা কালেই একদল ছাত্র নকশালবাড়ি খড়িবাড়ির নামে শ্লোগান দিয়েছে। সভামঞ্চে উঠে জোর করে বক্তব্য রাখতে চেয়েছে। ছাপানো হ্যাণ্ডবিল বিলি করেছে—তাতে বলা হয়েছে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের নিয়ে সশস্ত্র ঘাঁটি গড়ে তোলার কথা। বলা হয়েছে—বর্তমান যুগ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চূড়ান্ত পতনের যুগ, মাও-সে-তুঙের চিন্তাধারায় সমাজতন্ত্র ছড়িয়ে পড়ার যুগ। ভোটের রাজনীতি শেষ হয়েছে—এবার গড়ে তুলতে হবে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘাঁটি, শ্বেতসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল প্রতিরোধ, অতর্কিত আক্রমণে শত্রু নিশ্চিহ্ন করার গেরিলা রণকৌশল। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পায় নি, শেষপর্যন্ত সম্মেলন ছেড়ে চলেও গেছে—কিন্তু

কাজল বুঝেছে বিরোধ আসন্ন। নিজের ফ্রন্টই বিরোধ। এ বিরোধের একপক্ষে উত্তেজনার রক্তক্ষয়—অন্যপক্ষে স্থিরমস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে গণসংগঠন গড়ে তোলার সঙ্কল্প। এর বেশী কাজল কিছু বুঝে আসে নি।

ধানকাটার মরসুমে এবার এ জেলাতেও সংঘর্ষ হবে। শরৎ-মাস্টার খোলাখুলিই বলেন তার কথা। খরার কোপে ফলন এবছর ভাল হওয়ার আশা কম। যে সব জমি সরাসরি ময়ূরাক্ষীর জল পেয়েছে, কিংবা ক্যানেলের জল তুলে সেচকাজ করেছে—সেখানে ফসল ভাল হলেও বহু জায়গায় মাঠ পুড়ে গেছে, বীজ ধরার আগেই গাছ ঝলসে যাচ্ছে। যেখানে যেটুকু ফসল হবে তার অধিকার নিয়ে কৃষক-মালিকে জোর লড়াই বাধবে এবার। নিশিন্দার ধান-মাঠেও সে লড়াই হতে পারে। দিনরাত ভাগচাষীরা পুকুরে দুনি লাগিয়ে মাঠে জল ঢালছে, ক্যানেলের জলধারা সরু নালা কেটে এজমি ওজমির বুকে বইয়ে দিচ্ছে। দিনরাত ধানের গোড়া পরিষ্কার রাখছে, ঘাসপাতা আগাছার বংশ নির্মূল করছে। এত পরিশ্রমের ফসল তারা কি তুলে দেবে সরকারবাবুদের গোলায়? এ নিয়ে এখন থেকেই তারা জোট বাঁধছে, শলাপরামর্শ করছে।

ওদিকে নিশিন্দার দাগী আসামীরাও এক এক করে ফিরে আসছে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে তারা অনেকে ফেরার হয়েছিল, চুরি লুটপাট দাঙ্গার অভিযোগে জেলেও গিয়েছিল কয়েকজন। বৃন্দাবন সরকারের ছেলের নেতৃত্বে তারা একজোট হচ্ছে। অন্যপক্ষে নকুল সরকারের ছেলে কুখ্যাত বুধন সরকারও ফিরে এসে পাল্টা দল গড়ে তুলছে। জ্যাঠার দলকে ঠেকানো তার এক উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে পঞ্চায়েত দখল করা। নিশিন্দার বুকে দুই দলে মারামারিও হচ্ছে। আবার কোনো সময় দুই দলই এক হয়ে চাষীমজুরের উপর চড়াও হয়ে আগাম হুমকি দিয়ে রাখছে—ফসল কাটার মরসুমে বাড়াবাড়ি করলে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দেবে তারা।

কাজল নিশিন্দায় যাতায়াত করে। শরৎমাস্টারের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। এসব পরিবর্তন সে লক্ষ্য করেছে। নগেন চৌধুরীর চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কাজল জানে, এ-পাড়ার মানুষগুলোকে জড়ো করে নাইটগার্ডের দল গড়ায় নগেন বাবুর সায় নেই। বিশেষ করে এর মূলে যখন আছে কাজল-সরোজেরা। কে বলতে পারে, রাতজাগার এই দলটাই একদিন সচেতন একটা সংগঠনের রূপ নেবে না? দল বেঁধে নিশিন্দার মুচিবাউড়িদের ফসল কাটার লড়াইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে না?। কাজল জানে, এ সন্দেহ নগেনবাবুর আছে। আসরে যা-ই বলুন না কেন, পাড়ায় দল গড়া তাঁর পছন্দ নয়। তলে তলে দল ভাঙ্গার চেষ্টা করবেন তিনি। পাড়ার নিম্নবিত্ত মানুষকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারলেই তাঁর লাভ। কিছু একটা যদি গড়তে হয় তবে সেটা তো তাঁর নেতৃত্বেই হওয়া ভাল! পাড়ার দুর্গাপূজার কমিটিও নিজের মুঠোয় কব্জা করতে চেয়েছিলেন তিনি। বেশী চাঁদা দেবার, বিনে পয়সায় ত্রিপল বাঁশ দড়ি দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু পাড়ার মানুষ ঘোষালমশাইকে ছেড়ে তাঁকে প্রেসিডেণ্ট করতে চায় নি। তিনি ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট। কাজল আর সরোজ সেক্রেটারি। শশাঙ্ক মাস্টার কোষাধ্যক্ষ। ফলে নগেনবাবু ক্ষমতাহীন। চাঁদা দেন কিন্তু বাঁশ ত্রিপল দড়ি আর দেন না। পূজো মণ্ডপেও বড় একটা আসেন না। পাড়ায় তিনি কাজলদের প্রবল প্রতিপক্ষ।

ঘরে-বাইরে যখন এই অবস্থা তখন সামান্য কারণে মানসকে সে ঈর্ষা করতে পারে না। সে তো তার প্রতিযোগী নয়, সহযোগী। মাঝে মাঝে সে যদি আসে, নিজের বাড়িঘরে দু'চার দশদিনও থাকে, রাত জেগে পাহারা দেয় তাদের সঙ্গে, তবে আর কারো কিছু না-হোক কাজলের বল-ভরসা যে অনেক বেড়ে যাবে এতে সন্দেহ নেই। আর নগেনও আর একটু কোণ্ঠাসা হবে।

কিন্তু পারুলের মুখটা মনে পড়তেই আবার কাজলের বুকে কোথায় যেন কাঁটা বেঁধে। আবার সেই বিষণ্ণতা, সেই একাকীত্বের-

বোধ মনকে গ্রাস করতে থাকে। অথচ এর কোনো সঙ্গত কারণও সে খুঁজে পায় না। পারুলের পাশে মানসকে দাঁড় করিয়ে কিছু একটা ভেবে নেওয়ার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে তার! কবে কোন্ কালে এই জনহীন পল্লীর নির্জন ডাঙ্গায় পারুলের নরম শরীর একহাতে জড়িয়ে অন্যহাতে হ্যাণ্ডেল ধরে একটু একটু করে মানস তাকে সাইকেল চালানো শিখিয়েছে, আর আছাড় খেয়ে পড়ার মুখে দুই কিশোর-কিশোরীর উচ্চ কলহাস্যে মাঠ ঘাট ভরে উঠেছে, অথবা কবে কোন্ দোলের দিন বাজার থেকে বাঁদুরে রঙ এনে পারুলের চুলে ঘষে দিয়েছে মানস, আর পারুল যত জল ঢেলেছে ততই চুল বেয়ে সবুজ রঙের ধারা নামতে দেখে চুল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে আকুল হয়ে কেঁদেছে—এসব পুরনো কিছু স্মৃতি, দৃশ্য ও ঘটনার দ্বারা কি প্রমাণ করা যায়? মানস আজ কতদিন পল্লী ছাড়া। কতদিন পারুলের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ নেই···তবে কাজল কেন বিষণ্ণতায় ভোগে! পারুল বড় হয়েছে দেখে ঘোষালমশাই অবশ্য তার বিয়ের কথা ভাবেন। স্নেহলতা মাঝে মাঝে তাগাদা দেন স্বামীকে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়াতে গিয়ে প্রতিবেশীদের বলেন, ছেলের খোঁজ দিতে। খোঁজখবর পেলে ঘোষালমশাইও চিঠিপত্র লেখেন। অনেকসময় পোস্টকার্ডে লেখা সে চিঠি শহরের ডাকঘরে পোস্ট করার জন্য কাজলকেই বয়ে নিয়ে যেতে হয়। ফিরে এসে সুযোগমত এই নিয়ে সে পারুলের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে। লজ্জায় লাল হয়ে পারুল সরে যায়। কোনো চিঠির উত্তর আসে, কোনোটার আসে না।

পারুলের বিয়ের প্রসঙ্গে স্নেহলতাই তোলেন মানসের কথা। চোখের আড়াল হলে কি হয়, মায়ের মন ঠিক তাকে মনে রেখেছে। স্বামীকে বলেন, 'তুমি চিঠি লেখ ওর বাবাকে। জাতেগোত্রে মিল আছে। আমার মেয়েকেও পছন্দ আছে তাদের।'

ঘোষালমশাই বলেন, 'না কালীর মা, তা হয় না।'

স্নেহলতার অবুঝ মন তর্ক করে, 'হয় না কেন? মেয়ে আমার সুন্দর। ম্যাট্রিক পাশ দিয়েছে—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'হীরের টুকরো ছেলে ওদের। এর চেয়ে হাজার গুণ শিক্ষিতা আর সুন্দরী পাবে ওরা। আমাদের কাছে ও হ'ল আকাশের চাঁদ!'

স্নেহলতা রেগে ওঠেন, 'ঘরে বসে ঘুমোলে সব ছেলেই মেয়ের বাপের কাছে আকাশের চাঁদ!'

ঘোষালমশাই বিরক্ত হয়ে বলেন, 'যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। এ বিয়ের প্রস্তাব ওঠানোই যায় না।'

'খুব যায়। মানসের মা খুব ভালবাসত পারুকে। ছোট থেকে দেখেছে—'

'সে আলাদা জিনিস। তাছাড়া মানস এখনো পড়ছে—'

'পড়া তো একদিন শেষ হবে। এখন থেকেই কথা পেড়ে রাখলে দোষ কি—'

স্ত্রীর হাত এড়ানোর জন্য ঘোষালমশাই বলেন, 'আচ্ছা, আমি শরৎমাস্টারকে বলব। তারই তো ভাগ্নে, তার কথা খুব শোনে ওরা—'

কথাটা স্নেহলতার মনোমত হয়। খুশী হয়ে বলেন, 'তাই যাও, শরৎমাস্টারকেই ধর। গরীবের দুঃখ বোঝে মানুষটা—'

কিন্তু ঘোষালমশাই শরৎমাস্টারের কাছে যান না। তিনি তো অবুঝ ন'ন। কার সঙ্গে কি হয় সে জ্ঞান তাঁর আছে। তবু মনের কোনো গোপন কোণে একটুখানি ক্ষীণ আশা জেগে থাকে। ভাবেন, মানসের পড়াশুনার পাট চুকে গেলে শরৎমাস্টারের কাছে একবার কথাটা তুলবেন তিনি। জন্ম মৃত্যু বিয়ে—তিন তো বিধাতাকে নিয়ে। তিনি নাস্তিক ন'ন। ঈশ্বর ও দৈব মানেন। কথাটা তুলতে দোষ কি। কার হাঁড়ির চাল কোথায় মাপা আছে কে জানে! বড় মেয়ে শৈলরই যে এত ভাল বিয়ে হবে তিনি কি কখনো ভেবেছিলেন।

এসব কাজলের জানার কথা নয়। তবু সে জেনে ফেলে। কাজলের বোন গৌরী শুনে এসে বলে মাকে, 'পারুলদির সঙ্গে নিশিন্দার শরৎমাস্টারের ভাগ্নের বিয়ে হবে মা।'

কাজলের মা অবাক হয়ে বলেন, 'কোন্ ভাগ্নে?'

গৌরী বলে, 'আমাদের পাড়ায় যে থাকত। ওই যে শশাঙ্কবাবুরা যে বাড়িতে ভাড়া আছে।'

কাজলের মা একটু ভেবে বলেন, 'ধেৎ, এ বিয়ে কি হয়! কত ভাল ছেলে ওদের!'

কাজলও বিশ্বাস করে, এ বিয়ে হয় না। তাই কথাটা শোনার পরেও তার মনে কোনো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় নি। মেয়ের মা'রা এমন অনেক দুরাশাই পোষণ করে। এ সমাজে তার মূল্য কানাকড়িও নয়। কাজলের বয়স যা-ই হোক এ অভিজ্ঞতাটুকু তার জন্মেছে।

কিন্তু আজ হঠাৎ মানসকে দেখে বিদ্যুৎ-চমকের মত সেই পুরনো প্রসঙ্গটাই তার মনের দিগন্তে ঝিলিক দিল। তারপর ঘোষালমশাই যেভাবে আদর করে তাকে কাছে ডাকলেন, পাশে বসিয়ে গায়ে পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন, স্নেহলতা যেভাবে এগিয়ে এসে তার খোঁজখবর নিতে লাগলেন, আর পারুল চা দেওয়ার পাট শেষ করে যেভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চোখেমুখে চাপাহাসির তরঙ্গ তুলে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকল—সবটাই যেন একটা বিশেষ অর্থ বহন করে নিয়ে এল কাজলের কাছে। তার হঠাৎ-ই মনে পড়ল, এতদিন ধরে জানা চেনা, এতদিন ধরে যাওয়া আসা—তবু কই একদিনও তো এ কথা মনে পড়ে না ঘোষালমশাই কিংবা স্নেহলতার যে, কাজলের সঙ্গেও পারুলের বিয়ে হতে পারে। আভাসে ইঙ্গিতে কোথাও তো একথা ভুলেও বলেন না তারা! কেন বলেন না? কেন ভাবেন না? মানসের মত তার উচ্চশিক্ষা নেই বলে? কোনো ভাল চাকরি-বাকরির সম্ভাবনায় তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয় বলে? জাতে গোত্রে মিল নেই বলে? কিংবা তার মা হাসপাতালের সামান্য নার্সের কাজ করে বলে? এ কথা তো ঠিকই যে মানসের সঙ্গে কোনোভাবেই তার তুলনা হয় না। মানসের পাশে ছেলে হিসেবে সে নিষ্প্রভ, মলিন। তার সে বিদ্যা নেই, বিত্ত নেই, মর্যাদা নেই। কিন্তু ও-বাড়ির সময়অসময়ের একমাত্র নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত বন্ধু সে ছাড়া আর কে আছে এ পাড়ায়? হাটবাজার থেকে শুরু করে

ঘরসংসারের হাজার কাজ সে ছাড়া আর কে করে? মেয়ের বিয়ের চিঠি লেখার একখানা পোস্টকার্ড আনতে হলেও তো কাজলকেই তা এনে দিতে হয়। পারুলের বিয়ের বাজারটাও কি তাকে দিয়েই করিয়ে নেবেন ঘোষালমশাই!

হঠাৎ ঘোষালমশাই আর স্নেহলতাকে তার খুব স্বার্থপর বলে মনে হয়। মনে হয় সুযোগসন্ধানী। 'কাজল তো ঘরেরই ছেলে, নিজের ছেলের চেয়েও বেশি'—বহুবার শোনা এসব কথা অর্থহীন বলে মনে হয় তার কাছে। মনে হয়, কার্যোদ্ধারের জন্য স্তোকবাক্য! একটা দুরন্ত অভিমান তার বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠতে থাকে। এতদিন পরে নিজেকে যেন বড় একাকী, বিষণ্ণ বোধ হয়। এর আগে কাজল কখনো নিজেকে এমন নিঃসঙ্গ ভাবে নি।

পরের দিন ভোর বেলায় সাইকেল নিয়ে সোজা এসে দাঁড়ায় সে ঘোষালমশায়ের বাড়ির কাছে। ক্রীং ক্রীং বেল্ বাজায়। অন্যদিনের চেয়ে জোরে, কিছু অস্থির অসহিষ্ণু ভঙ্গিতেই বাজায়। কিন্তু পারুল আসে না। উঠোনের দরজা খুলে কালী বেরিয়ে এসে বলে, 'বাজারে যাচ্ছ কাজলদা? আজ আমাদের কিছু লাগবে না।'

কাজল গম্ভীর হয়ে বলে, 'কে বলল লাগবে না?'

'দিদি।'

'সে কই?'

'রান্নাঘরে দুধ জ্বাল বসিয়েছে।'

কাজল চুপ করে যায়। কি করবে ভেবে পায় না। প্রতিদিনের মত পারুল না আসায় বুকের মধ্যে সে একটা ধাক্কা খায়। তার রাতজাগা উত্তেজিত মন এই না-আসাটারও অন্য অর্থ খুঁজে বেড়ায়!

শেষপর্যন্ত সাইকেল থেকে নেমে পড়ে সে। দেয়ালে ঠেসিয়ে রেখে বাড়ির মধ্যে ঢোকে। কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা চলে যায় রান্নাঘরে। একটু মেজাজ নিয়েই বলে, কি এমন রাজকাজ করছিস পারু, যে ডাকলে শুনতে পাস না?'

পারুল অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। কাজলের দিকে ফিরে তাকায় না। বলে, 'শুনেছি তো! কি করে যাই? দুধ উত্‌লে পড়ে যাবে না!'

কাজল দেখে, জ্বলন্ত উনুনে সত্যি দুধ চাপানো। গরম হয়ে ফুলে ওঠার সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু পারুল মুখ ঘুরিয়ে আছে কেন!

কাজল বলে, 'মুখ ফেরা পারুল!'

'কেন!'

'মুখ দেখলে মনের ভাষা বোঝা যায়!'

কাজলের কথায় ও গলার সুরে অবাক হয়ে পারুল ঘুরে তাকায়। সকালের সূর্যের আলো দরজা দিয়ে তার মুখে পড়ে। কাজল দেখে— পারুলের সমস্ত মুখ, গাল কপাল চোখের পাতা তেলে হলুদে মাখামাখি! সে অবাক হয়ে বলে. 'মুখে কি মেখেছিস পারুল?'

পারুল খুব লজ্জা পেয়ে যায়। চোখ নামিয়ে বলে, 'বাসি দুধের সরের সঙ্গে কাঁচা হলুদ বাটা—'

'কি হয় ওতে? মুখের রং সুন্দর হয়?'

পারুল আরো লজ্জা পায়। আর লজ্জা ঢাকার জন্যই ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'ছাই হয়! মুখে কটা গোটা হয়েছে তাই! মা বলল, চানের আগে—'

বলতে বলতে আঁচল তুলে জোরে জোরে সে গাল কপাল ঘষতে থাকে।

আর বাজার যাওয়ার পথে চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ন কাজল ভাবে হঠাৎ পারুলের আজ সারামুখে সরহলুদ মাখার কি কারণ ঘটল!

রাতপাহারার পালা শুরু হয়।

খাওয়া-দাওয়া সেরে এগারোটার কিছু আগে কাজল বেরিয়ে এসে সরোজকে ডাকে। তার হাতে টর্চ ও বর্শা। সকালে বাজার থেকে ফেরার পথে জটিলের দোকান থেকে ব্যাটারিসমেত টর্চখানা নিয়েছে। দাম দেয় নি। এখন খাতায় লেখা থাকবে। পাড়ার

চাঁদা উঠলে দাম শোধ করা হবে। জটিল অবশ্য বলে দিয়েছে, 'চাঁদাপত্তর বুঝি না ভাই। তুমি নিলে, দামও তুমি দেবে। তোমার নামে বাকি-খাতায় লিখে রাখছি।'

কাজল পরিহাস করে বলেছে, 'আমি কোত্থেকে দেব ? আমার চাকরি আছে, না স্বাধীন ব্যবসা আছে ?'

'তাহলে ? কে দেবে ?' জটিলের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে। স্বল্প পুঁজি তার, কোনো ঝুঁকি নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে বলেছে, 'তোমার সঙ্গে তাহলে সরোজদার নামও লিখে রাখলাম ভাই।'

নতুন টর্চ নতুন ব্যাটারির ঝকঝকে পরিষ্কার আলো। অনেক দূরের পথঘাট গাছপালা দেখা যায়। কাজল খুশিমনে এদিকে ওদিকে আলো ফেলতে ফেলতে সরোজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়।

একটুপরেই বন্দুক হাতে সরোজ বেরিয়ে আসে। বলে, 'আর কে আছে আমাদের সঙ্গে ?'

কাজল বলে, 'শশাঙ্কদা আর নিমু আছে।'

'নিমুকে বলা হয়েছে ?'

'ওর দিদিকে বলে এসেছি। গভীর রাত ছাড়া নিমুকে কি বাড়িতে পাওয়া যায় ?'

'হুঁ ! চল, আগে শশাঙ্কদাকে ডাকি, পরে নিমুর খোঁজ করা যাবে।'

রাত জাগতে হবে বলে শশাঙ্ক সন্ধ্যা থেকে ঘুম মারছিল। ডাকাডাকিতে উঠে আসে। বলে, 'তোমরা দাঁড়াও, হাতেমুখে একটু জল দিয়ে আসি।'

শশাঙ্ক নরমধাতের সুখী মানুষ। স্কুলে যায়, আসে, বাড়িতে বসে দু'একটা টিউশনি করে। আর বেশি পরিশ্রম তার ধাতে সয় না। বেঁটে গোলাকার শরীর গলার স্বর মেয়েদের মত মিহি। স্কুলে ছেলেরা এ নিয়ে হাসাহাসি করে। পাড়ায় এসে বাড়িঘর তোলার পর বছর খানেক হ'ল বিয়ে করেছে।

শশাঙ্ক বেরিয়ে বারান্দায় এলে খোলা দরজা দিয়ে তার গায়ের উপর ঝপ্ করে একখানা সূতির চাদর এসে পড়ে। শশাঙ্ক মুখ ফিরিয়ে বলে, 'কি মুস্কিল! গরমে চাদর দিয়ে কি হবে!'

ঘরের ভেতর থেকে নারীকণ্ঠ শোনা যায়, 'ভোররাতে লাগবে!'

সরোজ হেসে ওঠে, 'রেখে দিন শশাঙ্কদা! বৌদি দিয়েছেন। চোর বাঁধতে লাগবে।'

শশাঙ্ক লজ্জা পেয়ে বলে, 'ধেৎ! যতসব মেয়েমানুষের কাণ্ড!'

কিন্তু চাদরটা সে ফেরৎ দেয় না। কোমরে জড়িয়ে বেঁধে রাখে।

কাজল বলে, 'একটা লাঠি বর্শা কিছু নিলেন না, শশাঙ্কদা?'

শশাঙ্ক রাস্তায় নেমে এসে বলে, 'কি দরকার? বন্দুক তো আছে!'

কাজল বলে, 'না, শশাঙ্কদা খালিহাতে থাকা ভাল না, একটা কিছু নিন।'

চোর-ঠেকানোর জন্য ডাঙ্গার সব মানুষের ঘরেই সাধারণ ধরণের কোনো-না-কোনো অস্ত্র মজুদ আছে। বাঁশের লাঠি, লোহার মোটা রড্, ধারালো দা, বর্শা-বল্লম। নিশিন্দার হাটে রাজনগরের কামারেরা ছুরি কাঁচি লাঙ্গলের ফলার সঙ্গে বর্শার ধারালো মুখ নিয়ে আসে। সেই মুখ কিনে শক্ত লাঠির ডগায় লাগিয়ে নিয়েছে অনেকে। আত্মরক্ষা ও গৃহরক্ষার প্রাথমিক উপকরণ। রাতে ঘর থেকে উঠোনে নেমে মেয়েরা যখন কুয়োতলার বাথরুমে যায় - পুরুষেরা তখন আলো ও অস্ত্র হাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। বলা যায় না কিছু। নিশিন্দার বগা কিংবা লখাদের দলটা তো একেবারে নিরীহ ছিঁচকে-চোরের দল নয়। খুনখারাপির দুর্নামও আছে ওদের। অন্ধকারে পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়ে একজন যদি মেয়েমানুষের শরীর জাপটে ধরে, আর অন্যজন হাতের বালা কানের দুল খুলে নিতে চায়—তাহলে খালিহাতে তো ঠেকানো যাবে না তাদের।

কাজল বলে, 'আপনার ঘরে বর্শা নেই শশাঙ্কদা?'

শশাঙ্ক বলে, 'আছে একটা।'

'নিয়ে আসুন।'

শশাঙ্ক যায় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সরোজ বলে, 'কি হ'ল ? যান—'

শশাঙ্ক ইতস্তত ভাবে উত্তর দেয়, 'তোমাদের বৌদি ওটা রেখে দিল যে!'

'কেন ? বৌদি রেখে দিল কেন ?'

'ফাঁকা ঘর তো! ভয় পাচ্ছে। বিছানার পাশে রেখে ঘুমুবে!'

কাজল আর সরোজ তু'জনেই শব্দ করে হেসে ওঠে। সরোজ বলে, 'বীরাঙ্গনা বৌদি আমাদের! আপনার বাড়িতে কোনোদিন চোর ঢুকতে পারবে না শশাঙ্কদা—'

কাজল বলে, 'থাক শশাঙ্কদা, বৌদিকে নিরস্ত্র করা ঠিক হবে না! আমার বাড়ি থেকে বরং একটা লাঠি দিচ্ছি চলুন—'

আরো কিছুক্ষণ পরে তিনজনের ছোট দলটা নিমুর বাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। গোটা পাড়া এখন ঘুমে অচেতন। শেয়ালের ডাক আর ঝিঁ ঝিঁর শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। আকাশে অল্প জ্যোৎস্না। বাতাস বিশেষ নেই। গুমোট গরম।

নিমুদের বাড়িটাও অন্ধকারে ডুবে আছে। ডাঙ্গাপল্লীতে এখন এই একটি মাত্র বাড়ি—যার দেয়ালগুলো মাটির এবং খড়ের ছাউনি। নিমুর বাবা সরকারবাবুদের ইটভঁটিতে কাজ করত। ধানমাঠ থেকে ফসল উঠে গেলে মাঘ-ফাল্গুন মাসে ইট পোড়াত সরকারবাবুরা। নিমুর বাবা সাঁওতালপাড়া থেকে সস্তায় মজুরকামিন ধরে আনত। সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে তাদের মাটিকাটা, মাটিমাখা, জলটানা দেখত। কাঠের ফর্মায় চৌকো করে মাপ মত ইট তৈরির তদারকি করত। ভঁাটিতে কাঁচা ইট থাকে থাকে সাজানোর পর খোপে খোপে কয়লা ভরা ঠিক হ'ল কিনা পরীক্ষা করত। তারপর ইট পোড়ানো হলে ভাঁটি ভেঙ্গে পোড়া ইট আ-পোড়া ইট আলাদা করে সাজিয়ে রেখে শহরের বুকে কোথায় কার নতুন বাড়িঘর উঠছে তার খোঁজে বের হত। বায়না করে হাজার গুণে গরুর গাড়িতে ইট পৌছে

দেবার ব্যবস্থা করে সন্ধ্যার মুখে আবার ঘুরে ঘুরে হিসেব করে দাম আদায় করত। এই ডাঙ্গাজমিতে বাড়িঘর হচ্ছে দেখে ইট দিতে এসে সে আড়াই কাঠা জমি কিনে ফেলল। সরকারবাবুদের হাতে পায়ে ধরে হাজার দশেক ইটও যোগাড় করল। কুয়ো-পায়খানা আর পাঁচিল ইটে গাঁথল, কিন্তু বাড়ি তুলল মাটি দিয়ে। তবে বাড়ির দেয়ালের নীচের অংশে, মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচু পর্যন্ত ইট গাঁথা আছে। আপোড়া ছালট ইট। ইটের উপর পুরু করে মাটি চাপানো। বাইরে থেকে দেখলে মাটির দেয়ালই মনে হয়।

বাড়ি শেষ করার কিছু পরেই নিমুর বাবা ইটভাঁটিতে ঠা-ঠা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মরে গেল। শীর্ণ দুর্বল আধপেটা-খাওয়া শরীর পরিশ্রমের বোঝা আর বইতে পারছিল না। তবে লোকে বলে, তার মৃত্যুটা নাকি বড় সুখের! রোগের জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, বিছানায় শুয়ে থাকা নেই, হাসপাতালে টানাহ্যাচড়া নেই, সর্বাঙ্গে সুঁচ ফোটানোর কষ্ট নেই—দিব্যি ধানমাঠ ভেঙ্গে হনহনিয়ে হেঁটে কাজে গেল আর বোঁটা থেকে পাকা আম খসার মত নিঃশব্দে টুপ্ করে সংসার থেকে সরে পড়ল। এমন সুখের মরণ ক'জনের হয়!

কিন্তু নিমুদের সংসারটা ভেসে গেল। বাপ মরার পর থেকে নিমুর মা, নিমুর দুই দিদি আর নিমু যে কি করে দীর্ঘসময় বেঁচে ছিল—এ হিসেব কারো জানা নেই। বড় দিদি ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে নিশিন্দার এক আধবুড়ো লোকের সঙ্গে দুর্গাপুরে পালিয়েছে। লোকটা সেখানে মোটরগ্যারেজে কাজ করে। সে মাঝেমধ্যে নিশিন্দায় আসে, কিন্তু নিমুর দিদি আর ঘরে ফেরে না। আরেক দিদির বয়সও এখন সাতাশ পার হয়েছে—বিয়ে হয় নি। হওয়ার কোনো লক্ষণও নেই। নিমু কিছুকাল স্কুলে গিয়ে পরীক্ষায় নকল ধরা পড়ে বিতাড়িত হয়েছে। এখন সে বাইশ তেইশ বছরের যুবক। নিশিন্দার খোকন সরকারের দলে থাকে এবং শহরে ও গ্রামে নানা অপকর্ম করে বেড়ায়। তার উপার্জনেই এখন সংসার চলে। কিন্তু সে উপার্জনের রাস্তা মোটেই আইন-অনুমোদিত নয়।

তবে নিমুর একটা গুণ আছে—পাড়ায় সে কারো সঙ্গে অকারণে দুর্ব্যবহার করে না, পাড়ার মেয়েদের উত্যক্ত করে না, সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে এনে কখনো হুল্লোড়বাজিও করে না। বরং ডাকা-ডাকি করে ধরে আনতে পারলে নানা কাজে সে পাড়ার উপকারেই লাগে। নিমুর প্রতি এ-পাড়ার মধ্যবিত্ত মানুষদের একপ্রকার ভয় ও-ঘৃণা মিশ্রিত প্রশ্রয়ের ভাব আছে। কারো বাড়িতে সে আসুক এটা কেউ চায় না কিন্তু কদাচিৎ কোনো দরকারে এসে গেলে আদর করে বসতে বলে, চা খাবে কিনা জিজ্ঞেস করে এবং আন্তরিক ভঙ্গিতে তার চাকরিবাকরির খোঁজ নেয়। কেউ কেউ বিয়ে করারও পরামর্শ দেয়। যেন নিমুর একটা ভদ্র চাকরি আর বিয়েটা হয়ে গেলে পাড়ার লোকে স্বস্তি পায়, তার বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন সংযত সংসারী হয়ে ওঠার আশা পোষণ করে! এ সময় নিমুর দিদির কথাটা কেউ মনেও রাখে না!

নিমুকে সবাই এড়িয়ে চলে কিন্তু প্রয়োজনে ব্যবহার করারও চেষ্টা করে। পাড়ায় ক'বছর ধরে দুর্গাপূজা হয়। ঘোষালমশায়ের পরামর্শেই পুজা শুরু হয়েছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা বে-পাড়ায় ঘুরে বেড়াবে না তাহলে। বৎসরান্তে একবার ব্রহ্মডাঙায় উৎসবের ঢাক বেজে উঠবে, হ্যাজাকের আলোয় আলোময় হবে চারিদিক, মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা হবে। পূজোর জন্য কমিটি হয়, চাঁদা তোলা হয়। সবাই মিলে নিমুকে গিয়ে তাতিয়ে তোলে, 'এবার পুজোতে যাত্রা হবে নিমু। পাঁচশো টাকা চাঁদা তুলে দিতে হবে তোকে!'

নিমু বলে, 'পারব না! নিশিন্দার কালী পূজোর চাঁদা তুলি আমি।'

'সে তো তুলবিই। কিন্তু এ-পাড়ার পূজোটা তো তোর বেশি আপন। এটা তোরই পাড়া।'

'আমার পাড়া! শালা গ্যাস দিচ্ছ!'

'না, তা কেন! এই দেখ্—কমিটিতে তোর নাম আছে। সহ-সম্পাদক করা হয়েছে তোকে—'

'কই, দেখি—'

খাতায় কমিটির নামধাম দেখে নিমু খুশি হয় কিনা বোঝা যায় না। ফেরৎ দিয়ে গম্ভীর মুখে বলে, 'নগেনশালার নাম কেটে দাও!'

পাড়ার লোক ব্যাপারটা বোঝে। নকুল সরকারের জামাই নগেন চৌধুরী। বৃন্দাবন সরকারের ছেলে খোকন। বৃন্দাবনের সঙ্গে নকুলের খুনের মামলা চলছে। খোকন সরকার নকুলের বিরুদ্ধে দল গড়েছে। সেই দলে আছে নিমু। নকুলের জামাই নগেন তার বিরুদ্ধপক্ষ। পাড়ায় নগেন যাতে মাথা তুলতে না পারে—এটা দেখার জন্য তার উপর দলের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। সে বলে, 'ওই হারামির নাম কেটে দিলে আমি নিশিন্দা থেকেই পাঁচশো টাকা চাঁদা তুলে দেব।'

পাড়ার লোকে বোঝায়, 'ওই নামটাই আছে। ক্ষমতা তো কিছু নেই। ঠুঁটো জগন্নাথ! না প্রেসিডেন্ট, না সেক্রেটারি! তুই দেখ না ভাল করে—'

নিমু বলে, 'ঠিক আছে। রসিদবই দিয়ে যাও। কিন্তু দেখো, ও শালা যেন মোড়লি মারতে না আসে—'

নিমু শ'তিনেক টাকা তুলে দেয়। হয়ত আরো বেশিই তোলে। কিন্তু তার হিসেব পাওয়া যায় না। কেননা পুজার শেষে রসিদবই সে কখনো জমা দেয় না। তাতে পল্লীর লোক রাগ করে না। বাইরে থেকে যা পাওয়া যায় তা-ই লাভ। তিনশ টাকায় দুবরাজপুরের দল আনিয়ে পৌরাণিক যাত্রা হয়—'চাঁদবণিকের পালা' কিংবা 'মহিষাসুর বধ'। যাত্রার আসরে নিমু বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পাড়ার লোক মনে মনে বিরক্ত হয় কিন্তু তাকে চুপ করে বসতে বলার সাহসও কেউ পায় না।

একবার একশ টাকা বায়না নিয়েও যাত্রার দল আসে নি। পল্লীর মানুষ সামিয়ানা খাটিয়ে চটসতরঞ্জি বিছিয়ে হ্যাজাক জ্বালিয়ে বসে আছে। চারপাশের গাঁ থেকে মানুষজনও আসতে শুরু করেছে। কিন্তু যাত্রাপার্টির দেখা নেই। সাধারণত দুপুরের দিকেই চলে আসে

তারা। স্নান-খাওয়া-বিশ্রাম সেরে বিকেল থেকে সাজগোজে বসে। এবার কি হ'ল? পাড়ার কর্তাব্যক্তিদের মুখ শুকনো। দুই সম্পাদক কাজল-সরোজের তো চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম। শুধু উৎসবের আনন্দটুকু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা নয়, তিন গাঁয়ের মানুষের কাছে পল্লীর মানসম্মান নিয়েও টানাটানি!

রাত আরো বাড়লে নিমু রেগে গিয়ে বলে, 'শালা ফোরটুয়েন্টি পার্টি। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা—'

বোলপুরের দল ছিল সেবার। নিমু ঠিকানাপত্র আর বায়নার কাগজ নিয়ে নিশিন্দায় চলে যায়। তারপর সারারাত ধরে সে কোথায় থাকে, কি করে—পাড়ার লোক জানে না। পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ দলের দু'জন লোককে প্রায় ঘাড় ধরে এনে ফেলে পূজামণ্ডপে। সরোজ-উৎপল-কাজলদের ডেকে বলে, 'বেশি পয়সা নিয়ে ভীমগড়ে যাত্রা করতে গিয়েছিল শালারা। আসর থেকে তুলে এনেছি।'

সরোজ অবাক হয়ে বলে, 'তুমি খোঁজ পেলে কি করে?'

নিমু ঠোঁট টিপে হাসে, 'অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। বৃন্দাবন-জ্যাঠার ঘরে বসে খোকনদাকে দিয়ে চারদিকে ফোন করালাম। বোলপুরের দল আর কদ্দুর যাবে! ভীমগড় থানা থেকে খবর দিল—'

'থানা থেকে?'

'খোকনদা তো থানাগুলোতেই ফোন করছিল!'

বৃন্দাবন সরকার, খোকন সরকার, থানা-পুলিশ—এসব কথা শুনে সরোজেরা কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। আর কথা বাড়ানো নিরাপদ মনে করে না।

দুপুরের একটু পরে যাত্রার দলও চলে আসে। নতুন করে আশেপাশের গাঁ ক'খানায় ঢোল সহরৎ হয়। রাত্রে যাত্রার আসর বসে। পাড়ার মানসম্মান বাঁচে। নিমু চোখ লাল করে দলের অধিকারীকে শাসায়, 'বায়না নিয়ে ফের যদি এমন কথার খেলাপ করবেন চাঁদি

চেছে গজাল পুঁতে দেব! চিনে রাখুন আমাকে। আমার নাম নিমাই নন্দী!' কাজল-সরোজকে ডেকে বলে, 'আর একশটাকা দিয়ে দাও ওদের। গতকাল আমাদের হ্যাজাক ভাড়া করতে হয়েছে, মাইক ভাড়া করতে হয়েছে। যাত্রা হয় নি বলে ভাড়া তো কেউ ছাড়বে না। সব খরচ কেটে নাও ওই শালাদের হিসেব থেকে—'

শেষপর্যন্ত ছ'শোর জায়গায় দুশো টাকা নিয়েই বিদেয় হতে হয় যাত্রাপার্টিকে। নিমুর প্রসঙ্গ উঠলে পাড়ার লোক এখনো সেসব কথা বলে। নিমু ছাড়া এমন অসম্ভব কাজ আর যে কেউ করতে পারত না—অকপটে সবাই স্বীকার করে। তারপর গলা নামিয়ে আক্ষেপ করে, 'ছেলেটা যদি খোকনদের দলে মিশে বখাটে গুণ্ডা না হয়ে যেত তাহলে মানুষের অনেক উপকারে লাগত!'

নিমু সম্পর্কে কাজলের নিজেরও একপ্রকার মিশ্র-প্রতিক্রিয়া আছে। ওর ঘরসংসারের অবস্থা সে জানে। বাপ মরার পর একরকম অনাহারে থেকে কি কঠিন দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে ওরা এতকাল বেঁচে থেকেছে, নিমুর কেন লেখাপড়া হয় নি, কেন সে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে, চাঁদার টাকা থেকে টাকা চুরি করে, খোকনদের দলে মিশে ভোটের ঘরে বোমা ফেলে, নির্জন রাস্তায় দল বেঁধে মালবোঝাই ট্রাক আটকে জিনিশপত্র নামিয়ে নেয়—এসবের উৎস কোথায় এবং কেন—কাজলের অজানা নয়। কিশোরকাল থেকে একসঙ্গেই তো বড় হয়েছে তারা। এক স্কুলে একই সঙ্গে পড়েছে। তার অধঃপতন কাজলকে ব্যথা দেয়। সহানুভূতিও সৃষ্টি করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিমুকে সে প্রবলভাবে ঘৃণাও করে। দারিদ্র্য থেকে আত্মরক্ষার পথ যে লুটপাট গুণ্ডামি নয়—এটুকু বোঝে বলেই নিমুর সমর্থনে কখনো একটা কথাও বলে না। এমন কি পাড়ার পুজায় কিংবা অন্য উৎসবে নিমুকে কোনো কমিটিতে রাখার পক্ষেও সে অন্তর থেকে সায় দেয় না। তাকে তাতিয়ে-ভজিয়ে চাঁদা তোলানোর বিষয়েও আপত্তি করে। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত পাড়ার দুর্বলচিত্ত ও সুযোগসন্ধানী মানুষগুলো কাজলের মনোভাবকে আমল দেয় না।

কাজলও সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে জোর করে কিছু বলার সাহস পায় না। তাছাড়া নগেন চৌধুরীর বিষয়টাও তাকে মাথায় রাখতে হয়। নিশিন্দার শরৎমাস্টার বলেন, এ-পাড়ার প্রধান শত্রু নগেন। পাড়ার মানুষগুলো যেন তার খপ্পরে না পড়ে। সতর্কভাবে তার বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট করতে হবে। সূক্ষ্মভাবে তার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে হবে। বৃন্দাবন সরকারেরা এখন পতনের মুখে। নগেন ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে জাঁকিয়ে উঠছে। শহরের ভদ্রলোকী রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব বাড়ছে। পাড়া থেকেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করা দরকার। কাজল যেন সজাগ থাকে। নিমু নগেনের বিরুদ্ধপক্ষ। বছর দুই আগে নগেনের বাড়িতে একবার নাকি বোমাও ছুঁড়েছিল সে। পাড়ার মধ্যে সে এক ভয়ানক কাণ্ড। কাজল সব খবর রাখে।

নিশিন্দার বড়পুকুরে টানাজাল ফেলে সেবার মাছ তুলে নিয়েছিল বৃন্দাবন সরকার। খোকন সরকার দল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল পাড়ে, আমগাছতলায়। নকুল সরকারের ছ'আনা অংশ আছে পুকুরে। তার লোক মাছের ভাগ চাইতে এসে খোকনের হাতে ঘাড়ধাক্কা খেয়ে ফিরে গেছে। নকুলের ছেলে বুধন সরকার দল নিয়ে দাঙ্গা করতে আসছিল। নকুল বাধা দিয়ে অন্যরকম পরামর্শ দিয়েছে। পুকুর থেকে মাছ তুলে কাঠের পাটা-পাতা রিক্সায় বোঝাই করে বাজারের আড়তে নিয়ে আসছিল খোকন। সঙ্গে ছিল নিমাই। সদর-কোর্টের সামনে বুধন আর তার সঙ্গীরা রিক্সা আটক করে। স্কুটার চালিয়ে নগেন চৌধুরীও ছুটে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ান। একটু পরেই থানা থেকে ও.সি আসেন সিপাই নিয়ে। মাছের গাড়ি আর বাজারে যেতে পারে না। থানায় যায়। সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ মণ মাছ— বড় বড় রুই কাৎলা মৃগেল, চারহাজার টাকার উপর দাম। খোকন সরকার চোখ রাঙিয়ে বলে, 'মাছ পচে গেলে কে দায়ী হবে? দাম দেবেন আপনারা?' থানার ও.সি ঘুঘু লোক, সাপের গালে চুমু খান, ব্যাঙের গালেও। চোখ ছোট করে বলেন, 'মাথা গরম করবেন না

খোকনবাবু। নিজেদের ঝগড়া নিজেরাই মিটিয়ে নিন!' বৃন্দাবন সরকার ছুটে আসে, নকুল সরকারও। শেষপর্যন্ত থানায় বসে দশ আনা ছ'আনা হারে মাছের ভাগ হয়। বড় আকারের দুটো রুই থানার ভোগে রেখে বাকিটা বাজারে যায়। বৃন্দাবন থানার উপর ক্রুদ্ধ হয়, তার চেয়েও বেশি ক্রুদ্ধ হয় নগেন চৌধুরীর উপর। ত কেমন সন্দেহ হয়, নগেনের কূটবুদ্ধিতেই এমনটি ঘটেছে। থানার নতুন ও.সি নগেনের বন্ধু ও বিশেষ অনুগত বলে শোনা গেছে। নকুল দাঙ্গা করতে পারে কিন্তু বুদ্ধির প্যাঁচ কষতে জানে না। এ বিষয়ে নগেন ওস্তাদ। খোকন সরকার দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'শালা বউকে যদি বেধবা না বানাই……'

নিমাই বলে, 'তুমি হুকুম দাও খোকনদা, রাতের বেলা ঝে দিই একখানা!'

এর ক'দিন পরেই প্রায় মধ্যরাতে নগেন চৌধুরীর বাড়িতে বে ফাটে। বাইরের উঁচু পাঁচিলের খানিকটা অংশ ধ্বসে যায়। শ পাড়ার ঘুমন্ত মানুষগুলো চমকে ওঠে। পাড়ায় ডাকাত পড়ে ভেবে ঘরে ঘরে একটা ভয়ার্ত কোলাহল ওঠে। কিন্তু বাইরে আস সাহস পায় না। নগেন চৌধুরী ছাদে উঠে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ট ফেলেন। তাঁর হাঁকডাকে চাকর-বাকরেরা সাহস পেয়ে লাঠি হাতে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। তখন পাড়ার লোকও দরজা রাস্তায় নামে। ছাদ থেকে নগেন চৌধুরী সবাইকে অভয় দেন, ' পাবেন না আপনারা। তেমন কিছু নয়! সামান্য ব্যাপার—'

ঘোষালমশাই চিৎকার করে বলেন, 'এত শব্দ হল কিসের?'

নগেন চৌধুরী বলেন, 'কালীপুজোর পটকা ফাটিয়েছে কে পরশু থেকেই তো পুজো—'

নিশিন্দার কালীপুজো জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ। দশহাতি কা হয় সেখানে। একশ আটটা পাঁঠা বলি হয়। বাজি পোড়ে, মশ জ্বলে, বোমা ফাটে। সাতদিন ধরে উৎসব চলে। কিন্তু এপাড় সঙ্গে তার সম্পর্ক তো শুধু চাঁদা আদায়ের। এখানে আজ মধ্যরা

হঠাৎ একটা পট্‌কা ফাটতে যাবে কেন। পাড়ার লোক কিছু বুঝতে পারে না। নগেনবাবুও আর কিছু ভেঙ্গে বলেন না। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন রহস্যময় হয়ে থাকে।

কিন্তু কাজল সন্দেহ করে, খোকন সরকারের নির্দেশে বোমাটা নিমুই ফাটিয়েছে। হয়ত নিমুর সঙ্গে খোকনের দলের আরো দু' একজন ছিল। বোমা ফাটিয়ে নিমুর ঘরেই তারা আশ্রয় নিয়েছে। ধূর্ত নগেন চৌধুরী সব বুঝতে পেরেও চেপে গেছেন। পাড়ায় নিমুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তিনি সম্মানহানি করতে চান না। যুদ্ধ হয় সমানে সমানে। নিমু তো একটা চামচিকে মাত্র। কোথায় কার সঙ্গে লড়তে হবে নগেন চৌধুরী জানেন।

কোথায় কার সঙ্গে লড়তে হবে—তার কিছু কিছু কাজলও জানে। কাজেই এই মুহূর্তে সে নিজেও নিমুকে শত্রুপক্ষ করতে চায় না। বরং নগেনের বিরুদ্ধে তাকে কাজে লাগানোর কথা চিন্তা করে। কিন্তু পথটা যে পিচ্ছিল এবং নিমু যে মোটেই বিশ্বস্ত নয়—এ সম্পর্কেও সে যথেষ্ট সজাগ ও সতর্ক থাকে।

নিমুর বাড়ির কাছে এসে কাজল বলে, 'তুমি ডাক সরোজদা!'

সরোজ বলে, 'কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না যে! তুই ডাক—'

মাটির দেয়াল ঘেঁষে ছোট জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় কাজল। নীচু গলায় ডাকে, 'নিমু আছিস ঘরে—'

নিমুর মা সাড়া দেয়, 'আছে। কেন ডাকছ এত রাতে?'

কাজল বলে, 'ডিউটি আছে। ডেকে দিন।'

'আমি ডাকলে কি উঠবে? তোমরাই ডাকো বাবা!'

জানালায় মুখ রেখে কাজল এবার জোরে ডাকাডাকি শুরু করে। সরোজও ডাকে। শশাঙ্ক একটু গাম্ভীর্য নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরেই নিমুর কাঁচা ঘুম ভাঙা রুষ্ট গলা শোনা যায়, 'কে রে! এত হল্লা কিসের?'

কাজল বলে, 'উঠে আয় নিমু। তোর ডিউটি আছে আজ!'

'কিসের ডিউটি ?'

'সে কি কথা! মিটিঙে ঠিক হল না কাল ?'

'আমি ছিলাম মিটিঙে ?'

'নাই বা থাকলি। পাড়ায় তো থাকিস। তোর নাম উঠেছে আজ!'

'উঠুক গে। যাব না আমি!'

'আসবি না ?'

'না।'

কাজল চুপ করে যায় কিন্তু সরোজ কেমন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে হাতে বন্দুক থাকলে তার মেজাজটাই কেমন বদলে যায়। নিজেকে নির্ভয় বেপরোয়া শিকারী মনে হয়। বনে-জঙ্গলে ঘুরে তার বাবা বাঘ শিকার করতেন। মৃত বাঘের চামরা আছে তার ঘরে, হরিণের শিংওলা মুখ আছে এবং শিকারী বাপের রক্ত আছে শরীরে। সুযোগ পেলে সেও একদিন বাঘ শিকারে যাবে—এমন কথা সে প্রায়ই বলে। তার ঘরের আলমারি দেশিবিদেশি বাঘ-শিকারের ছবিওলা বইয়ে ভরা। নিমুর কথায় রেগে উঠে চড়া গলায় সে বলে, 'কেন ডিউটি দিবি না শুনি ? পাড়ার দশজনে মিলে ঠিক করেছে, তুই না মানবার কে ?'

নিমু উত্তর দেয়, 'আমার ইচ্ছা!' তারপরই বলে, 'ঘুম পেয়েছে!'

সরোজ বলে, 'আমাদের ঘুম পায় না নাকি ?'

কাজল টর্চটা উঁচু করে বোতাম টিপে নিমুর মুখের উপর আলো ছড়িয়ে বলে, 'এই তো ঘুমটুম ছুটে গেছে! আয় না বাইরে—'

নতুন টর্চের নতুন ব্যাটারির হঠাৎ-ঝলকানো আলোতে নিমুর মুখচোখ কুঁচকে যায়। খুব রেগে চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'ঘরের মধ্যে অসভ্যের মত টর্চ মারছিস কেন! দিদি শুয়ে আছে না ওপাশে। যা, চলে যা, যাব না আমি!' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে দুম্ করে জানালাটা বন্ধ করে দেয়। লজ্জিত বিব্রত কাজল টর্চটা নিভিয়ে ফেলে। কিন্তু মনে মনে যথেষ্ট অপমানিত ও আহত হয়। চাপাগলায় বলে, 'নিমুটার ব্যবহার দেখলে সরোজদা!'

সরোজের তখন রাগে সারা শরীর কাঁপছে। শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি এসে তাকে সামাল দেয়। হাতের ডানা ধরে টানতে টানতে ফিসফিস করে বলে, 'চলে এস সরোজ। ওকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। গোঁয়ার-গোবিন্দ একটা—'

বন্দুকে হাত রেখে সরোজ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'গোয়ার্তুমি ছুটিয়ে দেব! চেনে না তো আমাকে!'

শশাঙ্ক বলে, 'আঃ সরোজ! শুনতে পাবে! ওর সঙ্গে কি আমাদের বিবাদ করা সাজে!'

শশাঙ্কর কথায় সরোজ একটু যেন শান্ত হয়। বলে, 'ঠিক বলেছেন শশাঙ্কদা! গুণ্ডা বদমাইশ একটা! আদর করে আমরাই মাথায় তুলেছি—'

ততক্ষণে শশাঙ্ক তাকে আরো দূরে সরিয়ে এনেছে। এখন সরোজ যা-ই বলুক নিমুর কানে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর যথেষ্ট উত্তপ্ত হলেও কথাগুলো সরোজ খুব চাপা গলাতেই বলছে। নিমুকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বলাটা যে নিরাপদ নয়—এ জ্ঞানটুকু সে হারায় নি!

কাজল আর কথা বলছে না। সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব নয়। তাছাড়া ঘরের মধ্যে আলো ফেলাটা যে ঠিক হয় নি—সে বুঝতে পেরেছে। নিমুর কথাই অবাক হয়ে ভাবছে সে। এ কেমন স্বভাব ওর! নিজে দিনরাত হাঁ করে মেয়েদের শরীর দেখে বেড়াচ্ছে। নিশিন্দার খোকনদের সঙ্গে মিশে মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি করছে। গত বছর কালীপূজার সন্ধ্যা-রাত্রে দলবেঁধে এক সাঁওতাল কামিনকে হাটতলার পচুইখানা থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল বলে—সাঁওতাল পাড়া থেকে মরদেরা ছুটে এসেছিল তীর ধনুক, টাঙ্গি নিয়ে। বৃন্দাবন সরকার টাকা আর মদ খাইয়ে শান্ত করেন ওদের। সেই নিমুই নিজের বোনের ব্যাপারে কত সন্দিগ্ধ, কত সতর্ক! বড়দি পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে যেন আরো কঠোর হয়েছে। ঘর থেকে আর বেরুতে দেয় না তাকে, ধানমাঠের পুকুরে যাওয়াও নিষেধ। সেদিন সিদ্ধেশ্বরের বউয়ের সঙ্গে রিক্সায় চেপে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল বলে রাতে ফিরে

নিমু নাকি তাকে চুলের মুঠি ধরে মারতে বাকি রেখেছিল। নিমুর মা কাজলের মা'র কাছে যাতায়াত করে, ঘোষালমশায়ের বাড়িতেও যায়। এসব কথা তার মুখেই শোনা যায়। নিমুর প্রশংসায় সে এখন পঞ্চমুখ। ছেলে রোজ্‌গেরে হয়েছে। ঘরে চাল ডাল আনে। ছু'বেলা অন্ন জোটে। শীতে কম্বল কিনে দিয়েছে মাকে। কিছু টাকা জমিয়ে দিদিটার বিয়ে দেবার কথাও সে নাকি ভাবতে শুরু করেছে। শুধু যদি সময় মেনে সে ঘরে ফিরত আর গাঁয়ে-শহরে মারদাঙ্গাটা একটু কম করত—তা হলেই নাকি ছেলে নিয়ে নির্ভাবনায় দিন কাটাতে পারত নিমুর মা!

কাজলের কানেও এসব কথা আসে। আজ মধ্যরাতে ডাঙ্গা-পল্লীর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিমুর ব্যবহারে যথেষ্ট অপমানিত হয়েও বিষণ্ণভাবে সে চিন্তা করে—নিমুর মধ্যে এ কোন্ নিমু বাস করে! এই নিমুকে নিয়ে সে করবে! কি ভাবে কাজে লাগাবে! ঘোষাল-মশাইকে সব কথা বলে তাঁকে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করবে? তা করা যায়। নিমু তাঁর কথা শুনতে পারে। নিমুকে এখুনি ছাড়া চলবে না।

সরোজ বলে, 'কি করবে কাজল? তিনজনেই ডিউটি হবে আজ?'

শশাঙ্ক বলে, 'হোক না! বন্দুক তো আছে। প্রথম দিন, ঘণ্টা তিনেক জেগে শুয়ে পড়ব গিয়ে।'

কাজল বলে, 'এক কাজ করব সরোজদা, মানসকে ডাকব?'

'মানসকে?'

'হ্যাঁ। ও তো ডিউটি দিতে রাজি হয়েছে কাল। চারজন না হলে অসুবিধা হবে শশাঙ্কদা। ছু'জন ছু'জন করে ছু'দিকে ঘুরতে হবে।'

'বেশ তো, ডাকা যাক। ক্ষতি কি, পাড়ারই তো ছেলে।'

শেষপর্যন্ত মানসকে ডাকাই স্থির হয়। সরোজ অবশ্য কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করে। কতদিন পরে পাড়ায় এসেছে মানস। এক রাত্রিও পার হয় নি। তাকে ধরে বেঁধে ডিউটিতে জুড়ে দেওয়া!

কেমন যেন অশোভন, অভব্য মনে হয়। কিন্তু কাজলের কোনো সংকোচ নেই। শরৎমাস্টারের ভাগ্নে তার আপনজন। একই ভাবনা চিন্তা মানসিকতার শরিক। সে এসে রাত জাগবে—তাতে ক্ষতি কি!

মানসদের বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে। একটু অবাকও হয়। এতরাত্রে বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে যেন। লণ্ঠনের মৃদু অস্পষ্ট আলোর রেখা বন্ধ দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে সরু হয়ে বাইরে এসে পড়েছে। মানস কি রাত জেগে পড়াশুনা করছে? এই গ্রীষ্মে জানালাগুলো বন্ধ কেন?

কাজল আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে আসে। ঘরের মধ্যে চাপা গলায় কারা যেন কথা বলছে। মানসের মা? তিনি এত রাত্রে জেগে আছেন? না কি মানস শব্দ করে পড়ছে? কিন্তু না, মেয়েমানুষের গলা নয়, পড়ার সুরও নয়, কারা যেন কিছু একটা নিয়ে চাপা উত্তেজিত ভঙ্গিতে তর্কবিতর্ক করছে। কারা? এত রাত্রে? এই নির্জন ডাঙ্গাপল্লীতে? বিস্মিত বিভ্রান্ত কাজল কিছু অনুমান করতে না পেরে ডেকে ওঠে, 'মানস! এই মানস! জেগে আছ নাকি তুমি!'

'কে? কে ডাকে?' মানসের দ্রুত বিচলিত গলা শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলোটুকুও যেন নিভে যায়। কয়েকমুহূর্তের জন্য গভীর নিঃশব্দতা নেমে আসে।

কাজল বলে, 'আমি ডাকছি।'

'আমি কে?'

'কাজল।'

'ও, কাজল! তুমি এত রাত্রে? দাঁড়াও, যাচ্ছি—'

মানস দরজা খুলে বাইরে আসে। ঘরের ভেতর অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। ছাইদানিতে জ্বলন্ত সিগেরেটের টুকরো সামান্য আগুনের ফুলকি ওড়ায়। ইচ্ছে থাকলেও কাজল টর্চ জ্বালানোর সাহস পায় না। মানস বাইরে এসে টান দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর বন্ধ দরজার পাল্লায় শরীর ঠেকিয়ে দাঁড়ায়। অন্ধকারে তার মুখ চোখ ভাল দেখা যায় না

কাজল বলে, 'আমাদের একজন লোক শর্ট পড়ে গেছে। ওই নিমুটাকে কিছুতেই ওঠানো গেল না। তুমি ডিউটি দেবে বলেছিলে—'

মানস বলে, 'আজই?'

'হ্যাঁ। অসুবিধা আছে?'

'না! একটুও না! চল বেরিয়ে পড়ি।' মানস ছটফটে গলায় এমন ভঙ্গিতে কথা বলে যে কাজলের কানে কেমন অস্বাভাবিক ঠেকে। যেন মানস তাকে তাড়া দিয়ে বারান্দা থেকে নামিয়ে দূরে সরিয়ে নিতে চায়! সে বলে, 'জামা পরা আছে? টর্চ নেবে না?'

'কি দরকার! গেঞ্জি গায়েই হবে। টর্চ তো তোমাদের আছে।'

'একটা লাঠি-টাটি—'

'কেন? চোর ঠেঙাতে হবে?' মানস শব্দ করে হেসে ফেলে, 'ছিঁচকে চোরকে এত ভয় তোমাদের!'

মানসের কথায় যেন খোঁচা লাগে কাজলের। সে কি বলবে ভেবে পায় না। দরজা সামান্য ফাঁক করে মানস ঘরে ঢোকে। অন্ধকারে একটা জামা খুঁজে নেয়, চটি জুতো পায়ে গলায়, দেশলাই ও সিগেরেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে ফের বাইরে চলে আসে। ভেতর থেকে কেউ দরজায় খিল দেয়। কাজলকে নিয়ে মানস রাস্তায় নামে।

সরোজ বলে, 'আমরা দু'জন সদানন্দের ঘরের দিকে যাচ্ছি। তোমরা সিদ্ধেশ্বরের ঘর হয়ে ধানমাঠের ধার ঘেঁষে চক্কর দিয়ে ওই নিমগাছতলায় আসবে—'

কাজল বলে, 'মানসকে তুমি সঙ্গে নাও সরোজদা। ওর খালি হাত—'

সরোজ বলে, 'বেশ, মানস আমার সঙ্গে থাকুক।'

টর্চের আলোতে মানস এতক্ষণে বুঝতে পারে সরোজের কাঁধে বন্দুক আছে। অন্ধকারে টর্চ জ্বলে উঠলে বন্দুকের মসৃণ ইস্পাতের নল ঝকমকিয়ে ওঠে। মানসের চোখ চকচক করে। গম্ভীর গলায় বলে, 'চোরের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধযাত্রা! সশস্ত্র সংগ্রাম! গুলিও ভরে রেখেছেন নাকি সরোজদা?'

সরোজ বলে, 'না! ভরতে কতক্ষণ!'

'চোর দেখলে গুলি করবেন?'

'আগে দেখি, তারপর তো গুলিগোলার কথা!'

অন্ধকারে পথ হেঁটে উৎপলদের বাড়ির কাছে নিমগাছতলায় এসে দাঁড়াতেই একটা প্যাঁচা কর্কশ শব্দে ডেকে ওঠে। সরোজ একটু চমকে যায়। টর্চ তুলে গাছের ডালপালার বুকে আলো ফেলে। প্যাঁচাটা আবার ডাকে। মানস বলে, 'শব্দ শুনে গুলি ছুঁড়ে ওটাকে মারতে পারবেন, সরোজদা?'

সরোজ বলে, 'পারব হয়ত।'

'আমিও পারব!'

'তুমি! তুমি বন্দুক ছুঁড়তে জান?'

'জানব না কেন! এটা এমন কি শক্ত কাজ!'

'কি করে জানলে? বন্দুক আছে ঘরে?'

'না, ঘরে নেই। এন্. সি. সি ট্রেনিং-এর ক্যাম্পে গিয়ে শিখেছি। শুটিং-এ খুব নাম হয়েছিল আমার। প্রাইজ পেয়েছি। বন্দুকটা দিন, এক গুলিতেই ওটা শেষ করে দিচ্ছি—'

সরোজ একটু ভেবে বলে, 'না। রাতের বেলা গুলির শব্দ হলে পাড়ায় হৈচৈ হবে। সেবার নগেনবাবুর বাড়িতে একটা বোমা ফেটেছিল, গোটা পাড়ায় সে কি কাণ্ড! কাল শালবনে চল, হাতের টিপের পরীক্ষা হবে!'

'কি পাওয়া যায় শালবনে?'

'বুনোহাঁস, তিতির—'

মানস অল্পকাল চুপ করে থেকে বলে, 'না সরোজদা, ওসব নরম পাখি আমি মারি না।'

সকালে কাজলের মুখে সব শুনে ঘোষালমশাই একটু বেলার দিকে নিমুকে ডেকে পাঠান। কিছু আগে ঘুম থেকে উঠেছে। কোমরে লুঙ্গির উপর গামছা জড়িয়ে খালি গায়ে নিমদাঁতন ঘষতে

ঘষতে সে এসে দাঁড়ায়। দিনের পরিষ্কার আলোতে নিমুর শরীরের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হ'ন ঘোষালমশাই। সেই ফ্যাকাশে রোগাটে ভাবটা আর নেই। হাতে পায়ে দিব্যি মাংস লেগেছে নিমুর, বুকের হাড়পাঁজরা ঢেকে শক্ত পেশী ফুলে উঠেছে। মাথায় ঝাকড়া চুল, গাল পর্যন্ত নামানো মোটা জুলপি, উঁচু নাকের তলায় ছোট করে ছাঁটা গোঁফ। সেদিনের বাপ-মরা কালো-ক্যাংটা ছেলেটা এখন রীতিমত শক্ত সমর্থ যোয়ান!

ঘোষালমশাই বলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস নিমু?'

নিমু বলে, 'পুকুরে চান করতে।'

'কেন? পুকুরে কেন?'

নিমু দাঁত বের করে হাসে, 'দাপিয়ে চান করব আজ। অনেকদিন পুকুরে যাই না। সাঁতার ভুলে গেছি কিনা দেখব।'

ঘোষালমশাই ঘাড়মাথা তুলিয়ে যেন নিমুকে খুশি করার জন্যই বলেন, 'ভাল। মাঝেমধ্যে পুকুরে দাপাদাপি করে চান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। আমারও ইচ্ছে করে—'

নিমু বলে, 'চলুন যাই, মেসোমশাই!'

ঘোষালমশাই হাসেন, 'সে বয়স কি আছে বাবা! একটু হাঁটাচলা করলেই এখন বুকে হাঁপ ধরে।'

কথা ক'টা বলে একটু চুপ করে থাকেন তিনি। একপাশে সরে গিয়ে দাঁতন চিবিয়ে থু থু করে থুতু ফেলে নিমু। ভূমিকা না বাড়িয়ে ঘোষালমশাই এবার কাজের কথায় আসেন, 'কাল তোর ডিউটি ছিল। দিস্ নি কেন?'

নিমু নিরাসক্তভাবে জবাব দেয়, 'কি হবে দিয়ে।'

'কেন? পাড়ায় চুরি বন্ধ হবে।'

নিমু দাঁতন চিবিয়ে আবার থুতু ফেলে, 'যার হবে তার হবে, আমার কি! আমার ঘরে কি আছে যে চুরি হবে?'

'কিছু নেই?'

নিমু সজোরে ঘাড় নাড়ে, 'না নেই। সোনাদানা নেই, ট্রাঙ্ক

স্যুটকেশ নেই, কাঁসাপেতল নেই। সব বেচে খাওয়া হয়ে গেছে চোর আমার কি করবে!'

ঘোষালমশাই চিন্তাক্লিষ্ট মুখে নিমুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'সে-সব নাই-বা থাকল। ছাগল আছে তো একটা। উঠোনে গাছপালার ফলফলান্তি আছে—'

'নিক্‌গে!'

'কেন? নেবে কেন? সেটা ঠেকানোর জন্যই তো রাতজাগার দল গড়া।'

'গড়ুক্‌গে! আমি পাড়ার কোনো ভালমন্দে নেই মেসোমশাই!'

ঘোষালমশাই এবার একটু বিরক্ত হন। বয়সের অনুপাতে নিমুর কথাবার্তাগুলো বেশ পাকা ধরণের। এই বয়সে হাত পা মুখ কেমন লাবণ্যহীন হয়ে পাকিয়ে উঠেছে। বিড়ি টেনে টেনে ঠোঁটদুটোও তামাটে। চোখের সাদাজমিতে রক্তাভা। গাঁজা-গুলি খায় কি না কে জানে! একটু ধমকের সুরে ঘোষালমশাই বলেন, 'এ পাড়ায় বাড়ি ঘর তোর, এখানেই থাকবি চিরকাল। পাড়ার ভাল মন্দ না দেখলে চলবে কেন?'

নিমু বলে, 'পাড়ার লোক দেখে আমাকে? আড়ালে সব্বাই তো গালমন্দ করে। আমি সব জানি!'

ঘোষালমশাই জোরে জোরে ঘাড় নাড়েন, 'না, একথা ঠিক না।'

নিমু বলে, 'সেবার পুজোর আগে উৎপলদার মা'র কাছ থেকে পনেরোটা টাকা ধার করে এনেছিল মা। ক'দিন না যেতেই উৎপলদার বড়দি এসে গলার রগ্‌ ফুলিয়ে ঝগড়া করে গেল! মেয়েমানুষ, তাই কিছু বললাম না আমি—'

'সে তো হতেই পারে। পাড়ায় সকলেরই অভাবের সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। টাকা ধার দিয়ে কি ফেলে রাখার উপায় আছে বাবা! কিন্তু অন্য দিকটাও ভাব নিমু। সেবার তোর মা'র হাত পা পেট ফুলে বাহ্যিপেচ্ছাপ বন্ধ হয়ে মর মর অবস্থা হ'ল—কাজলের মা নিয়ে যায় নি হাসপাতালে? অষুদপত্তর যোগাড় করে

দেয় নি? তোর সেবার টাইফয়েড্ হ'ল—ওই উৎপলের দিদি এসে শিয়রে বসে জল ঢালে নি তোর মাথায়? সেবার ঝড়ে তোর ঘরের খড়ের চালা উড়ে গেল, পাড়ার লোক দাঁড়ায় নি গিয়ে তোর পাশে?'

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে ঘোষালমশাই একটু যেন হাঁপাতে থাকেন। নিমু চুপ করে যায়। এসব কথা একটাও তো মিথ্যে নয়! উত্তরে সে কি বলবে ভেবে পায় না। মুখেচোখে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে ওঠে। তারপরই সে বলে বসে, 'আমরা আর এ পাড়ায় থাকব না মেসোমশাই। নিশিন্দায় উঠে যাব।'

'কেন? নিশিন্দায় কেন? নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে—'

'বাড়িঘর আর নিজের নেই মেসোমশাই! বারোশ টাকায় বাঁধা আছে—'

কথাটা শুনে চমকে ওঠেন ঘোষালমশাই। সোজা হয়ে বসে চোখেমুখেকপালে উদ্বেগের ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞেস করেন, 'কি বলছিস নিমু? বাড়ি বাঁধা আছে?'

নিমু অবলীলাক্রমে, যেন ব্যাপারটার বিশেষ কোনো গুরুত্বই নেই তার কাছে, এমন ভঙ্গিতে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ। আপনি মা-কে জিজ্ঞেস করবেন।'

'কার কাছে আছে? কবে বাঁধা পড়ল?'

'ওই যে উনার কাছে—' নিমু ঘাড় ঘুরিয়ে নগেন চৌধুরীর বাড়ি দেখায়। তার চোখ জ্বল জ্বল করে। চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে।

ঘোষালমশাই বলেন, 'নগেনবাবুর কাছে? তুই বাঁধা দিয়েছিস?'

নিমু বলে, 'না।'

'তাহলে? কে দিয়েছে?'

'আমার মা। জমি-বাড়ি তো মা'র নামেই।'

'মা? ব্যাপারটা একটু খুলে বল বাবা। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আমি নিজেই বুঝি না ভাল করে! ওই নগা শালা—'

বলেই জিভ কেটে নিজেকে সামলে নেয় নিমু। ঘোষালমশাইকে

সেও সম্মান করে। বাপ মরার পর এই মানুষটা নিয়মিত যাতায়াত করতেন তাদের বাড়িতে। খোঁজ খবর রাখতেন। সাধ্যমত সাহায্যও করতেন। একবার বুঝি নিমুকে পড়ার জন্য ক'টা বইও কিনে দিয়েছিলেন। এই বুড়োমানুষটার সামনে সে মুখ খারাপ করতে চায় না। সামলে নিয়ে বলে, 'ওই নগাবাবুর কথা সত্যি হলে মা নাকি খেপে খেপে দশ বিশ করে দেড়শ টাকা ধার নিয়েছিল ওর বউয়ের কাছ থেকে। এখন সুদে বেড়ে বেড়ে সেই টাকা বারোশ হয়েছে।'

ঘোষালমশাই বিমর্ষভাবে বলেন, 'লেখাপড়া আছে কিছু? সই-পত্র, সাক্ষীসাবুদ?'

'বলে তো আছে!'

'তুই দেখিস নি?'

'দেখায় না। বলে, যা দেখার কোর্টে গিয়ে দেখবি!'

'কোর্টে! মামলা করেছে নাকি তোর নামে?'

'করে নি। দু'বছর ধরে করবে বলে শাসাচ্ছে!'

'কিন্তু...' কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে যান ঘোষালমশাই। গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করেন। নিমুর বাপের রোদে-পোড়া তামাটে মুখটা মনে পড়ে। ধানমাঠের ইট ভাঁটিতে কাজ দেখতে গিয়ে হঠাৎ মরে গেল। মৃতদেহ আনা হল বাড়িতে। ঘোষালমশাই শ্মশানে গেলেন। নিমুর মা'র কান্নায় পাড়ার আকাশবাতাস ক'দিন ভারি হয়ে থাকল। তার কিছুদিন পরেই নগেন চৌধুরীর বাড়ি উঠল পাড়ায়। নিমুর মা শোক সামলে কাজ কর্ম শুরু করেছে ততদিনে। নগেনবাবুর বাড়িতে যাতায়াত করে। গাই গরুর গোয়াল পরিষ্কার করে, মুড়ি ভাজে, খই ভাজে। নগেনের বউয়ের ফাইফরমাস খাটে। এসব জানা কথা ঘোষালমশায়ের। পাড়ার পুরনো বাসিন্দারা সকলেই জানে। একবার কানের দুটো মাকড়ি বাঁধা দিয়ে নগেনের বউয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিল নিমুর মা, সে কথাও ঘোষালমশায়ের অজানা নয়। কিন্তু কাগজেপত্রে সই করে বাড়ি বাঁধা দিল কবে—সে খবর তো তিনি জানেন না! জমিটা

অবশ্য কেনা আছে নিমুর মা'র নামেই। পঞ্চায়েতের অফিসে নিমুর মা'র নামেই বাড়ি রেকর্ড করা আছে। সে যদি কোথাও টিপসই দিয়ে কিছু করে থাকে তা হলে তা আদালতে গ্রাহ্য হতে পারে। সুদে আসলে মাত্র বারোশ টাকার অনাদায়ে ওই বাড়ি চলে যাবে নগেনের হাতে? অথচ ওইটুকু জমির দামই এখন সতেরো-আঠারোশ টাকা। ঘোষালমশায়ের মাথা কেমন ঝিম ঝিম করে। শরীর অবসন্ন বোধ হয়। যেন তাঁর নিজের বাড়ির সীমানা ধরে টান দিয়েছে নগেন চৌধুরী—এমন বিচলিত ভঙ্গিতে তিনি বলেন, 'তা যদি বারোশ টাকা হয়েই থাকে, ওই টাকা তুই যোগাড় করতে পারবি না, নিমু?'

'যোগাড় করতে করতে বারোশ বাইশশ হয়ে যাবে মেসোমশাই। ওই নগা চৌধুরীকে আপনি চেনেন না।'

'খুব চিনি। তুই একটু চেষ্টা করে দেখ। বাপের রক্তজল করা পয়সায় বাড়ি। ওই বাড়ি শেষ করতে গিয়েই তো মরল তোর বাপ—'

'চেষ্টা করেছি। বৃন্দাবন জ্যাঠাকে বলেছি। খোকনদাকে বলেছি।'

'কি বলে তারা?'

'বলে, তোর মা টিপসই দিয়ে থাকলে ছাড়ান নেই। ওটা আমাদের জামাই না কসাই! ওই চামারের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে নিশিন্দায় চলে আয়। শিবতলায় ঘর দিচ্ছি-'

'সে তো ভাড়া ঘর?'

'না, ভাড়া দিতে হবে না।'

'আজ হবে না, কাল হবে। বাবুদের মন যুগিয়ে চলতে না পারলেই হবে। এটা ভাল পরামর্শ না নিমু।'

একটা মোটাসোটা কুকুর এসে দাঁড়িয়েছে নিমুর কাছে। রংটা সাদায় কালোয় মেশানো। কানদুটো খয়েরি। কুকুরটা বেওয়ারিশ। পাড়ায় থাকে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে খায়। কিন্তু নিমুর সঙ্গে একটা আলাদা সম্পর্ক আছে। নিমুর পায়ে পায়ে প্রায়ই ঘুর ঘুর করতে

দেখা যায় ওকে। নিমু সাইকেল নিয়ে যখন শহরের দিকে যায়—কুকুরটা লেজ উঁচিয়ে দৌড়ুতে থাকে সাইকেলের পেছনে। নিমুও তাকে মুখে বিচিত্র শব্দ তুলে ডাকে। কিছু দূর গিয়ে কুকুরটা আবার দৌড়ুতে দৌড়ুতেই পাড়ায় ফিরে আসে। নিমু মাঝে মধ্যে ওর পেটেপিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। রেগে থাকলে কখনো লাথিও কষায়।

কুকুরটা কাছে আসতে নিমু ওর পিঠের উপর একটা পা তুলে দেয়। ফলে কুঁজো হয়ে ভেঙ্গে শুয়ে পড়তে পড়তে কুঁই কুঁই আওয়াজ তোলে প্রাণীটা। নিমুকে কুকুর নিয়ে ওইভাবে খেলা করতে দেখে ঘোষালমশায়ের রাগ হওয়ার পরিবর্তে অদ্ভুত একটা কষ্ট হয়। আহা, বাপ-মরা বাউণ্ডুলে ছেলে! সংসারের জ্ঞান গম্যি তো হয় নি এখনো। বাড়ি জমি কি বস্তু বোঝে না কিছু। পৈত্রিক ভিটেটুকু একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে কতবড় সর্বনাশ যে ঘটে যাবে ওদের—তা কি ও তলিয়ে ভাবে। না ভাবার মত বুদ্ধিসুদ্ধি আছে।

ঘোষালমশাই অন্তরঙ্গ গলায় বলেন, 'হুটপাট করে কিছু করিস না নিমু। আমরা পাড়ার পাঁচজনে ভেবে দেখি কি করা যায়। আগে তো এসব জানা ছিল না আমাদের।'

নিমু বলে, 'আমিই জানতাম না! সেই যে বছর দুই আগে রাতের বেলা বোমা পড়ল ওর বাড়িতে—তারপর থেকে সব খুঁচিয়ে তুলেছে। ধারদেনার কথা এদ্দিনে তো জানাজানি হ'ল!'

'তা, বোমাটা তুই ফেলেছিলি নাকি?'

'না। আমি ফেলতে যাব কেন। খোকনদারাই ধানমাঠ ভেঙ্গে এসেছিল—'

এ প্রসঙ্গে আর প্রশ্ন করা নিরাপদ মনে করেন না ঘোষালমশাই। বৃন্দাবনের ছেলে খোকন, আর নকুল সরকারের ছেলে বুধন—নিশিন্দার নাম করা খুনী গুণ্ডা হয়ে উঠেছে। ওদের নামে অনেক কথাই কানে আসে তাঁর। নিমু ওদের দলেরই ছেলে। কোন্

কথার পিঠে কি বলে বসবেন—শেষকালে তাঁর বাড়িতেও চড়াও হবে দল বেঁধে। বিশ্বাস কি ওদের।

ঘোষালমশাই বলেন, 'যা, চান করতে যা তুই। মাথা গরম করে কোনো কাজ করিস না।'

নিমু আর কথা বলে না। কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে পুকুরঘাটের দিকে চলে যায়। যতক্ষণ দেখা যায় ঘোষালমশাই তাকে দেখেন, তারপর হঠাৎ মনে পড়ে নাইট গার্ডের কথাটার কিছু ফয়সালা হ'ল না। নিমু কি রাতপাহারা দেবে না কাজলদের সঙ্গে? সে কথা বুঝিয়ে বলার জন্যই তো ডেকেছিলেন তাকে! নিমুর শরীরটা ধান-মাঠের বুকে আরো দূরে সরে গেলে ঘোষালমশাই ভাবেন, ওর মাকে ডেকে বাড়ি বাঁধার বিষয়টা সব জেনে নেবেন তিনি। তারপর পাড়ার পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখবেন, কি করা যায়। তাঁর চেনাজানা উকিল আছে শহরে একজন। দরকার বুঝলে, গোপনে নিমুর মা-কে তাঁর কাছেও নিয়ে যাবেন।

দু'দিন পরে পারুলের সঙ্গে রীতিমত একটা ঝগড়া হয়ে যায় কাজলের। সকালের দিকে নিজের ঘরে বসে কলেজের একটা বই পড়ছিল কাজল। সামনে পরীক্ষা। বইগুলো একটু দেখা দরকার। কাজলের মা'র নাইট-ডিউটি চলছে, এখনো হাসপাতাল থেকে ফিরে আসেন নি তিনি। কাজলের বোন হাতমুখ ধুয়ে রান্নাঘরে চা করার আয়োজন শুরু করেছে।

পারুল কাজলের পাশে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলে, 'একি কাজলদা? ভাল ছেলে হব আমি, পাঠে দেব মন!'

কাজল মুখ তুলে সাত-সকালে পারুলকে ঘরে দেখে অবাক হয়, হেসে বলে, 'কি ভাগ্যি! প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু—' বাকিটুকু আর গুছিয়ে বলতে পারে না। মনেও পড়ে না। পারুলের কাছে কাজল কেমন যেন মুখচোরা হয়ে যায়, আর পারুলের মুখে যেন কথার খৈ ফোটে। অথচ উল্টোরকম হওয়ারই তো কথা।

কাজল কি মনে মনে ভয় পায় পারুলকে। কিংবা সমীহ করে। খুব গোপনে তার মনের মগ্নচৈতন্যে কি কোনো হীনমন্যতা কাজ করে? কাজল ঠিক জানে না। নিজের মন নিজে তো জানা যায় না। কথা অসমাপ্ত রেখে পারুলের সতেজ সুন্দর মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে। এ ক'দিনে কি আরো একটু বড় হয়ে গেল পারুল! আরো একটু সুন্দর! সরহলুদবাটা মেখে মুখটা কি বেশি চকচকে হয়ে উঠেছে? কাজল নির্নিমেষে পারুলের মুখ দেখে, ঠোঁট দেখে, ফুলে-ওঠা বুকের ঢেউ দেখে। সকালটা ভারি সুন্দর মনে হয় তার।

পারুল বলে, 'আজ তুমি বাজারে যাবে না, কাজলদা?'

কাজল বলে, 'না। তাছাড়া আজ তো বাজার বন্ধ পারুল—'

'বন্ধ? বন্ধ কেন?'

'হরতাল। মাছের বাজার, কাঁচা বাজার সব বন্ধ।'

পারুলের মুখ শুকিয়ে যায়। বলে, 'মাংসের দোকানও বন্ধ?'

'বন্ধ থাকারই তো কথা। কাল দুপুরের দিকে বাজারে খুব হামলা হয়েছে। শহরের মস্তানরা ফূর্তি করার জন্য চাঁদা আদায়ে নেমেছিল। গাঁয়ের চাষাভূষোদের মালপত্র ধরে টানাটানি করেছে। ছুরিও বের করেছিল। সবাই মিলে ঘিরে ধরতে বোমা ফাটিয়ে সরে পড়েছে। একটা কিছুর নাম করে চাঁদা আদায়ে এসে প্রায়ই হামলা করে ওরা। পুলিশ চোখ বুজে থাকে। বাজারের ছোট-মাঝারি সব দোকানীরা মিলে আজ বাজার-বন্ধ্ ডেকেছে—'

পারুল বলে, 'তাহলে কি হবে কাজলদা!'

কাজল বলে, 'কিসের কি হবে? এত কি দরকার পড়ল তোর?'

পারুল ঝাঁঝিয়ে বলে, 'আমার আবার কি দরকার! ঘটা করে বাবা কাল রাতে মানসকে খেতে বলে এসেছে—'

কথাটা শোনামাত্র কাজল সোজা টান টান হয়ে বসে। জানালা-দিয়ে ছড়িয়ে পড়া সকালের মিষ্টি রোদ কেমন কালিবর্ণ হয়ে যায়। খুব খুঁটিয়ে পারুলের মুখ দেখে সে। কিন্তু রাগ আর বিরক্তির

ঝাঁঝালো ভাবটুকু ছাড়া আর কিছু নজরে আসে না। তবু ভেতরে ভেতরে অস্থির উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কাজল। হঠাৎ বলে বসে, 'আমি কি তোদের বাজার-সরকার? যখন হুকুম করবি বাজারে ছুটতে হবে?'

কাজলের কথা বলার ভঙ্গিতে পারুল কেমন অবাক হয়ে যায়। এমনভাবে আর তো কোনোদিন কথা বলে নি কাজল। আজ হঠাৎ এমন রেগে উঠল কেন সে। কিন্তু পারুলও কম যায় না। কারো কথা মুখ বুজে সহ্য করা অভ্যাস নয় তার। সেই কবে থেকে আঁচলে পয়সা বেঁধে হিসেব করে সংসার চালায় সে। মা বাবাকেও তার কর্তৃত্ব মেনে চলতে হয়। সংসারে পারুল 'না' বললে কোনো কাজ 'হ্যাঁ' হয় না। সে কেন কাজলের কাছে হার মানবে। বিশেষ করে সে কিনা মনে করে কাজলের উপর তার একটা একান্ত ব্যক্তিগত অধিকার সাব্যস্ত হয়ে আছে। সে যা বলবে, কাজলকে তা শুনতে হবে! পারুল গম্ভীর থম থমে মুখ করে বলে, 'তোমার এত মান-অপমান জ্ঞান হয়েছে তা তো জানতাম না কাজলদা। জানলে কিছু বলতে আসতাম না।'

কাজল মুখ কালো করে বলে, 'মান-অপমানের কথা না। আমার তো অন্য কাজকর্ম থাকে!'

পারুল বলে, 'ঠিক আছে। আর কোনোদিন কিছু বলতে আসব না তোমাকে।'

চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ায় পারুল। দরজার ও-পাশ থেকে বলে, 'বাবা বলে দিয়েছে, তুমিও দুপুরবেলায় খাবে আমাদের ওখানে।'

বলে হন হন করে চলে যায় পারুল। কাজল চুপ করে বিষণ্ণ-মুখে তার যাওয়া দেখে।

তারপর আর বই পড়তে একটুও ভাল লাগে না তার। মনটা কেমন উদাস এলোমেলো হয়ে যায়! কি করবে, কি করা উচিত ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারে না। সাইকেল নিয়ে নিশিন্দায় গেলে জেলেপাড়া ঘুরে মাছ সে যোগাড় করে দিতে পারে। তরিতরকারি

যোগাড় করাও কষ্টকর নয়। কিন্তু এখন আর কি করে যাবে কাজল।

আবার দুপুরবেলা তাকেও খেতে বলে গেল পারুল। কোন্ মুখে সে খেতে যাবে! ঘোষালমশাই শুধু তো মানসকে বলেননি, তাকেও বলেছেন। হয়ত পারুলের কথা শুনেই বলেছেন। পারুলের কথা ছাড়া ঘর-সংসারের কোনো কাজ হয় না তো ও-বাড়িতে। আর সে কিনা মনের মধ্যে একটা বিশ্রী সন্দেহ নিয়ে সাতসকালে মেয়েটাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল ঘর থেকে। নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে যেতে লাগল কাজল। ঈর্ষা বেদনা লজ্জায় মাখামাখি হয়ে তার মুখটা কালো হয়ে থাকল।

একটুপরেই সাইকেল নিয়ে বেরুলো সে। পারুলদের বাড়ির কাছে এসে দ্রুত অস্থির হাতে বেল্ বাজাতে লাগল। কিন্তু পারুল এল না। আসবে না সে জানত। তবু সাইকেল থেকে নেমে ঘরে ঢোকার সাহস পেল না কাজল। কিংবা পুরোপুরি হার স্বীকার করতে তার পৌরুষে বাঁধল! সে কিছুটা এগিয়ে এসেছে, পারুলও খানিকটা আসুক—সম্ভবত এই ইচ্ছেটুকু মনে পুষে রেখে সে মরিয়া হয়ে বেল্ বাজাতে লাগল।

পারুলের বোন এসে বলল, 'কি বলছ কাজলদা?'

কাজল মুখ গোমড়া করে বলল, 'পারুলকে ডাক।'

কালী কোনো উত্তর দিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

কাজল তাড়া দিল, 'কি হল? ডাক—'

কালী গলা নামিয়ে বলল, 'ছোড়্দি এখন আসবে না কাজলদা।'

'কেন? আসবে না কেন?'

'মার সঙ্গে ঝগড়া করে কাঁদছে।'

'কেন, ঝগড়া কেন?'

'মা মানসদাকে আজ খেতে বলে এসেছে—'

'মা বলেছে, না বাবা?'

'বাবাও ছিল সঙ্গে। কিন্তু মা-ই বলেছে। ছোড়্দিকে কিছু জিজ্ঞেস করে নি। এখন ঘরে রান্নার যোগাড় নেই—'

'ও! আচ্ছা ঝামেলা দেখছি—'

ঝগড়াঝাঁটি করে পারুল কাঁদছে শুনে হঠাৎ কেন জানি কাজল খুব খুশি হ'ল। তার মনে হ'ল, মানসকে ডেকেডুকে ঘটা করে খাওয়ানোর ব্যাপারে পারুলের কোনো হাত নেই। গোলমালটা যদি কেউ পাকিয়ে থাকে তো পারুলের মা-ই! আর তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যটাও অস্পষ্ট নয়। এখন পারুলের কাছে ধমকধামক খেয়ে তিনিও নিশ্চয়ই মুখখানা হাঁড়ির মত করে বসে আছেন! কালীকে জিজ্ঞেস করবে নাকি মাসীমার কথা?

সে হঠাৎ মনের রাগ বিদ্বেষ ঝেড়ে ফেলে উদার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'কান্নাকাটি থামাতে বল্ গে। আর বাজারের থলেটা নিয়ে আয়। আমি নিশিন্দে থেকে মাছ আলু পটল যোগাড় করে আনছি। যা, তাড়াতাড়ি যা—'

মুস্কিল-আসানের সম্ভাবনায় কালীও খুশি হয়ে ওঠে। বলে, 'তুমি একটু দাঁড়াও কাজলদা, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি!'

তারপর ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে এ-বাড়িতে মাছ ডিম তরিতরকারি সবই আসে। রান্নাবান্নার কাজও শুরু হয়। কাজল যুদ্ধজয়ী বীরের মত ঘরেউঠোনে ঘোরাঘুরি করে। কিন্তু পারুলের মুখ থমথমে। আড়ে আড়ে তাকিয়ে দেখে, কথা বলে না। কাজলও তাকিয়ে দেখে, কথা বলে না। কালী একসময় বলে, 'তুমি এবার বাড়ি গিয়ে চান করে এস কাজলদা—'

কাজল বলে, 'এখুনি চান করব?'

কালী বলে, 'হ্যাঁ, ছোড়দি বলেছে।'

পারুলকে শুনিয়ে কাজল উত্তর দেয়, 'তবে তো মহারাণীর হুকুম! যেতেই হয়।'

বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়। সূর্য পশ্চিমে পাশ ফেরে। মানসের দেখা নেই। ঘোষালমশাই বলেন, 'কি হ'ল কাজল? ছেলেটা গেল কোথায়?' তারপর স্নেহলতার দিকে তাকিয়ে রুষ্ট ভঙ্গিতে

বলেন, 'যত সব মেয়েমানুষের কাণ্ড! কি দরকার ছিল এসবের!'

স্নেহলতা বলেন, 'সবাই মিলে দুষছ কেন আমাকে? কি এমন অন্যায়টা করেছি আমি? কতদিন পরে পাড়ায় এল ওরা। আগে কত আসত, যেত, জুলুম করে বোয়েম থেকে নাড়ু তক্তিআচার বের করে খেয়ে নিত—'

'আহা, সে সব পুরনো কাঁসুন্দি। এখন ঘেঁটে লাভ কি!'

স্নেহলতা ফোঁস করে ওঠেন, 'লাভ লোকসান তুমি কি বুঝবে! একবেলা একটা ছেলে দুটো ভাত খেয়ে গেলে কি এমন ক্ষতি হয় সংসারের যে সবাই মিলে আমাকে খুঁড়ছ! আমি যা করি সংসারের ভালর জন্যই করি!'

পারুল এসে ধমক দেয় স্নেহলতাকে, 'তুমি চুপ কর দেখি মা! বাবা, তুমি খেতে চল। একটা বাজে—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'কি করে যাই…'

কাজল বলে, 'আপনি খেতে যান মেসোমশাই। আমি মানসকে ধরে আনছি—'

কথা ক'টা বলে পারুলের মুখের দিকে একবার তীব্র দৃষ্টি ফেলে উঠে দাঁড়ায় কাজল। কিন্তু পারুলের মুখ এখন গম্ভীর, বড় বেশি গম্ভীর। মুখ দেখে কিছুই আঁচ করতে পারে না সে। মেয়েদের মুখ দেখে মনের কথা কে কবে আঁচ করতে পেরেছে! বিশেষ করে সে যদি চপলা চঞ্চলা সদ্য-যৌবনা হয়!

মানসদের বাড়িতে ঢুকে থমকে যায় কাজল। নিশিন্দা থেকে শরৎমাস্টার এসেছেন। ধুলোবালিতে মলিন পুরনো সাইকেলখানা বারান্দায় তোলা আছে। সীটের সামনের দিকের চামড়া ফেটে গেছে বলে গোল ঘন করে মিহি তার জড়ানো। ওই তার-জড়ানো সাইকেল দেখেই কাজল বুঝতে পারে শরৎমাস্টার এসেছেন।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই শরৎমাস্টারের গলা পায় কাজল, 'কে?'

কাজল বলে, 'আমি শরৎদা।'

'এ ঘরে আয়।'

ঘরে আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই। মেঝের উপর একটা বিছানা পাতা। মানসের মা একপাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। অন্যপাশে শরৎমাস্টার। দু'জনের মুখই থমথমে, দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত। মনে হয় মানসের মা একটু আগেই কান্নাকাটি করেছেন। চোখের পাতা এখনো ভারি ও ভেজা। কাজল ঘরে ঢুকে এরকম অস্বস্তিকর অবস্থার মুখোমুখি হয়ে থমকে যায়। বলে, 'মানসের খোঁজে এসেছিলাম, শরৎদা।'

শরৎমাস্টার বলেন, 'ও পাশটায় বো'স, কাজল।'

কাজল নিঃশব্দে বিছানার একপাশে বসলে শরৎমাস্টার বলেন, 'মানস কাল রাত্রি থেকে ঘরে ফেরে নি।'

কাজল একটু চমকে উঠে বলে, 'সে কি? কোথায় গেছে?'

'আমাদের জানা নেই।'

'জানা নেই? খোঁজ করেন নি ওর?'

'কোথায় খুঁজব?' শরৎমাস্টার ম্লান বিষণ্ণভাবে হাসেন, 'আর খোঁজ করেও কিছু লাভ হবে মনে হয় না।'

'এ কি রকম কথা, শরৎদা!'

'হ্যাঁ, ভাই। আমি তো ওকে চিনি—'

রোদেপোড়া তামাটেবর্ণ, শীর্ণশরীর, কিন্তু পাকা বাঁশের লাঠির মত শক্ত চেহারা শরৎমাস্টারের। হাসি গুটিয়ে মুখখানা কঠিন করে তিনি চুপ করে থাকেন। মানসের মা বসে থাকেন নিঃশব্দে। তাঁর চোখ বেয়ে জলের ধারা নামতে থাকে। স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে না পেরে কাজলের মনটা অস্থির ছটফটে হয়ে ওঠে। বাইরের আকাশে রৌদ্রতেজ আগুনের হল্কা ছড়ায়। গরম বাতাস ছুটে এসে গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। পাশের বাড়ির সজনে গাছের ডালে একটা ঘুঘু পাখি ক্লান্ত সুরে ডাকাডাকি করে। মানসের অদৃশ্য হওয়ার সংবাদে এই মুহূর্তে কাজলের মনে আশ্চর্য এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। দুঃখ দুশ্চিন্তা বিষণ্ণতার সঙ্গে অদ্ভুত পিচ্ছিল সুখকর একটা অনুভূতি। মানস নিখোঁজ! দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, এখনো তার খোঁজ নেই। স্নেহলতা

অপেক্ষা করে আছেন তার জন্য। পরিপাটি রান্না করে পারুলও অপেক্ষা করে আছে মানসের জন্য। কিন্তু মানস যাবে না। স্নেহলতার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হবে। পারুলের পরিশ্রম বৃথা যাবে। ওদের ব্যর্থতার মধ্যেই একধরণের তৃপ্তি যেন খুঁজে পায় কাজল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসের মা'র চোখের জলের ধারা দেখে আবেগে তার বুকটা দুলে ওঠে। আশঙ্কায় ও বেদনায় তার চোখমুখও ম্লান হয়ে আসে। মানস কোথায় গেছে, কেনই বা গেছে এখনো সে জানে না। তবু শরৎ-মাস্টারের পোড়-খাওয়া তামাটে মুখের কঠিন ভঙ্গি আর কঠিনতর শব্দগুলি তার মনে অসম্ভব এক ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে। সবমিলিয়ে তার চেতনার জগত বিপর্যস্ত হয়ে যেতে থাকে। সে একরকম চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'মানসের কি হয়েছে খুলে বলুন শরৎদা! আমার মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে—'

শরৎমাস্টার ধীর শান্ত গলায় বলেন, 'অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন কাজল? ক্রমে সবই জানতে পারবে।'

'মানস কি আর ফিরবে না?'

'ফিরতে পারে। না-ও পারে। আসল ব্যাপার কি জান কাজল, মানস নকশালবাড়ি-রাজনীতির পথ নিয়েছে। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলছে। কলকাতায় থাকলে এতদিনে হয়ত ধরা পড়ত, তাই এখানে চলে এসেছিল। কাল রাত্রি থেকে কোথায় নিখোঁজ হয়েছে—'

কাজলের চকিতে মনে পড়ে সেদিনের কথা। মানসের ঘরে গোল হয়ে বসে কারা যেন চাপাগলায় কথাবার্তা বলছিল। কাজলের গলা শুনে বাতি নিবিয়ে দিয়েছিল। তাদের ঘরে রেখে মানস ছটফটে ভঙ্গিতে বাইরে চলে এল। তারা কারা? কারা এসেছিল মানসের ঘরে! কোত্থেকে এসেছিল? তারাও কি কলকাতা থেকে পালিয়ে-আসা মানসের সহপাঠী বন্ধুর দল? নকশালবাড়ি-রাজনীতির শরিক? কিছু গোপন না করে সব কথা সে খুলে বলতে চায় শরৎমাস্টারকে। এই মুহূর্তে মানসের জন্য অসম্ভব দুশ্চিন্তা হয়

তার। যেন তারই কোনো অন্তরঙ্গ পরিজন ঝোঁকের মাথায় বড় রকম একটা সর্বনাশের মুখে গিয়ে পড়েছে, কাজল যেন প্রাণপণ শক্তি দিয়ে তাকে উদ্ধার করতে চায়, এমন ত্রস্ত ব্যাকুল ভঙ্গিতে বলে, 'সেদিন রাত্রে আমি অতটা বুঝতে পারি নি শরৎদা, কিন্তু আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল—'

শরৎমাস্টার কাজলকে বাধা দিয়ে বলেন, 'আমি ওর মা'র কাছে সব শুনেছি কাজল। কিন্তু এ বিষয়ে তুমি আর কারো কাছে কোনোদিন মুখ খুলবে না—'

কাজল বলে, 'আমি কাওকে কিছু বলি নি শরৎদা।'

'বলবে না। মানসের কথা তেমন ভাবি না। ওর মা'র বিপদ হবে। কাগজে দেখছ তো কলকাতা-চব্বিশপরগণায় মিলিটারি নেমে পড়েছে। নকশাল সন্দেহ হলেই তুলে নিয়ে যাচ্ছে। গুলি করে মেরেও ফেলছে অনেককে। এ জেলাতেও কি হয় বলা যায় না। দু'দিন আগেও বোলপুরের কাছে একজন জোতদার খুন হয়েছে—'

কাজল আর কথা বলে না। চোখ বড় করে শরৎমাস্টারের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে মানসের মা'র মুখ দেখে। তাঁর দু'গাল বেয়ে এখনো অবিরল ধারায় জল ঝরে চলেছে। কিন্তু সমস্ত শরীর নিষ্কম্প, পাথরের প্রতিমার মত শক্ত, স্থির। শুধু বাইরের বাতাসে তাঁর কয়েকগাছা কাঁচাপাকা চুল অবাধ্য ভাবে কপালের উপর উড়ে উড়ে পড়ছে।

কাজলের মনে পড়ে বোলপুরের ছাত্রসম্মেলনের কথা। একদল ছাত্র শ্লোগান দিয়ে বলেছিল, সংশোধনবাদী রাজনীতি ধ্বংস হোক্! সত্যকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোল! এই বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থায় যে যত পড়ে সে তত মূর্খ হয়! প্রতিক্রিয়ার দুর্গ স্কুলকলেজ পুড়িয়ে ফেল! শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল-প্রতিরোধ গড়ে তোল!

এখন এই শহরের বুকেও ওই ধরনের কিছু দেয়াল-লিখন দেখা

যাচ্ছে। শহরগঞ্জের হাটতলায়, সিনেমাহলে, মেলার ভিড়ে কারা যেন হঠাৎ এসে ছাপানো হ্যাণ্ডবিল বিলি করে চলে যাচ্ছে। তাতে গেরিলা কৃষক-বাহিনীর পাশে অবস্থান গ্রহণের অনুরোধ আর তাদের সাধ্যমত সাহায্য করার আবেদন জানানো হচ্ছে।

কাজল বুঝতে পারছে, এই জেলার লালমাটির বুকে নদীপাহাড়-অরণ্যের কোলে এক নতুন রক্তাক্ত রাজনীতির ঝড় উঠতে আর দেরি নেই। মানসের অতর্কিত আত্মগোপন, শরৎমাস্টারের রেখাকুঞ্চিত কঠিন মুখ আর মানসের প্রৌঢ়জননীর অবিরল অশ্রুজলধারায় তার অনিবার্য ইঙ্গিত ঝলসে উঠছে। কাজল এখনো তার রূপ স্পষ্ট জানে না, কিন্তু তার বুকের মধ্যে যেন গুড়্ গুড়্ করে মেঘ ডাকতে থাকে।

একটু পরে উঠে আসে সে। পারুলদের বাড়ি যায় না। মানসকে না নিয়ে ও-বাড়িতে নিজে খেতে যাওয়ার মধ্যে যে লজ্জা ও গ্লানি আছে তা তাকে পীড়িত করে। এইসময় সহসা কেন জানি, পারুলের মুখটা মনে করে অসম্ভব কষ্ট হয় তার। সে দ্রুতপায়ে নিজের ঘরে এসে নিঃশব্দে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে। কিন্তু পারুল যদি ডাকতে আসে তাহলে সে তৎক্ষণাৎ ও-বাড়িতে খেতে যাবে এরকম একটা ইচ্ছাও মনের মধ্যে পুষে রাখে। অভাবের সংসারে ঝগড়াঝাটি করে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যে মেয়েটা উনুনের আঁচে দগ্ধ হয়ে নানারকম রান্না করেছে—তার সমস্ত আয়োজন পরিপূর্ণ ব্যর্থ করে দেবার মত নিষ্ঠুর কাজল কখনো হতে পারে না। কিন্তু পারুল অন্তত একবার আসুক তার খোঁজে।

মানস নিখোঁজ হওয়ার পর এ পাড়ার নিস্তরঙ্গ জীবনে অনেক-দিন আর তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটে না। ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন আপন আপন সংসারের বৃত্তে ছোটখাটো মান অভিমান, দুঃখসুখের তরঙ্গ তুলে মন্থর গতিতে পাক খায়। কখনো জমির সীমানা নিয়ে জটিলের সঙ্গে উৎপলের ঝগড়া হয়, ক'দিন কথা বলা মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকে, আবার ভাবও হয়ে যায় মাস

পার না হতেই। কখনো সদানন্দের পিসী রাতদুপুরে চিৎকার করে পাড়ার লোক জড়ো করে, সদানন্দের বউ লজ্জায় ঘৃণায় রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যায়, সদানন্দ পিসীকে বাইরে রেখে ঘরে তালা ঝুলিয়ে সাধ্যসাধনা করে বউ আনতে ছোটে, দু'চারদিন পিসী এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে অন্ন সংগ্রহ করে, তারপর সদানন্দ ফিরে এলে গলায় আঁচল জড়িয়ে বউয়ের পায়ে মাথা ঠুকে বলে, জীবন থাকতে ঝগড়াঝাটি আর সে করবে না, বউয়ের সব কথা সে শুনবে, শুনবে, শুনবে! ফলে ক'দিন ঘরে শান্তিরক্ষা হয়, তারপরই পিসী আবার নিজমূর্তি ধারণ করে!

আশ্বিনের শুরুতে বৃষ্টি নামে। ঝড়ও হয়। নিমুদের খড়ের চালার একদিক ঝড়ে উল্টে যায়। নিমু ঘরামি ডেকে ঘর ঠিক করে কিন্তু মজুরি দেবার বেলায় এমন গোলমাল পাকিয়ে তোলে যে ঘোষালমশায়কে ছুটে গিয়ে মধ্যস্থ হয়ে তিনজন ঘরামিকে শান্ত করে গাঁয়ে ফেরৎ পাঠাতে হয়! তারা নিশিন্দার বাগ্দীপাড়ার মুনিষ। নিমুর চোটপাটের উত্তরে কাস্তে বা হেঁসো নিয়ে রুখে দাঁড়াতে ভয় পায় না। ন্যায্য মজুরি দু'দিন পরে হলেও ষোলোআনা আদায়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তবে ঘরে ফেরে। ঘোষালমশাই তার জন্য জামিন থাকেন।

আশ্বিনে যথারীতি পাড়ায় দুর্গাপূজাও হয়। কিন্তু এবার নাম-মাত্র পূজা। বাজারে জিনিষ অগ্নিমূল্য, তার উপর পয়সা দিয়েও সব যোগাড় করা যায় না। চিনি নেই, কেরোসিন নেই, কয়লা নেই, ময়দা সুজি নেই। চাঁদাও ওঠে কম। নিমু চাঁদা তোলে না। বাড়ি নিয়ে নগেনের সঙ্গে তার নিত্য অশান্তি চলছে। মন মেজাজ ভাল নেই। পুজোর ক'দিন সে পাড়ার বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। তারপর নিশিন্দায় কালিপুজোর ঢাক বেজে উঠলে সেখানে পড়ে থাকে।

ডাঙ্গাপল্লীর প্রান্তবর্তী ধানমাঠে ধানের চারা বড় হয়ে ফসল পেকে ওঠে। কিন্তু খরার প্রকোপে এবার ফলন তেমন ভাল নয়।

মাঝে মাঝে অনেক গাছ শুকিয়ে খড় হয়ে উঠেছে—তাতে ধান বলতে নেই। ও-জমি নকুল সরকারের। আর ক'দিন পরেই ধান কাটার মরসুম শুরু হবে। মালিকেরা মাঠের দিকে নজর রাখছে, ভাগ-চাষীরাও। এখন সকালসন্ধ্যা মাঠের বুকে বহু লোকের আনাগোনা। দু'পক্ষই সতর্ক সন্দিগ্ধ—কেননা খরাক্লিষ্ট জেলার বুকে এক গুচ্ছ ধানের দাম এখন অনেক।

ডাঙ্গাপল্লীর বুকে রাত পাহারার কাজ চলছে। জলঝড়বৃষ্টি হলে কোনোদিন বন্ধ থাকে, কোনোদিন লোকের অভাবে। তবু সপ্তাহে চার পাঁচ দিন নিয়মিত পাহারা চলে। পাড়ায় চোর আসাও এখন বন্ধ হয়েছে। মানুষ ঘুমায় নিশ্চিন্তে। গোয়ালঘরের দরজায় আর তালা না লাগালেও চলে। গরু ছাগল হাঁসমুরগী উঠোনে পড়ে থাকে। রাতের বেলা কুয়োর দড়িবালতি ঘরে টানাটানি করার দরকার হয় না! রাতের দিকে ঘোষালমশায়ের ঘুম ভেঙ্গে গেলে দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কে জাগে আজ? কার ডিউটি?' সাড়া পেলে বলেন, 'গরম চাদর নিয়েছ তো একখানা করে? ভোরের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে কিন্তু!'

ওই রাতজাগার দলকে ঘিরেই একএকদিন এক-একরকম কাণ্ড হয়। গুরুতর কিছু নয়। ছোটোখাটো ব্যাপার।

অঞ্চলের চৌকিদার একদিন সাড়া না দিয়ে পাড়ায় ঢুকে পড়লে জটিল দাস দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে তাড়া করে তাকে। মোটর-মেকানিক নরেন গোঁসাই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। চৌকিদারের হাত থেকে লাঠি, মাথা থেকে পাগ্ড়ী খসে পড়ে। সে হাউ মাউ করে চেঁচায়, 'আমি বটি গো বাবু, আমি গাঁয়ের চৌকিদার বটি, ভগবান দাস—'

জটিলেরা তাকে ঘিরে ধরে, 'চৌকিদার বটে তো সাড়া না দিয়ে ঢুকলে কেন পাড়ায়?'

ভগবান বলে, 'আজ্ঞে, হাঁকতে হাঁকতে তো এলুম! ই-পাড়ায় ঢোকার পরে চোখদুটো কেমন বুঁজে এল!'

'বুঁজে এল ! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ হাঁটছিলে ?'

'আজ্ঞে, সি বলতে পারেন ! কথা-ট মিথ্যে লয় !'

ভগবানের কথা শুনে জটিলেরা হেসে ওঠে। ভগবান লজ্জা পায়। ঘুম-জড়ানো গলায় বলে, 'আজ্ঞে কি করি বলুন মশয়রা, মানুষের শরীল বটে তো। খিদে তেষ্টা আছে, কেলাস্তি আছে, ঘুমের কি দোষ……'

জটিল বলে, 'দিনের বেলায় ঘুমিয়ে নিতে পার না ?'

ভগবান বলে, 'সোময় কই ? রেতে পাহারার কাজে তেত্তিশটাকা বেতন পাই। ই-তে আমার লিজের পেটই চলে না। দিনভর মুনিষ খাটতে হয় আজ্ঞে। শুই কখন—'

জটিল ওর মুখের কাছে মুখ এনে নাক টানতে টানতে বলে, 'পচুই গিলে এসেছ। ঘুম তো পাবেই। তোমার পা টলছে ভগবান, ভগবানের নাম নিয়ে কোথাও শুয়ে পড় বাবা—'

ভগবান অবলীলায় জানায়, 'ইবারে শোব ! ওই বুড়োকর্তার শান বাঁধানো বারান্দায় গিয়ে শোব। ওদিক পানেই তো হাঁটছিলম আজ্ঞে—'

আর একদিন ভোররাতের দিকে কথাবার্তা নেই দ্বিজপদ ঘোষের গোয়ালঘরের চালা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে, মাটির দেওয়ালের একদিক ধ্বসে যায়। দ্বিজর বউ পাড়া কাঁপিয়ে কেঁদে উঠে, 'কে কোথায় আছ গো, ছুটে এস গো—'

সেদিন ডিউটি ছিল শিশির-উৎপলদের। চোর ঢুকেছে ভেবে তারা বর্শা উঁচিয়ে ছুটে যায়। বাড়ির ভিতর ঢুকে শোনে ভাঙ্গা চালার তলায় একটা বাছুর চাপা পড়েছে। আধ বুড়ো দ্বিজ ভাঙ্গা বাঁশ খড় সরাতে সরাতে চিৎকার করে, 'হেই দাদারা, বাছুর-ট বার করে আন আগে, আমার বাছুর-ট মরে গেল গো—'

উৎপল বাঁশ দিয়ে চালাটা উঁচু করে তুলে ধরতে ধরতে বলে, 'মরুক ! একটা-দুটো গাইবাছুর মরা দরকার তোমার। রাত জেগে চা খাব বলে একটু দুধ চাই আমরা, বিনিপয়সায় দাও কখনো ?'

দ্বিজু বলে, 'দুধ। ইবার থেকে একবাটি কেনে দু'বাটি দুধ ; বাছুর-ট ধরাধরি করে আন দাদারা—'

একদিন নগেনবাবুর একতলার কোণার ঘর থেকে মেয়েলি গলার অস্পষ্ট কান্নার শব্দ শোনা যায়। নিঝুম রাতের অন্ধকারে কান্নার সুরটা কখনো উঁচু পর্দায়, কখনো-বা নীচু পর্দায় গোঙানির মত বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিনও ডিউটি ছিল জটিলদের। নগেন-বাবুর চাকর বনমালীও আছে সঙ্গে। নগেনবাবুর বদ্‌লি সে। বাবু যেদিন হুকুম দেন ডিউটি দিতে বেরোয়, যেদিন দেন না, বেরোতে পারে না। বনমালী নিশিন্দার সদ্‌গোপপাড়ার লোক। অভাবের টানে চাকর খাটতে এসেছে। নগেন চৌধুরীদের প্রতি খুব একটা প্রসন্ন নয় সে। কেন না নগেন তাকে যে-পরিমাণে খাটান সে পরিমাণে বেতন দেন না। এমন কি দু'বেলা পেটপুরে আহারও না।

সেই বনমালীই কান পেতে কান্নাটা শুনতে পায়। তারপর ফিসফিস করে জটিলকে বলে, 'কাণ্ড দেখবেন ? আমার সঙ্গে আসুন !'

দু'জন করে দু'ভাগ হয়ে টহল দিচ্ছিল জটিলেরা। বনমালীর ইশারায় জটিল নিঃশব্দে হেঁটে নগেনবাবুর বাড়ির কাছে একেবারে জানালার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। ভয়ে তার বুকটা ধুকপুক করে। যদি নগেন টের পায় ! কিন্তু কৌতূহলও চাপা যায় না। বিশেষত বনমালীর ইসারা-ইঙ্গিতে সেটা আরো বেড়ে ওঠে। জটিল একরকম দমবন্ধ করে কান পাতে। বাইরের দিকের জানালা বন্ধ। ভেতরে অন্ধকার। কিছু দেখার বা বোঝার উপায় নেই। শুধু চাপাগলায় কিছু কথাবার্তা শোনা যায়। একটি মেয়েমানুষের গলা কান্নায় বিকৃত ভঙ্গিতে বলে, 'তুমি যাও ! যাও বলছি !' নগেনবাবুর কণ্ঠ, 'না ! যাব কেন ! যাব বলে কি রাতদুপুরে তোমার ঘরে এসেছি !'

'আমার ভাল লাগে না। অসহ্য ! আমাকে তুমি মুক্তি দাও !'

'মুক্তি দিলে যাবে কোথায় ? যাওয়ার জায়গা কই ?

'আমার যেখানে খুশি যাব !'

'চুপ কর ! ওসব ন্যাকা কথা ভাল লাগে না !'

'তুমি মদ খেয়ে এসেছ! মাতাল! তোমার জুলুম আমি আর সইতে পারি না! আমি কি বেশ্যা!'

'ফের গলাবাজি! শ্বশুরবাড়িতে না খেয়ে মরছিলে। ঘরে এনে রাণীর মত রেখেছি! যখন যা চাও এনে দিই। খরপোষ দিই, গয়না দিই। ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে বলেছ, মাসে মাসে রেখে যাচ্ছি! আমি যা বলব শুনতে হবে।'

'না শুনব না! আজ তুমি যাও—'

'না!'

বলেই নগেন যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। ঘরের মধ্যে একটা ছুটোপাটির শব্দ শোনা যায়। তার কিছুক্ষণ পরে কান্নার শব্দ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জটিল আরো ভয় পেয়ে যায়। অন্ধকারে বনমালীর চোখমুখ চকচক করে। জটিলের হাত টিপে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসে সে। জটিল বলে, 'ব্যাপার কি বল ত বনমালী?'

বনমালী দাঁত বের করে হাসে, 'বাবুর বউটা তো খুঁতো! বাবু তাই রেতে রেতে বেধবা শালীর ঘরে মজা লুটতে নামেন।'

জটিল বলে, 'বউ কিছু বলে না?'

বনমালী উত্তর দেয়, 'বলবে না কেন? ফিহপ্তা ঝগড়া হয়। বাবু একদিন রাগ করে বৌরাণীর চুল উঠোনে ছুঁড়ে ফেলেছিল। আমি সকালে কুড়িয়ে উপরে দিয়ে এলাম।'

তারপর একটু থেমে দুঃখের গলায় বলে ওঠে, 'পয়সা থাকলে কি হয়, বাবুর ঘরে সুখ নেই!'

জটিল একটু ভেবে বিজ্ঞের মত উত্তর দেয়, 'অধর্মের পয়সায় সুখ হয় না রে বনমালী!' বলেই সামলে নেয় নিজেকে। কথা ঘুরিয়ে বলে, 'নগেনবাবুর কথা বলি নি কিন্তু। আমি, এই ধর্, বিশ্বসংসারের সকলের কথাই বললাম!'

বনমালী বলে, 'সে তো বটেই গো!'

এমনি করে দিনরাত পার হয়ে ফসল কাটার মরসুম এসে যায়। পাড়ার রাতজাগার দলের বয়স তখন তিনমাস পার হয়েছে। মানসের মা কলকাতা চলে গেছেন। মানসের খোঁজ নেই। অল্প অল্প শীত পড়তে শুরু করেছে। রাত বড় হয়ে দিন ছোট হচ্ছে। ডিউটি দেবার সময় চাদর লাগে, ভোররাতে সোয়েটার-মাফ্লারও ব্যবহার করতে হয়। এখন নিমু মাঝে মাঝে ডিউটি দিতে আসে। সবদিন না, যেদিন সে পাড়ায় থাকে এবং তার মনমেজাজ ভাল থাকে। নগেনের সঙ্গে বাড়ির ব্যাপারটা নিয়ে তার গোলমাল আরো পাকিয়ে উঠেছে। বকেয়া টাকা সুদেআসলে উসুলের জন্য নগেন মামলা করবে বলে শাসিয়েছেন। দিন তিনেক আগে নিমুকে ডেকে শেষকথা বলে দিয়েছেন তিনি। হয় টাকা দাও, না-হয় বাড়ি ছাড়। সোজা পথে না হলে দু'চারদিনের মধ্যেই নাকি উকীলের চিঠি পাবে নিমু। এই নিয়ে নিমুর সঙ্গে নগেনের কথা কাটাকাটিও হয়েছে। নিমু রাগ করে বলে এসেছে, বাড়ি সে ছাড়বে না, টাকাও দেবে না, নগেন যা পারবে করুক।

নিমু যত মূর্খই হোক, বাপের তৈরি বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে গেলে নিশিন্দায় গিয়ে খোকনদের একটা পরিত্যক্ত মাটির ঘরে তাদের যে ভিখিরীর মত থাকতে হবে এটুকু সে বোঝে। এই অবস্থায় বাড়িটা রক্ষা করার কথা সে ভাবতে শুরু করেছে। বৃন্দাবন সরকার, খোকন সরকারদের বলেছে সব কথা। তারা নগেনকে চামার ও কসাই বলে গালাগাল দিয়েছে বটে কিন্তু নিমুর মা'র দেনা মিটিয়ে বাড়ি উদ্ধারের কোনো পথ দেখায় নি। বরং নিমুকে নিশিন্দায় উঠিয়ে নিতেই তাদের বেশি আগ্রহ। তার কারণটা নিমুর অজানা নয়। তাকে তাহলে তারা হাতের মুঠোয় পুরতে পারে। কিন্তু নিমু তা চায় না। খোকনদের স্বার্থ আর তার স্বার্থ যে এক নয়—এটাও সে বোঝে। তার প্রতি ওদের কোনো দরদ নেই, যদি থাকত কিছু টাকা কি দিতে পারত না ওরা? এই অবস্থায় নিমু পাড়ার লোকজনের সঙ্গে একটু

মিশতে চায়। নগেন যদি মামলা মোকদ্দমা করে, নিমুর পক্ষে দু’ একজন সাক্ষী তো চাই—যারা অন্তত বলবে, বাড়িটা নগেনের টাকায় ওঠে নি, তার বাপ রোদেজলে দাঁড়িয়ে নিজের অর্থ নিজের পরিশ্রম দিয়ে বানিয়েছে। নকুলের কাছ থেকে কয়েকহাজার ইট কি কিছু বাঁশখড় নিয়েছিল হয়ত—কিন্তু তার দাম তো ইটভাঁটিতে দাঁড়িয়ে গায়ে-গতরে খেটে সে শোধ করে গেছে। পাড়ার লোক তো সব জানে। বিশেষ করে ঘোষালমশায়ের তো কিছুই অজানা নেই। মানুষটা সৎ, সাহসীও। নগেনের বিরুদ্ধে দরকার হলে কোর্টেও দাঁড়াতে পারেন তিনি। নিমুকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করেন। বুড়ো-মানুষটা কয়েকবারই ডেকে ডিউটি দেবার কথা বলেছেন নিমুকে। সবদিক বিবেচনা করে নিমু এখন মাঝেমধ্যে রাত জাগতে বের হয়।

সেদিন একটু বেশি ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। খেয়ে দেয়ে বিছানা বালিশের খোঁজ করছিল নিমু। ওর দিদি এসে বলে, ‘আজ তোর ডিউটি আছে না? সকালে কাজল বলে গেছে।’

‘বলুক। আমার শরীর ভাল নেই।’

চাদর ঢাকা দিয়ে সে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না। এই বুঝি কাজলেরা ডাকতে এল ভেবে মনটা ছটফটে হয়ে থাকে। একটু পরেই উঠে পড়ে সে। দিদিকে ডেকে বলে, ‘দরজা দে, আমি বেরুচ্ছি।’

নিমুর দিদি বলে, ‘এত রাতে তুই নিশিন্দায় চললি নাকি?’ নিমু খিঁচিয়ে ওঠে, ‘কে বলল নিশিন্দায় যাচ্ছি। তুই ঘুমোগে যা।’

হাত তিনেক লম্বা একটা লোহার রড্ হাতে নিয়ে নিমু বাইরে চলে আসে। অন্ধকারে নিঃশব্দে হেঁটে এসে দাঁড়ায় কাজলের ঘরের কাছে। কাজল বেরিয়ে এসে টর্চ মেরে বলে, ‘বাপ্‌রে! রড্‌টা কোথায় পেলি?’

নিমু বলে, ‘নগা শালার ঘর থেকে তুলে এনেছি।’

‘বলে? না না-বলে?’

‘বলাবলির কি আছে! গুচ্ছের লোহা ডাঁই হয়ে পড়েছিল

বাইরে। আমি তিনচারটে তুলে নিয়েছি। ও-শালারও তো রেল-গুদাম ঝাড়াই মাল। চাই তোর একটা?'

'না। আমার ঘরে বর্শা আছে ছুটো।'

কথা বলতে বলতে সরোজের বাড়ির দিকে এগোয় ওরা। কাজল খুশির গলায় বলে, 'ও সরোজদা, নিমু আজ ডিউটি দিতে এসেছে!'

সেই রাত্রেই একটা কাণ্ড হয়।

রাত তখন তিনটে সাড়েতিনটে। পাড়াটা একপাক ঘুরে এসে সদানন্দের বাড়ির সামনে নিমগাছতলায় চুপ করে দাঁড়িয়েছে সবাই। মাঝে মাঝে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে এমন নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা। যেন চোর ধরার জন্য ওৎ পেতে থাকা।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে এমনসময় পাড়ার ছুটো কুকুর ডেকে উঠল। সরোজ সচকিত হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার? কুকুর ডাকে কেন?'

কাজল বলে, 'নিশ্চয়ই গন্ধ পেয়েছে কিছুর!'

নিমু বলে, 'ধু-ৎ, কিছু না। ও-শালারা এমনি ডাকে। ঘুরে ঘুরে পা ধরে গেল! আমি শালা ঘর চললাম—'

কাজল বলে, 'না নিমু, ওই যে কিসের আলো দেখা যাচ্ছে—'

সবাই তাকায় রাস্তার দিকে। নিশিন্দা থেকে শহরের দিকে গেছে রাস্তাটা। কাঁচা লাল কাঁকরের অসমান রাস্তা। তারই বুকে অল্প দূরে আলোটা দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। কাজল বলল, 'টর্চ নিয়ে আসছে কেউ।'

সরোজ কান পেতে বলল, 'গরুর গাড়ি আসছে, ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

শশাঙ্কমাস্টার অবাক হয়ে বলল, 'রাতের বেলা গরুর গাড়ি আসে কেন নিশিন্দা থেকে? গাড়ির তলায় লণ্ঠন ঝুলছে না কেন? কি মতলব?'

এতক্ষণে নিমুর জ্ঞান হয়, 'ঠিকই তো! এত রাতে আলো ছাড়া গাড়ি কেন! চল, শালাকে পাকড়াই!'

ওরা চারজন দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দে রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। একটু আগেও ঠাণ্ডা বাতাসে শীত করছিল—এখন আর সে কথা মনেও থাকে না। বেরোবার সময় যথারীতি শশাঙ্কর বউ একটা মোটা গরম চাদর দিয়েছিল তাকে। সেটা খুলে আজ গায়েও দিয়েছিল সে। এখন কি মনে করে কোমরের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। সরোজ পকেট থেকে গুলি বের করে বন্দুকে ভরে। কিছু একটা মারামারি ধরপাকড়ের উত্তেজনায় নিমুর চোখ জ্বল জ্বল করে।

রাস্তায় গরুর গাড়ির পেছনে টর্চের আলোটা জ্বলে আর নেভে। বট পাকুড় নিমের ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার ধুলোর রাস্তায় শব্দ তুলে গাড়ি ক্রমশ এগিয়ে আসে। সরোজেরা একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পাড়ার কুকুরদুটো ছুটে এসে চিৎকার করতে থাকে। একটা নিমুর পায়ের কাছে এসে ঘুর ঘুর করে।

পাড়ার সীমানায় গাড়ি ঢুকতেই কাজল টর্চ ফেলে জিজ্ঞেস করে, 'কে? কে যায় এত রাতে?'

টর্চের আলোয় এবার মনে হয় গাড়ি একটা নয়, দুটো। আষ্টে-পৃষ্ঠে বস্তা বোঝাই করা। বোঝার ভারে গরুগুলো বেঁকে দুমড়ে গেছে। গাড়োয়ানদুটো হেঁটে আসছে। গাড়ির পেছনে চোঙা প্যাণ্ট, খয়েরি শার্ট পরা একজন কেউ যেন আস্তে সাইকেল চালিয়ে আসছে। তার হাতেই একখানা টর্চ।

চোখে আলো পড়ায় সামনের গাড়ির গরুদুটো দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখাদেখি পেছনের গাড়িটাও। বন্দুক, বর্শা, লোহার রড্ হাতে চারজন উত্তেজিত মানুষকে সামনে দেখে গাড়োয়ানদুটো চমকে ওঠে। সঙ্গের লোকটা সাইকেল থেকে নেমে পড়ে বেশ কড়া ধমকের গলায় বলে ওঠে, 'কি হ'ল? কে আপনারা? টর্চ মারছেন কেন?'

সরোজ বলে, 'ভয় পাবেন না। আমরা পাড়ার নাইট গার্ড! আপনি কে? কি নিয়ে যাচ্ছেন গাড়িতে?'

লোকটা খেঁকিয়ে ওঠে, 'নাইট গার্ড! হুঁ, শুনেছি আপনাদের

কথা! রাত জেগে চোর ধরছেন! তা পাড়া ছেড়ে রাস্তায় কেন? যান—পাড়ার ভেতর যান!'

সরোজের হাতে এখন গুলিভরা বন্দুক। দলের নেতা সে। লোকটার কর্কশ গলা আর নবাবী মেজাজ দেখে তার রক্তও গরম হয়ে ওঠে। হাতে বন্দুক থাকলে বিশ্ব-সংসারে কাকে সে ভয় পায়। পাল্টা ধমক দিয়ে বলে, 'খুব সাহস দেখছি! কোথাকার লাটসাহেব হে তুমি? কি যাচ্ছে গাড়িতে না বললে গাড়ি ছাড়ব না আমরা!'

লোকটা মুহূর্তকাল থমকায়। টর্চের আলো ফেলে সরোজের বন্দুক দেখে। তারপর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলে, 'শুনে কি করবেন? স্টেশন বাজারে চাল নিয়ে যাচ্ছি! চালের বস্তা আছে গাড়িতে। সরু বাসমতী চাল। বুঝলেন? আমার নাম বুধন, নিশিন্দার বুধন সরকার—'

এক নিমু ছাড়া নাম শুনে চমকে ওঠে সবাই। অন্ধকারের মধ্যে টর্চের স্বল্প আলোছায়ার বৃত্তে বুধনকে পরিষ্কার করে চিনতে পারে নি সরোজেরা। তাছাড়া ওই নামটাই শোনা, দেখাসাক্ষাৎ হয় কদাচিৎ। বুধন এ-পাড়ায় বছরে দু'একবার আসে শুধু নগেনবাবুর বাড়িতে। তার মুখটা সকলের কাছে তেমন পরিচিত নয়। কিন্তু তার নানাবিধ কুকীর্তির কথা সকলেই জানে। নারী-ধর্ষণ থেকে মানুষ খুন করার নানারকম অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। যুক্তফ্রন্টের আমলে গা-ঢাকা দিয়েছিল আবার ফিরে এসেছে। গেল হপ্তায় হাটবারের দিন নিশিন্দার হাটতলায় দলবল নিয়ে তোলা আদায়ে নেমে এক ভয়ানক কাণ্ড করেছে। এ পাড়ার মানুষ তার কথাও শুনেছে। হাটতলার জমিতে তিন আনা ভাগ আছে নকুল সরকারের। প্রতি হাটবারে দোকানীদের কাছে পয়সা আদায় করে বৃন্দাবন আর নকুলের লোকেরা। তরিতরকারিও উঠিয়ে নেয়। বাতাসী নামে একটি মেয়ে পাশের গ্রাম থেকে এসেছিল কিছু শাকপাতা, বেগুন, কুমড়ো নিয়ে। ভরাবয়সের যুবতী মেয়ে। দুপুরের দিকে তার কাছে এসে একটাকা তোলা চায় বুধনের দল। আসলে টাকাটা উপলক্ষ্য, আসল লক্ষ্য ওর

সরোজ বলে, 'না, ছাড়া চলবে না। কাল বাজার ঘুরে আমিও চাল পাই নি এক ছটাক—'

নিমু একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু বলে না। বুধন সরু টর্চের আলো ফেলে সরোজের বন্দুক দেখে। তারপর কাজলের মুখের উপর আলোটা অনেকক্ষণ ধরে রেখে বলে, 'ও, তুমি! শরৎ-মাস্টারের চেলা! চোর ধরার নামে রাস্তা পাহারা দিচ্ছ! চালের গাড়ি আটকাবে! শালা!'

গাড়োয়ানছুটোর দিকে তাকিয়ে হুকুম দেয়, 'এই শালোরা, ডাঁইরেয় রইলি কেনে সঙের পারা—লে চল্, গাড়ি ডাকা—ডাক বলছি! ডর কিসের। কোন শালো কি করবে!'

কাজল হঠাৎ লাফিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়, 'এই, রোখো গাড়ি!'

সরোজও এগিয়ে আসে, 'রাতের অন্ধকারে শহরে চাল নিয়ে যাচ্ছেন, পারমিট আছে?'

বুধন বলে, 'পারমিট? আছে! ট্যাঁকে গোঁজা আছে! একটা নয়, দশটা!'

কাজল বলে, 'দেখান। আমরা দেখব!'

'কোথাকার লাটসাহেব তোমরা? তোমাদের কি এক্তিয়ার আছে পারমিট দেখার? এই শালোরা, গাড়ি ডাকা—'

সরোজ বলে, 'না! এ গাড়ি আমরা আটক করলাম!'

'আটক করলে! বুধন সরকারের গাড়ি!' হা হা করে হেসে উঠল বুধন। সেই কর্কশ হাসিতে ভোররাত্রির স্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। কুকুরছুটো আবার চিৎকার করে উঠল। আশেপাশের বাড়িঘরে লোকজন জাগতে শুরু করল। মোটর মেকানিক নরেন বর্শা হাতে এল ছুটতে ছুটতে, 'কুকুরগুলো চেঁচায় কেন? কে হাসল? কি হল সরোজদা?'

বন্দুকের হাতলে সরোজের হাত শক্ত হয়ে বসল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল সে।

বুধন হাসি থামিয়ে গাড়োয়ানদের তাড়া দিল, 'এই বাঞ্চোতরা এখুনো ডাঁইর‍্যে রইছিস্—'

গাড়োয়ানদুটো গরুর লেজ মুচড়ে পেটে লাঠির খোঁচা মেরে অদ্ভুত শব্দ তুলল, 'হেঁই হট্—ট্র-ট্র-ট্র—'

গাড়ি নড়ে উঠতেই হঠাৎ সরোজের কি যে হল! ধৈর্যের সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গে যেন খুনের নেশা চেপে গেল তার মাথায়। বন্দুক উঁচিয়ে গর্জন করে উঠল, 'খবরদার! গাড়ি এক পা এগুলেই গুলি করব সব শালাকে!'

গুলির কথা শুনে থমকে গেল গাড়োয়ানদুটো। গাড়িদুটোও থেমে গেল। সরোজ দ্রুত অস্থির ভঙ্গিতে আরো কয়েক পা এগিয়ে বুধন সরকারের বুকের উপর বন্দুকের নলটা ধরে হিংস্র উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'এই শালা! হাত তোল! হাত তোল বলছি! হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাক শালা!'

শশাঙ্কমাস্টার দারুণ ভয় পেয়ে গেল। তার মুখ রক্তহীন ফ্যাকাসে। চাপা মেয়েলি গলায় সে বলে উঠল, 'আঃ সরোজ! কি হচ্ছে!'

মোটর-মেকানিক নরেন ব্যাপারটা ভাল করে না বুঝেও চেঁচিয়ে বলল, 'ঠিক করেছেন সরোজদা! আপনি বন্দুকটা ধরে রাখুন। আমি পাড়ার লোক ডাকছি—'

এতক্ষণ পরে নিমুর গলা পাওয়া গেল। চুপ করে মুখ ঘুরিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বুধনকে তার চেয়ে বেশি আর কে চেনে এপাড়ায়! সে সামনে আসতে চায় নি। বরং পায়ে পায়ে পিছু হটে কেটে পড়ার কথাই ভাবছিল। কিন্তু এখন গুলিভরা উদ্যত বন্দুকের মুখে বুধনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটা অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠল। ভয়টা বুধনকে নিয়ে নয়, সরোজদের জন্য। ঝোঁকের মাথায় সরোজ যদি একটা কিছু করে বসে, বুধনের দলবল রেহাই দেবে না কাউকে। দিনের আলোতে প্রকাশ্য রাস্তায় ছুরি চালিয়ে কিংবা বোমা মেরে খুন করে ফেলাও বিচিত্র নয়।

বুধনের ওসব অভ্যাস আছে। সে ক'পা এগিয়ে সরোজের পাশে দাঁড়িয়ে বলে, 'যেতে দিন সরোজদা! এ রাস্তায় চাল সবাই পাচার করে! বুধনদারা করে, খোকনদারাও করে।'

সদানন্দও উঠে এসেছে লাঠি হাতে। সে বলে, 'হ্যাঁ, সরোজদা আমি মাঝেমাঝেই গাড়ির শব্দ পাই। ভয়ে কিছু বলি না।'

বুধন এতক্ষণে নিমুকে দেখতে পায়। দাঁত চেপে বলে, 'তুইও আছিস দলে! তোর বুদ্ধিতেই আমার চান্স ধরতে এসেছে শালারা!'

নিমু বলে, 'না, বুধনদা!'

বুধন গর্জন করে ওঠে, 'চুপ কর শালা, সব বুঝতে পেরেছি আমি! আমাকে জব্দ করার মতলব। খোকনরা শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে তোকে। ঠিক আছে, তোকে দেখছি আমি—'

নরেন ধমকে ওঠে, 'এই শালো, চোখ রাঙাবি না! চোরাই চাল পাচার করে আবার চোখ রাঙানো। ওসব আমরা কেয়ার করি না!'

বুধন তার কথায় আমল দেয় না। নিমুর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে, 'তোর তেল কি করে ভাঙতে হয় জানি আমি!'

নিমুও উত্তপ্ত হয়। পাড়ার বুকে বুধন তার মানইজ্জত ধরে টানাটানি করছে। সে বুধনের খায় না, পরে না। খোকনদের দলের ছেলে সে। বুধনের কি অধিকার আছে তাকে অপমান করার! তাছাড়া সে তো আপোষেই মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল ব্যাপারটা। তবু শালা মেজাজ দেখাচ্ছে, দেখ! নিমু চড়া গলায় বলে, 'বেশি রোয়াব ঝাড়বেন না বলে দিচ্ছি। আপনাকে আমার চেনা আছে বুধনদা।'

বুধন বলে, 'চিনিস নি। এবার চিনবি!'

'ঠিক আছে। যা পারেন করে নেবেন!'

বুধন আর কথা বাড়ায় না। গোলমালে পাড়ার লোকজন উঠে আসছে। ভোর হতেও খুব একটা দেরি নেই। সে আর চোখ রাঙায় না, মেজাজ দেখায় না। কয়েকমুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুএকটা ভাবে। তারপর টর্চ ফেলে সকলের মুখগুলো পর্যায়ক্রমে দেখে নেয় ভাল করে। হাত দিয়ে সরোজের বন্দুকের নলটা ঠেলে সরিয়ে

দিয়ে গাড়োয়ানদের বলে, 'তোরা ভয় পাস নে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক এখানে। বস্তায় হাত দিতে দিবি না কোনো শালাকে। আমি আসছি। নাইট গার্ড দেওয়া বার করছি—'

সরোজের পাশ দিয়েই টর্চ জ্বেলে সাইকেল চালিয়ে ঝড়ের বেগে চলে যায় বুধন। কোথায় যায় কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু কয়েকমিনিট পরেই নগেন চৌধুরীর বাড়ির ছাদ থেকে ছয়ব্যাটারীর তীব্র আলো পাড়ার গাছপালা বাড়িঘরের উপর ঘুরপাক খেতে থাকে। নগেন চৌধুরীর ভারি মোটা গলাও শোনা যায়। কাওকে ডাকাডাকি করে কিছু বলছেন তিনি। কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা যায় না। আরও একটুপরে নগেনের স্কুটার শব্দ করে আলো জ্বালিয়ে শহরের দিকে ছুটে যায়। পেছনে বসে থাকে নিশিন্দার বুধন সরকার। কোথায় যায়, বোঝা যায় না, কিন্তু রাতজাগা দলটার বুকে কেমন যেন আশঙ্কার শিহরণ জাগে। তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

ভোর হবার আগেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে পাড়ায়। ঘরের দরজা খুলে মানুষেরা সব বেরিয়ে আসে। বয়স্কা মেয়েরাও আসে কেউ কেউ। একফাঁকে শশাঙ্কর বৌ এসে চোখের ইসারায় তর্জনের ভঙ্গি ফুটিয়ে শশাঙ্ককে ডেকে নিয়ে যায়। 'আমি একটু চা খেয়ে আসছি ভাই' বলে শশাঙ্ক নিঃশব্দে স্ত্রীর পেছনে পেছনে চলে যায়। কেউ তাকে বাধা দেয় না জটিল দাস এসে সব শুনে গম্ভীর ফোলা ফোলা মুখ করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। শিশির আসে। উৎপলেরাও আসে। সূর্য ওঠার অনেক আগেই বুড়ো নিমগাছটার তলায় যেন একটা মেলা বসে যায়। ভয়ভাবনা আশঙ্কার সঙ্গে সকলের মুখেই একটা চাপা খুশির ভাব, একটা প্রতিশোধের আনন্দ যেন খেলা করতে থাকে। সকলেই ঘুরে ঘুরে চালের বস্তা দেখে। আহা চাল! কত চাল! একসঙ্গে এত চাল কতদিন দেখে নি তারা। খোলা বাজারে চাল বলতে নেই। কালোবাজারে তিনগুণ দাম। কালেভদ্রে রেশনে পাওয়া যায় পোকাধরা আতপ। চালের অভাবে এ ডাঙ্গার মানুষও অনেকদিন এখন দুবেলা রুটি চিবিয়ে দিন

কাটায়। আজ একসঙ্গে এতগুলো চালের বস্তা দেখে তাদের নাড়ীতে যেন ক্ষুধার আগুন চনমন করে ওঠে। তারা ঘুরে ঘুরে অতৃপ্ত-লোভের দৃষ্টিতে চালের বস্তা দেখে। বস্তার গায়ে হাত বোলায় কেউ। কেউ বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খানিকটা চাল বের করে হাতের তেলোয় রেখে অস্পষ্ট ভোরের আলোতে তার গুণাগুণ পরীক্ষা করে। তারপর খপ্ করে মুখে পুরে কড়মড় করে চিবুতে চিবুতে বলে, 'ফার্স্টো কেলাস চাল মাইরি। মিষ্টি বাস ছাড়ছে!'

গাড়োয়ানছটো এত লোকজন, বর্শা-বল্লম-বন্দুক দেখে শুকনো মুখে গাছতলায় বসে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বাধা দেবার সাহস পায় না। মিন মিন করে বলে, 'হেই বাবুমশয়রা, আমরা কিছু জানি না! লকুলবাবুর চাল এজ্ঞে। তেনার ঘর থেকে বোঝাই করলম। বুধনবাবু গাড়ি ডাকিয়ে লিয়ে এল। গাই বলদ গাড়ি সব উয়াদের বটে—'

উৎপল-শিশিররা তাদের অভয় দেয়, 'ঠিক আছে! তোমাদের ভয় কি। চুপ করে বসে থাক তোমরা—'

জটিল দাস হাত বাড়ায়, 'আমায় চাট্টি চাল দাও দেখি নরেন! কেমন বাস ছাড়ছে চিবিয়ে দেখি—'

নরেনের গাট্টাগোট্টা চেহারা। তেলকালি মেখে গাড়ির তলায় শুয়ে ইঞ্জিন মেরামত করে সে। কখনো গাড়িও চালায়। ভয় ডর কম। ডাকাবুকো মানুষ। সে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে অনেকটা চাল বের করে মুখে পুরে চিবুতে থাকে। জটিল দাস তার দিকে হাত বাড়ালে হেসে বলে, 'খুঁচিয়ে খাও গে!'

কিন্তু জটিলের বস্তা খোঁচানোর সাহস নেই। সে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে, 'দাও না চাট্টি—'

ঘুম ভেঙে প্রায় উদোম শরীরে ছুটতে ছুটতে আসে সদানন্দের পিসী। এসেই ঘ্যান ঘ্যান শুরু করে, 'অ বাপগো! ছালা ভরা চাইল গো! বিলবি? পাড়ায় নি বিলাবি? আমারে দিবি না দুগা? দিস বাবা, দুগা দিস আমারে। তিন দিন ভাত খাই না

আমি! বউ নি খাওন দেয় আমারে। হুইবার নি দেয়! তরা তো জানস্‌ হগলই! আমারে হুগা চাইল দে বাবা, ফুটাইয়া ভাত খামু—'

সরোজ তাকে শান্ত করে, 'অ পিসী, চুপ কর! চাল বিলি করব না আমরা—'

সদানন্দের পিসী চেঁচায়, 'ক্যান? করবি না ক্যান? ভাত খামু না আমি? খাওন লাগে না আমার? না খাইয়া মাইন্‌ষে বাঁচে?'

নিমুর মা-ও ছুটে আসে। নিমুকে বলে, 'এত চাল কি হবে রে? আমরা পাব চাট্টি করে?'

তাকে প্রচণ্ড এক ধমক দিতে গিয়েও থেমে যায় নিমু। মা'র রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখ, কাঠি কাঠি শরীর আর জীর্ণ বস্ত্রের অবস্থা দেখে চাপাগলায় বলে, 'তুই ঘরে যা মা। কি করতে এলি?'

একখানা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ঘোষালমশাই আসেন এই সময়। সঙ্গে পারুলও এসে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। কাজলের দিকে তাকিয়ে ঘোষালমশাই বলেন, 'বেশ বড়সড় ঝামেলা বাধালে দেখছি তোমরা। কি করবে এখন গাড়ি নিয়ে?'

কাজল বলে, 'সেটা তো বুঝতে পারছি না মেসোমশাই। তাই তো আপনাকে ডেকে পাঠালাম।'

ঘোষালমশাই বলেন, 'দাঁড়াও ভাবি, একটু ভেবে দেখি।'

তখন অনেকেই বলে চাল বিলি করে দেবার কথা।

দ্বিজপদ ঘোষ ঘাড়মাথা চুলকে বলে, 'বুধনদের চাল! হজম করা শক্ত। পেট থেকে আঁকশি দিয়ে খুঁচিয়ে বার করবে!'

সদানন্দের শ্বশুরবাড়ি নিশিন্দায়। সেও জানে অনেককিছু। চিন্তিত ম্রিয়মান গলায় বলে, 'বড় হাঙ্গামা হবে মেসোমশাই! দলবল নিয়ে ঘরবাড়ি না জ্বালিয়ে দেয় এসে!'

জটিল ভয় পেয়ে বলে, 'কি সর্বনাশ! কি দরকার ছিল গাড়ি ধরার!' বলে হাতের একমুঠো চাল ফেরৎ দেয় নরেনকে। বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে চালটুকু নরেনই তাকে দিয়েছিল।

উৎপল তাকে খোঁচা দেয়, 'এত ভয় তো উঠে এলে কেন! যাও কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ো গে!'

জটিল তিড়বিড়িয়ে ওঠে, 'ভয়! কোন্ শালাকে ভয় করি আমি! জানপ্রাণের ভয় নেই আমার! ভাবনা শুধু দোকানখানা নিয়ে। কোন্‌দিন বোম্‌টোম্ মেরে না উড়িয়ে দেয়। বুধনদের তো চেনো না তুমি—'

পাড়ার এতগুলো মানুষকে ভয়ভাবনায় পীড়িত হতে দেখে কাজল শক্ত হয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, 'চিনি, খুব চিনি ওদের। সেবার শরৎমাস্টার দাঁড়িয়ে থেকে কান ধরে ওঠ্‌বোস করায় নি বুধনকে? নিশিন্দার বাগ্‌দীরা পাথরে ওর মুখ ঘষে দেবে বলে শাসায় নি? ফেরার হয়ে ছ'মাস কোথায় লুকিয়েছিল সব? কার ভয়ে লুকিয়েছিল?'

জটিল বলে, 'সে তো তখন তোমাদের রাজ[illegible] ছিল গো! এখন বনবিড়ালই বাঘ হয়েছে—'

নিমুর দিকে চোখ পড়তেই থেমে যায় জটিল। কথা ঘুরিয়ে বলে, 'না, মানে, হাতী তখন খানায় পড়েছিল আর কি!'

ঘোষালমশাই বলেন, 'থাম দেখি তোমরা। রাতজাগার দল যা করেছে বেশ করেছে। আইন ধর্ম আমাদের পক্ষে। চোরগুণ্ডাদের এত ভয় পাওয়ার কি আছে? একসঙ্গে থাক সবাই, জোট বেঁধে থাক!'

কাজল তাকায় ঘোষালমশায়ের দিকে। মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়ে আসে। পাড়ার সব যুবকেরাই যদি এই বৃদ্ধের মত হত! সে বলে, 'না মেসোমশাই, আমরা কেউ ভয় পাচ্ছি না। গাড়িদুটো নিয়ে কি করা যায় আপনি বলুন—'

ঘোষালমশাই কিছু বলার আগেই কাঁচারাস্তায় লালধুলো উড়িয়ে স্কুটার ছুটিয়ে নগেন চৌধুরী এসে থামেন। গাড়িতে বসে মাটিতে পায়ের ভর রেখে অবাক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো? সাতসকালে এত জটলা কিসের?'

মনের রাগ মনে পুষে রেখে সরোজ বলে, 'রাতের বেলা আমরা চোর ধরেছি নগেনদা, চোরের রাজা, মহাচোর !'

'কই? কই সে?'

'অন্য সাগ্‌রেদদের ডাকতে গেছে। চোরাই মাল আমাদের জিম্মায় আছে।'

'হুঁম্, কে ধরেছে? কে? নিমু নাকি?' বলতে বলতে নগেন চৌধুরী বাঁকা চোখে চালের গাড়ি দেখেন। তারপর বেশ জোর দিয়েই বলেন, 'ধরেছ যখন ছেড়ো না! গাড়ি যদি আটকে রাখতে পার তবে তো বুঝি হিম্মৎ! আমি আসছি একটুপরেই—'

বলে আবার স্কুটারে স্টার্ট দেন। নিমুর দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে মুখে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে বাড়ির দিকে চলে যান। নিমু দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'শালা চুথিয়া!'

তার মিনিট তিনেক পরেই পুলিশের জীপ্ গাড়ি এসে থামে। ক'জন সিপাইর সঙ্গে থানার ও. সি ভূষণ সমাদ্দার। সিপাইগুলোর হাতে রাইফেল। ভূষণের কোমরের খাপে রিভলবার। মেয়েরা একে একে ঘরে ফিরে গিয়েছিল। সকালে দাঁড়িয়ে কাটানোর সময় নেই তাদের। পুরুষেরাও অনেকে গিয়েছিল। গাড়ির শব্দে তারা আবার ছুটে এসে ভিড় জমায়। সদানন্দের পিসী যায় নি, চালের বস্তার গা ঘেঁষে একটা বস্তা খামচে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে।

ভূষণ গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পর্যায়ক্রমে সকলের মুখ দেখে। তার মুখচোখ ভয়ঙ্কর রকমের গম্ভীর। কি উদ্দেশ্যে, কি চাল চালতে এসেছে বোঝা যায় না। সকলেই নিঃশব্দে অপেক্ষা করে।

ভূষণ বলে, 'গাড়িদুটো কে আটকেছে?'

সরোজ তাকায় কাজলের দিকে। শশাঙ্ক নেই। সেই যে ঘরে ঢুকেছে—আর বেরোয় নি। জটিল ক্রমশ ভিড়ের পেছনে গা ঢাকা দিচ্ছে। দোকান করে খায় সে। আইন ভেঙে কোনোদিন রাত নটা-দশটা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখে। সাপ্তাহিক বন্ধের দিনও আধখানা পাল্লা খুলে বিক্রিবাট্টা করে। দারোগাবাবুর সামনে বুক

চিতিয়ে দাঁড়ানোর দরকার কি! নরেন আর সিদ্ধেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে দু'পাশে। কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে শেষপর্যন্ত কাজলই এগিয়ে আসে, 'আমরা ধরেছি। আমাদের ডিউটি ছিল কাল।'

ভূষণ কাজলের মুখখানা ভাল করে দেখে নিতে নিতে বলে, 'বেশ করেছেন।' বলে বটে কিন্তু মুখের রেখাগুলো কেমন কঠিন-কঠিন, গলার স্বরটা কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, চোখের দৃষ্টিটা কেমন বক্র-কুটিল। সকলেই এটা লক্ষ্য করে—ফলে কেউ কোনো উৎসাহ পায় না। শেষপর্যন্ত ঘোষালমশায়ের পরামর্শে তারাও হয়ত থানাতেই খবর পাঠাত। কেননা সেটাই নিয়ম। কিন্তু তার আগেই পুলিশ এসে যাওয়ায় সকলেই বুঝতে পারে, নগেন চৌধুরীর নির্দেশেই তারা এসেছে। বুধন সরকার এখন হয়ত থানায় বসে ছোটবাবুর সঙ্গে চা ডিম সিগ্রেট খাচ্ছে। ভূষণের মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই নতুন করে ভয়ভাবনায় পীড়িত হয়।

রাত্রির একটা নিজস্ব মাদকতা আছে। অন্ধকারের গর্ভে সঞ্চিত আছে আদিমকালের বহু রোমাঞ্চ, বহু হিংস্রতা। দিনের স্বাভাবিক মানুষ রাতের আঁধারে অকস্মাৎ উত্তেজনায় অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। দিনের আলোতে যে মন শান্ত সংযত, রাতের তমিস্রায় সে-ই হয়ে উঠতে পারে চরম উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল। গত রাতে ঘন অন্ধকারের পটভূমিতে যে তীব্র মাদকতাময় উত্তেজনা নিয়ে কাজলেরা ছুটে গিয়ে গাড়ি আটক করেছিল, সরোজ বন্দুকে গুলি ভরে বুধনের বুক ঝাঁঝরা করার হুমকি দিয়েছিল—এখন নিশাবসানে রোদ-ঝলমল উজ্জ্বল দিনের আলোতে তার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। এখন আকাশ পরিষ্কার, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, বহুদূরের গাছপালাও নজরে আসে। অন্ধকারের সীমাবদ্ধতা থেকে দৃষ্টি এখন মুক্ত, স্বচ্ছ। এখন তারা দূরদৃষ্টির অধিকারী। কাজল সরোজ শিশির উৎপলেরা এমন কি নরেন ও সদানন্দও এখন পরস্পরের মুখ দেখে ও হতাশভাবে চিন্তা করে—এই থানা, এই পুলিশ, এই আইনকানুন কিছুই তো তাদের পক্ষে নয়। তা যদি

হবে তাহলে রাতেরাতে গাঁ-গঞ্জ থেকে এত ধানচাল জেলার বাইরে চলে যায় কি করে? যখন জেলার মানুষ দুর্ভিক্ষে আছে আর খরায় আকাশমাটি জ্বলছে? কিংবা তাদের পাড়ার একটা চুরি ডাকাতিরও কিনারা হয় না কেন?

কাজলের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানা বড় ক্লিষ্ট দেখায়। এইসময় চন্দ্রবাবু ভিড় ঠেলে ভূষণের সামনে এসে দাঁড়ান। একটু রুক্ষ গলাতেই জিজ্ঞেস করেন, 'আমার বাড়ির কেস্‌টার কি হ'ল দারোগাবাবু?'

'কেস? কিসের কেস?'

'বাঃ, আমি যে ডাইরি করে এলাম—'

সিদ্ধেশ্বরও এগিয়ে আসে, 'আমার, সাইকেলটা, দারোগাবাবু—'

ভূষণ বিরক্ত হয়ে একরকম ধমকে ওঠে, 'ওসব ছিঁচকে চুরির কথা রাখুন। চালের গাড়িদুটো আমরা থানায় নিয়ে যাচ্ছি—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'হ্যাঁ, নিয়ে যান। নিয়ে গিয়ে যা হয় করুন গে।'

ভূষণ বলে, 'শুধু নিয়ে গেলে তো হবে না। বিনা পারমিটে বেআইনী চাল পাচার। কোর্টে মামলা তুলতে হবে আপনারা কে কে সাক্ষী হবেন বলুন।' বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে জীপগাড়ির আসন থেকে একটা মোটা খাতা তুলে আনে ভূষণ। কলম বের করে। সরোজেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

ঘোষালমশাই বলেন, 'অন্য সাক্ষীসাবুদের দরকার কি? এই গড়োয়ানদুটোই তো আছে।'

ভূষণ হাসির মত একটা ভঙ্গি করে, 'তা কি করে হয়! ওরাও তো ক্রিমিন্যাল! হাজতে যাবে! আপনারা কে কে সাক্ষী হবেন বলুন।'

কেউ মুখ খোলে না! অভাবী সংসারের মানুষ সবাই, ছানা-পোনা ঘরসংসার হাটবাজার চাকরিবাকরি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। থানা-পুলিশ কোর্টকাছারির উটকো ঝামেলায় কে জড়াতে চায়! কার

এত সময় আছে। নিমু কখন সরে পড়েছে, তার খোঁজই পাওয়া যায় না। চন্দ্রবাবু পিছিয়ে আসেন। উৎপল চুপ করে থাকে। সরোজ কাজলও গম্ভীর, নির্বাক।

ভূষণ তাড়া দেয়, 'কি হল? নাম বলুন—'

শেষপর্যন্ত কাজলকেই মুখ খুলতে হয়, 'আমি ছিলাম ডিউটিতে, আমি সাক্ষী, লিখুন আমার নাম—'

ঘোষালমশায় হা হা করে ওঠেন, 'না না, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি এসবের মধ্যে যাবে কেন!'

কাজল বলে, 'কেন মেসোমশাই, আমরাই তো গাড়ি ধরেছি কাল।' ঘোষালমশাই বলেন, 'ধরেছ বেশ করেছ, এখন নিয়ে যেতে দাও ওদের। মামলা মোকদ্দমা যা করার ওরা করুন গে।'

ভূষণ ঠোঁট টিপে হাসে, 'তা হয় না। সাক্ষী চাই।'

'হয় না?' ভ্রূকুঞ্চিত করেন ঘোষালমশাই, 'তাহলে এক কাজ করুন, নাম লিখুন আমার, কাজকর্ম নেই, রিটায়ার করেছি। যতবার ডাকবেন কোর্টে হাজিরা দেব। অনেকবার অনেক সাক্ষী দিয়েছি জীবনে—'

ভূষণ বলে, 'আপনি কি করে সাক্ষী হবেন? আপনি তো ধরেন নি গাড়ি।'

ঘোষালমশাই বলেন, 'নাই বা ধরলাম। নিজের চোখেই তো দেখছি সব। আর ওই বুধন না কি নাম, সে হারামজাদাকে সবাই চিনি। সেবার নিশিন্দায় ভোটের ঘরে বোমা ফেলে একটা মানুষ খুন করেছে ও। ওরই জন্য এ পাড়ার কেউ ভোট দিতে পারি নি। সেদিনও হাটতলায় কুকীর্তি করেছে। জটাধারীর কাছে সব শুনেছি। ওই লম্পট বদমাশ্‌গুলোকে শায়েস্তা করতে পারেন না আপনারা? দিনরাত বন্দুক পিস্তল কোমরে ঝুলিয়ে কি করেন?'

ভূষণ চোখ টান করে তাকায় ঘোষালমশায়ের দিকে। বুড়ো-মানুষ। মাথার চুলগুলো প্রায় সাদা। কাঁচা পাকা মেশানো ভুরু। খাড়া নাক। তোবড়ানো গাল। রোগা লম্বা দীর্ঘ দেহ বয়সের ভারে

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে। ভূষণ তাঁকে কিছু বলে না। ঘাড় ঘুরিয়ে গাড়োয়ানত্নটোর উদ্দেশ্যে বলে, 'এই, তোমরা গাড়ি থানায় নিয়ে যাও।'

হুকুম পাওয়া মাত্র গাড়োয়ানত্নটো নড়েচড়ে ওঠে। যেন এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে ওদের। নকুল সরকারের নিজের বিশ্বস্ত লোক ওরা। থানায় গেলে বাবু এসে তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে, এ বিশ্বাস তাদের আছে। মুখে শব্দ তুলে গরুর পেটে লাঠির খোঁচা দিতেই গাড়ি চলতে শুরু করে। এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর সদানন্দের পিসী এবার হাউমাউ করে ওঠে, 'অ বাবারা, চাইল দিবা না তুমরা? এই আঁচলডায় চারডি দিয়া যাও বাবা! অ বাবা দারোগা, অ বাবা সিপাই—'

চালের গাড়ি থানার দিকে যায়। কেউ বাধা দেয় না। সদানন্দের পিসী যায় পেছনে পেছনে। তার তিনদিন ভাত জোটে নি। ত্বপুরে আটাগোলা খেয়ে আর রাতে উপোস দিয়ে দিন কাটাচ্ছে সে। এখন তার বুকের হাড়পাঁজরা আঙ্গুলে গোনা যায়। সে গাড়ির পেছন পেছন যায় আর ত্ব'হাতে ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের আঁচল মেলে রেখে চেঁচায়, 'অ বাবা গাড়ুয়ান, অ বাবা পুলিশ, বেধবা ত্বখ্খী মানুষডারে একমুঠা চাইল দিয়া যাও বাবা!'

গাড়ি আরো এগিয়ে গেলে পিসী হঠাৎ থেমে পড়ে। অস্বাভাবিক বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপরই রাগেত্নঃখে মাথার চুল টানতে টানতে বিকট গলায় চিৎকার করতে থাকে, 'অই হারামির পোলারা, অই গু-খাওনির পুতেরা, অই খালভরারা, দিলি না এক মুঠা চাইল! দিলি না! মর্ মর্ মর্, মুখে রক্ত উইঠা আজই মর! অ দারোগা, তর বাপ্ মরে, তর মা মরে—'

একটা সিপাই বাজখাঁই গলায় ধমকে ওঠে তাকে, 'এই-ও মাগী! চো—প! গুলি করেঙ্গা!'

পিসী হঠাৎ দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। রুগ্ন ত্বই হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে রাইফেল টানাটানি শুরু করে। কখনো

হিংস্র ভঙ্গিতে দাঁত বসিয়ে দেয় লোহার নলের উপর। কখনো জামা টেনে ধরে। আর তীব্র গলায় চেঁচায়, 'কর্, গুলি কর! গুলি কর্! গুলি কইরা মাইরা ফেলা আমারে। নইলে আমি করুম্ গুলি তগো! বেবাকেরে গুলি কইরা যমের বাড়ি পাঠামু! ছাড় বন্দুক! ছাড়—'

পিসীর কাণ্ড দেখে পাড়ার লোক হৈ হৈ করে ওঠে। বিব্রত বিপর্যস্ত পুলিশটা জোরে ধাক্কা দেয় পিসীকে। সে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে। রাঢ়ের রুক্ষ লাল মাটি, স্থানে স্থানে পাথরের মত শক্ত। পিসীর কপালের একপাশ কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। সদানন্দ দৌড়ে এসে পিসীর ছোট শরীরটা একরকম কোলে নিয়েই বাড়ির দিকে চলে যায়।

ভূষণ দাঁত বের করে খিকখিকিয়ে হেসে বলে, 'ডেঞ্জারাস্ মহিলা! নক্শালদের মত বন্দুক ছিনতাই করতে চায়।'

তার কথায় সিপাইরাও হাসে। সরোজ ও কাজল কঠিন দৃষ্টিতে ভূষণের দিকে তাকায়। ঘোষালমশাই অপ্রসন্নভঙ্গিতে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠেন, 'মানুষের খিদেতেষ্টা নিয়ে হাসাহাসি করেন। পুলিশে চাকরি নিলে মানুষ কি মানুষ থাকে না!'

হাসি গুটিয়ে ভূষণ কড়াচোখে তাকায় ঘোষালমশায়ের দিকে। রাগে ঘৃণায় ঘোষালমশাই মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেন। ভূষণ এবার নিজমূর্তি প্রকাশ করতে থাকে। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করে, 'এ পাড়ায় বন্দুক আছে কার বাড়িতে?'

সরোজ বলে, 'আমাদের বাড়িতে।'

'লাইসেন্স কার নামে?'

'বাবার নামে।'

'জীবিত না মৃত?'

'জীবিত।'

'কাল রাতে বন্দুক ছিল কার হাতে?'

'আমার হাতে?'

'কই বন্দুক ?'

'সকালে ঘরে রেখে এসেছি।'

'লাইসেন্স বাবার নামে, আর আপনি বন্দুক নিয়ে ঘোরাফেরা করেন ? জানেন, এটা বেআইনি ? হাইলি ইল্‌লিগ্যাল ?'

'বাবা বুড়োমানুষ, তার উপর ব্লাড্‌প্রেসারের স্ট্রোকে ডানদিকটা অসাড়। বাইরে বেরুতে পারেন না।'

'এটা কোনো যুক্তি নয়। বন্দুকের লাইসেন্স-নাম্বার জানেন ? মনে নেই ? নিয়ে আসুন, কাগজপত্র নিয়ে আসুন, আমরা দেখব—'

সরোজ বন্দুকের লাইসেন্স আনতে যায়। ভূষণ ঘুরে তাকায় কাজলের দিকে, 'আপনি তো মিছিল-মিটিঙ্‌ করেন! মুখটা বেশ চেনা চেনা! এ পাড়ার নেতা বুঝি ?'

ঘোষালমশাই বলেন, 'না, না, নেতাটেতা না, ওতো ছেলেমানুষ। আমিই এ পাড়ার অভিভাবক। আমার কথা শোনে সবাই। আমিই তো বললাম, গাড়ি ধরেছ বেশ করেছ, এখন থানায় খপর দাও—'

এবার ভূষণ খিঁচিয়ে ওঠে, 'আপনি চুপ করুন! বড় বেশি বক বক করেন দেখছি। যান, বাড়ি যান—'

কাজল রূঢ় গলায় বলে, 'যা বলার আমাকে বলুন—'

'হ্যাঁ। আপনাকেই বলছি। রাতজাগার দল করেছেন, হাতে অস্ত্র নিয়ে রাস্তাঘাট পাহারা দিচ্ছেন, থানার পারমিশন নিয়েছেন ?'

'থানায় দরখাস্ত করা আছে। ফাইল দেখুন গে।'

'আমরা অনুমতি দিয়েছি ?'

'দেন নি কেন ?'

'সেটা আমাদের বিষয়। আপনারা বেআইনি ডিউটি দিচ্ছেন! আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন—'

'বেআইনি কেন ? পাড়ায় চুরি হয় রোজ। আপনারা কিছু করতে পারেন না—'

'পারি না ? পারি, সব পারি! সময় নেই! ঠিক আছে, থানায় গিয়ে পারমিশনটা নিয়ে আসবেন আপনারা—'

সরোজ ফিরে আসে। লাইসেন্সের কাগজপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ভূষণ। তারপর বলে, 'এটা থাকল আমার কাছে। আপনি আর বন্দুক নিয়ে কোথাও বেরুবেন না। চারদিকে ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুরু হয়েছে, এখন বন্দুক নিয়ে খেলা করার দিন নয়।'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় ভূষণ। ঘাড়গলা উঁচিয়ে ডাঙ্গা-পল্লীর ঘরবাড়িগুলো দেখার চেষ্টা করে। তারপর হঠাৎ-ই জিজ্ঞেস করে, 'এখানে হরিপদ গাঙ্গুলীর বাড়ি কোন্‌টা? কি বললেন? ওই জোড়া নারকেলগাছওলা বাড়িটা? তালা মারা আছে? হরিপদ গাঙ্গুলীর ছেলে মানস, চেনেন তাকে? সে আসে পাড়ায়? আর আসে না? বাড়ির চাবি কার কাছে? নিশিন্দার শরৎমাস্টার? বুঝেছি। চলুন, বাড়িটা আমি একবার দেখব—'

সন্ধ্যা নামতেই পাড়ার মানুষের বুকের উপর কেমন যেন একটা আতঙ্ক চেপে বসে। ভয়টা বুধন আর তার দলবলকে ঘিরেই। একে একে সবাই এসে জড়ো হয় ঘোষালমশায়ের বারান্দায়। সরোজ কাজলেরা তো আসেই, চন্দ্রবাবুও আসেন। দ্বিজপদ সদানন্দরাও বাদ যায় না। রাতের ঘটনাটা নিয়েই আলোচনা করে সবাই। সাপের গর্তে হাত দেওয়া হয়েছে। ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ। এখন বুধনদের আক্রমণ কখন কি ভাবে আসে বলা যায় না। রাতের বেলা দলবল নিয়ে নিশিন্দার ধানমাঠের আল ধরে পাড়ায় উঠে এসে হামলা করলে কে ঠেকাবে। কি ভাবে ঠেকানো যাবে একদিকে ভয় অন্যদিকে ঘৃণাও জন্ম নেয়। তাদের পাড়ার বুক দিয়েই পাচার হয়ে যায় চালের গাড়ি, চিনির বস্তা, কেরোসিনের টিন। অথচ তারা চাল পায় না, চিনি পায় না, তেল পায় না। এসব এখন আর শুধু শোনা কথা নয়, চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেছে কাল। হাতেনাতে মালও ধরা পড়েছে। নিশিন্দার ওই সরকারেরা এতদিনে যেন স্পষ্ট শত্রু রূপে চিহ্নিত হতে থাকে পাড়ার দরিদ্র মানুষগুলোর

কাছে। বুধন সরকারকে কেন্দ্র করে নিশিন্দার সরকারপরিবারের সকলের উপরেই বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে পাড়ার মানুষগুলো। ঘোষাল-মশায়ের বারান্দায় বসে ভারি থমথমে মুখে তারা ইতিকর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে। দোকান বন্ধ করে জটিলও চলে আসে একটুপরেই। চন্দ্রবাবু বলেন, 'আজ কি নাইটডিউটি বন্ধ থাকবে, কাজল?'

কাজল বলে, 'বন্ধ থাকবে? কেন? তাতে কি লাভ?'

'না, মানে রাতে যদি কিছু হয়—'

'সেটা দেখবার জন্যও তো ক'জনের রাতজাগার দরকার!'

'আজ তো মঙ্গলবার, কার ডিউটি আছে বল ত—'

ঠিক এইসময় ধানমাঠের বুক থেকে কেউ চিৎকার করে বলে, 'বাবুরা রয়েছেন নাকি গো?'

ঘোষালমশাই সাড়া দেন, 'কে বটে? আছি আমরা এখানে—'

'আমি মহাদেব বটি! যেছি, দাঁড়ান—'

আলপথ দিয়ে মহাদেব উঠে আসে। নিশিন্দার মুচিপাড়ার লোক সে। জাতকর্ম ছেড়ে চাষের সময় সরকারদের জমি চাষ করে। পূজোর সময় ঢোল বাজায়। কাঁধে বাঁক নিয়ে কখনো মুনিষও খাটে। মধ্যবয়সের শক্তপোক্ত চেহারা। হাতের থাবায় ধরা প্রকাণ্ড একটা লাঠি। সে একা আসে না, তার পেছনে আসেন শরৎমাস্টার। তাঁর গলায় মাফলার জড়ানো, হাতে ছোট একটা টর্চ। তার ব্যাটারির শেষ দশা, আলো হয় না বললেই চলে। অন্ধকারে মাঠের পথঘাট ভেঙ্গে যাতায়াত করা তাদের অভ্যাস আছে। তাছাড়া নিশিন্দার প্রতিইঞ্চি জমির উঁচুনীচু খানাখন্দ তাদের নখদর্পণে।

শরৎমাস্টারকে দেখে ঘোষালমশাই একটু অবাক হন। তাড়াতাড়ি বসার জায়গা করে দেন। হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনের আলোটাও বাড়িয়ে দেন। শরৎমাস্টার বারান্দার উপর একটা মোড়ায় বসেন। মহাদেব বসে সিঁড়িতে। ঘোষালমশাই বলেন, 'কি ব্যাপার? আপনি এমন সময় মাঠভেঙ্গে?'

শরৎমাস্টার বলেন, 'মুচিপাড়ায় একটা মিটিঙ্ ছিল। শেষ করে

মহাদেবকে নিয়ে আলে আলে চলে এলাম। এবার তো তেমন ফলন নেই। অন্ধকারেও আলপথ বেশ পরিষ্কার দেখা যায়—'

জটিল বলে, 'আপনার সাপের ভয় করে না, মাস্টারমশাই ?'

শরৎমাস্টার বলেন, 'করে না আবার, খুব করে! দু'বার কামড়েছিল, বিষ ছিল না, তাই বেঁচে গেছি!'

জটিল বলে, 'আমাকেও একবার কামড়েছিল!'

শরৎমাস্টার বলেন, 'আপনার শরীর কেমন আছে ঘোষালমশাই ?'

'আর শরীর। এখন মরলেই বাঁচি!'

শরৎমাস্টারকে বারান্দায় দেখে স্নেহলতা উঁকিঝুঁকি মারেন। পারুলও একবার দেখে যায়। পাড়ার মানুষগুলোর মনেও হঠাৎ যেন বল আসে। কাজল বলে, 'কাল রাতের কথা শুনেছেন, শরৎদা ?'

শরৎমাস্টার বলেন, 'সব শুনেছি আমি। শুনেই তো এলাম। তোমরা নাকি বুধনের বুকে বন্দুক ঠেকিয়েছিলে ? নিশিন্দায় বুধন হম্বিতম্বি করছে। খোকনেরাও মদত দিচ্ছে তাকে। এ ব্যাপারে তো মিলেমিশে যায় সবাই—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'ভয়ানক বিপদ দেখছি শরৎবাবু। কি যে হবে!'

মহাদেব বলে ওঠে, 'কি আবার হবে বাবু? ডর কিসের ? আমরা রইছি কি করতে!'

শরৎমাস্টার হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেন, সরোজ-কাজলদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ধানকাটা শেষ না হলে এখুনি গোলমালের কোনো আশঙ্কা দেখছি না। তবে রাতের দিকে একা একা কেউ নিশিন্দা যাবে না তোমরা। আর নাইটগার্ডটাও চালিয়ে যাও। ভয় নেই, পরশু থেকে ধানমাঠে মহাদেবরাও ফসল পাহারায় নামবে। তারই মিটিঙ্ ছিল আজ। সরকারবাবুরা ভাড়া করা লোক দিয়ে ফসল কেটে ঘরে তোলার চক্রান্ত করেছে। এবার ধানের দর তো খুব। নিশিন্দার ভাগচাষী বর্গাদারেরা তা হতে দেবে না। দু'একদিনের মধ্যে ফসল কাটা শুরু হবে। ধানমাঠে পাহারা থাকবে।'

মহাদেব বলে, 'হ্যাঁ বাবু। আমরাও রাত জাগব। হাঁক দিলেই আমাদের গলা পাবেন। ডাক দিলেই লাঠি নিয়ে ছুটে আসব। —ফসল কাটতে দেব না, ধানচাল্গও আর পাচার করতে দেব না।'

মহাদেবের কথা শুনে কাজল আর সরোজের রক্তের মধ্যে যেন খুশির বান ডাকে। উৎসাহে আবেগে বলে ওঠে, 'তবে আর আমাদের ভয় কি! নাইট ডিউটি চলবে—'

চন্দ্রবাবুও সাহস পেয়ে বলেন, 'চলুক! এতগুলো লোক রাত জাগলে ভয় কি!'

এইসময় স্নেহলতা হাতের ইশারায় ঘোষালমশাইকে ডেকে নিয়ে যান ঘরে। কাজল কারণটা ঠিক বুঝতে পারে না। ঘরে তাঁদের কি কথাবার্তা হয় তাও বোঝা যায় না। একসময় ঘোষালমশায়ের চাপা রুষ্ট গলা শোনা যায়, 'সবকিছুরই একটা সময়-অসময় আছে কালীর মা! তোমার দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে—'

ঘোষালমশায়ের কথা থেকে কিছু একটা সন্দেহ করে কাজল গম্ভীর হয়ে যায়।

ঘোষালমশাই আবার চলে আসেন বাইরে। একটা সাদা প্লেটে কয়েকটা পান দিয়ে যায় কালী। শরৎমাস্টার পান খেতে ভালবাসেন। ঘোষালমশাই নিজে শরৎমাস্টারের হাতে যত্ন করে পান তুলে দেন।

একটুপরেই ডাঙ্গাপল্লীর গাছপালার মাথা ছুঁয়ে একটা উজ্জ্বল আলোর বৃত্ত ঘোরাফেরা করতে থাকে। নগেন চৌধুরীর ছয় ব্যাটারির টর্চ। শরৎমাস্টার অবাক হয়ে বলেন, 'ও কিসের আলো?' সরোজ বলে, 'আপনাদের নিশিন্দার ঘরজামাইবাবুর টর্চের আলো।'

মহাদেব বলে, 'খুব জোর আলো বাবু। আমাদের পাড়া থেকেও দেখা যায়। আমরা বলি শয়তানের চোখ ঘুরছে! তা আপনারা উনার উপরেও টুকৃচি লজর রাখবেন।'

আরো কিছু কথাবার্তার পর শরৎমাস্টার উঠে পড়েন। লাঠি হাতে মহাদেবও উঠে দাঁড়ায়। মাঠ ভেঙ্গেই আবার নিশিন্দায় ফিরে যাবে তারা। কাজলও উঠে আসে। শরৎমাস্টারের সঙ্গে ধানমাঠে

নেমে পড়ে সে। পুকুরপাড় পর্যন্ত গরুর গাড়ি চলার সরু রাস্তা আছে। পাশাপাশি হেঁটে ওইপর্যন্ত আসে কাজল। নিচুগলায় কথা বলে। সে জিজ্ঞেস করে মানসের কথা, 'কোনো খোঁজ পেলেন শরৎদা?'

শরৎমাস্টার ঘাড় নাড়েন, 'না।'

'আজ সকালে পুলিশ ওর খোঁজ করছিল।'

'আমার কাছেও করে।'

'ও।'

কাজল ফিরে আসে। মানসের এখনো কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি শুনে সে কি খুশি হয়, অথবা দুঃখিত? কাজলের মনের ভাব স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। মানসের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা সে কাউকে বলে নি। শরৎমাস্টারের সেরকমই নির্দেশ ছিল। এ পাড়ার লোকেরা জানে, মানস আবার কলকাতা ফিরে গেছে। ঘোষালমশাই আর স্নেহলতাও তাই জানেন। বাবার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে সকালের দিকেই কলকাতা চলে গেছে মানস। দুপুরে তাই খেতে আসতে পারে নি। আসল কথা কেউ জানে না। আজ সকালে ভূষণ-দারোগা মানস সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করায় অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তবে সে কিনা শরৎমাস্টারের ভাগ্নে, তার রাজনীতিটাও শরৎমাস্টারের মত, পুলিশ তো তার খোঁজ করতেই পারে—এইরকমই ভেবে নিয়েছে সবাই। তার বেশি কিছু না।

রাত আর একটু বাড়লে সকলেই চলে যায়। কাজল কিছুক্ষণ চুপ করে ঘোষালমশায়ের বারান্দায় বসে থাকে। এরকম প্রায়ই থাকে সে। এতে এ-বাড়ির কেউ কিছু মনে করে না। কাজল তো ঘরের ছেলের মত। ঘোষালমশাই খাওয়া দাওয়া সারেন। কালী এসে লণ্ঠনটা নিয়ে যায়। বারান্দায় অন্ধকারে চাঁদের আলো চিকচিক করে। বাইরে চোখ মেললে আকাশভরা তারা দেখা যায়। পারুল বিছানা করতে করতে একফাঁকে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বলে, 'তুমি এখনো বসে আছ কেন কাজলদা? বাড়ি যাও—'

কাজল বলে, 'এই যাচ্ছি!'

পারুল বলল, 'কি সাংঘাতিক কাণ্ড বাঁধিয়েছে কাল!'

'কেন? তোর ভয় করছে নাকি!'

'না। আমার ভয় কিসের!'

'যদি পাড়ায় এসে হামলা করে?'

'করলে তোমরা রুখবে! এতগুলো পুরুষমানুষ পাড়ায়!'

'সে তো রুখবই।'

কাজল এবার উঠে পড়ে। তার মুখচোখ দিব্যি খুশিখুশি দেখায়। আসলে সে তো পারুলের জন্যই বসে ছিল। পারুল আসবে, তার সঙ্গে দু'একটা কথা বলবে, একটু হাসিঠাট্টা করবে, আর কাজল তার শরীরের পাশে দাঁড়িয়ে শাড়িব্লাউজচুলের অন্যরকম একটা গন্ধ পাবে—এটুকুর জন্যই তো তার অপেক্ষা করা!

কাজল সিঁড়ি ভেঙ্গে বাইরে নেমে আসে। বাইরের আঙিনাটুকু ক'দিন হ'ল বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরেছেন ঘোষালমশাই। জটাধারী নিশিন্দা থেকে বাঁশ এনে সরু করে কেটে দিয়েছে। ঘোষালমশাই নিজেই বেড়া বেঁধেছেন। শীত পড়তে শুরু করেছে। জমিটুকু কুপিয়ে পালং, টমেটো, আলু, পেঁয়াজ লাগাবেন তিনি। পাড়ার গরু-ছাগলের হাত থেকে সেসব রক্ষা করার জন্য বেড়ার ব্যবস্থা। আসা-যাওয়ার জন্য বাঁশের ফালি বেঁধে ছোট একখানা গেট্ করেছেন।

কাজলের সঙ্গে পারুলও গেট্ পর্যন্ত এগিয়ে আসে। কাজল বলে, 'সকালে তুই-ও মাটি কোপাস দেখি পারুল!'

পারুল বলে, 'কোপালে দোষ কি!'

'কিছু না। ভালই তো!'

পারুল হঠাৎ বলে, 'আচ্ছা, কাজলদা—'

'কি?'

'পুলিশ কেন আজ সকালে মানসদাদের বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল? কি করেছে মানসদা?'

পারুলের মুখে মানসের কথা উঠতেই কাজল থমকে দাঁড়ায়।

মনের খুশি-খুশি ভাবটুকুও মিলিয়ে যেতে থাকে। সে তীব্র দৃষ্টিতে পারুলের মুখ দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু ম্লান জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। পারুলের দুই কানের গোলাকার সোনার সরু রিঙ্‌দুটো শুধু ছিকমিক করে। কাজল দাঁত চেপে বলে, 'জানি না।'

পারুল সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে। সে খুব বুদ্ধিমতী। কাজলের বলার ভঙ্গিতে রূঢ় উত্তাপটুকু তার কাছে ধরা পড়ে। চাপা হাসিতে মুখচোখ উদ্ভাসিত করে বলে, 'এবার শীতে তোমাকে একটা সোয়েটার বুনে দেব কাজলদা। গতবছর বলেছিলাম, দিই নি। সময় পাই না তো। এবার ঠিক দেব—'

কাজলের সহসা কি যে হয়। চকিতে এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে দু'হাতে পারুলকে দ্রুত কাছে টেনে নেয় সে। তারপর কয়েকসেকেণ্ড বুকের মধ্যে চেপে রেখে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে। পারুল ছটফটিয়ে ওঠে। কাজল তাকে ছেড়ে দিয়ে অস্থির উত্তেজিত ভঙ্গিতে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। তার মনের মধ্যে খুশির বদলে একটা বিমর্ষতা কাজ করে। আর পারুলের সারা শরীর থরথরিয়ে কাঁপে। বুক দ্রুত ওঠানামা করে। মনে হয়, তার যেন এখুনি জ্বর এসে যাবে। কাজলের এই অতর্কিত চুম্বনকে তার ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না। এ যেন জুলুম করে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা!

নিশিন্দার মাঠেমাঠে ধানকাটা শুরু হয়ে যায়। দিনের বেলা মুনিষকামিনভাগচাষীবর্গাদারের গলার শব্দে, গরুরগাড়ির চাকার আওয়াজে, কাস্তের খসখসানিতে ডাঙ্গাপল্লীর তিনদিক গমগম করে। রাতের বেলা চলে ধান পাহারার কাজ। মহাদেবরা দলবেঁধে লাঠি হাতে পুকুরপাড়ে ঘোরাঘুরি করে। কখনো মশাল জ্বালায়। কখনো ঢোল বাজিয়ে গানও করে। অন্যদিকে সরকারবাড়ির লোকেরাও রাত জেগে দূর থেকে নজর রাখে। রাতের বেলা ধানচুরি করে যদি নিজের ঘরে নিয়ে তোলে শালারা! শরৎমাস্টারের খপ্পরে পড়েছে সব। শালাদের বিশ্বাস কি! কিন্তু দাঙ্গা করার সাহস পায় না।

কেননা নিশিন্দার মুচিবাউড়িবাগ্‌দিরা পেটের দায়েই আজ ঐক্যবদ্ধ। খরায় পুড়তে পুড়তে যেটুকু ফসল তাদের শ্রমেঘামে বেঁচে উঠেছে, তার নায্য ভাগ চায় তারা। ধান নিজের ঘরে তুলে ভাগ করতে চায়। বর্ধিত হারে মজুরি চায় মুনিষকামিনেরা। এসব তাদের দাবি। এ দাবি তারা আদায় করে ছেড়েছে। নিশিন্দার সরকারেরা দলবল নিয়ে পিছু হটেছে। বাইরের মজুর এনে ধান কাটাতে সাহস পায় নি বৃন্দাবন কিংবা নকুল সরকাররা। নিজের খামারে-উঠোনে ধান তুলে নেবারও আর শক্তি নেই তাদের। কিন্তু থাবা ছড়িয়ে ওৎ পেতে আছে। আগে মাঠ থেকে ফসল উঠে আসুক, ঝাড়াইবাছাই হয়ে গোলাজাত হোক—তারপর হিসেব হবে। দেখা যাবে কার ধান কার ঘরে থাকে। ওই ইতর ছোটলোকগুলোর ঐক্যের জোর বেশি, না তাদের ক্ষমতার—তারও পরীক্ষা হবে!

কাটা ধান পড়ে থাকে মাঠে, একসঙ্গে সব তো তোলা যায় না। রাত জেগে পাহারা দেয় দু'পক্ষই। একপক্ষ আরেকপক্ষের উপর নজর রাখে। ফলে এখন সারারাত মাঠে লোক থাকে।

নগেনবাবু মাঝে মাঝে ছাদে উঠে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টর্চ ফেলেন। ধানমাঠ থেকে তাঁর লোকেরা সাড়া দেয়—'বাবু, জেগে রইছিই ই ই।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবদের গলা শোনা যায়, 'আমরাও রয়েছি হে-এ-এ। সাবোধান!'

ডাঙ্গাপল্লীর রাতপাহারার দল নির্ভয়ে রাত জাগে। পাহারা দিতে দিতে কখনো মাঠের ধারে এসে দাঁড়ায়। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, 'কে বটে গো, কে কথা বলছ মাঠে?' সরকারবাবুদের লোকেরা সাড়া দেয় না। কিন্তু মহাদেবরা সাড়া দেয়, 'ভয় নাই বাবুমশয়রা, আমরা বটি-ই-ই, মুচিপাড়ার ম'দেবরা—'

সরোজ শিশির কাজলেরা, যাদের যেদিন ডিউটি থাকে, নিশ্চিন্ত হয়ে কোথাও এসে বসে। বিস্তীর্ণ ধানমাঠের এখানেওখানে মশালের আলো দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। শুকনো খড়ের আঁটি, ডালপালা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেয় কখনো। অন্ধকারের বুকে লাল

আগুনের আভায় অনেকগুলো মানুষের কালো শরীর আর ইস্পাতের ধারালো কাস্তে চক চক করে।

কোনো কোনো দিন সরকারবাবুদের মাইনে করা লোকের উপর ভীষণ রেগে যায় সরোজ। বন্দুক উঁচিয়ে বলে, 'শালাদের গুলি করব।'

তার ডিউটি থাকলে ভূষণ দারোগার হুঁসিয়ারি উপেক্ষা করে বন্দুক সে সঙ্গে রাখে। রাতের অন্ধকারে কোন্ দারোগা আসবে সরোজের হাতে বন্দুক না লাঠি পরীক্ষা করতে! তাছাড়া বন্দুক হাতে না থাকলে সরোজ নিজেকে বড় অসহায় ভাবে। কখনো কখনো এমনও মনে হয়, বন্দুকই হ'ল সব শক্তির উৎস। কাজলের সঙ্গে এ নিয়ে সে আজকাল তর্কও করে।

সরোজের রাগ দেখে কাজল অবাক হয়ে বলে, 'কেন? গুলি করবেন কেন?'

সরোজ বলে, 'দেখছ না শালারা কেমন বিকট গলায় হাসছে হা হা করে। পচুই গিলে মাতলামি করছে সব।'

'করুক। ওদের সামাল দেবার জন্য মহাদেবরা তো আছে।'

শশাঙ্ক বলে, 'আজ এত হৈ হৈ করছে কেন ওরা? মহাদেবদের সঙ্গে দাঙ্গা বাধাবে নাকি?'

কাজল বলে, 'বাধাক না। তখন না হয় যাব আমরা।'

শশাঙ্কর মত ভীতু মানুষও উত্তেজিত হয়ে ঝোঁকের মাথায় বলে ওঠে, 'যাব, একশবার যাব! আমাদের বিপদের দিনে মহাদেবরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা যাব না?'

কাজল কিছু বলে না। তার রক্তের মধ্যে কেমন একটা আবেগ আসে। পাড়ার মানুষগুলো একটু একটু করে ভয় জয় করছে। দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যাচ্ছে। নিশিন্দার মুচিবাউড়িবাগ্দিদের আর শুধুই চোর বলে ভাবে না তারা। রাতের বেলা সন্দেহকুটিল চোখে তাকায় না নিশিন্দার নামুপাড়ার দিকে। আসল চোরের সন্ধান তারা পেয়ে যাচ্ছে। আপন অভিজ্ঞতায় শত্রুমিত্র চিনছে। হঠাৎ পাড়া কাঁপিয়ে খুশির উচ্ছ্বাসে ডাক দেয় কাজল—'মহাদেব ভাই হো-ও-ও-ও!'

ধানমাঠ থেকে অনেকগুলো গলা একসঙ্গে গম গম করে ওঠে, ‘ভয় নাই বাবু, জেগে রয়েছি ই-ই-ই।’

নগেনবাবু ছাদে ওঠে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টর্চ ফেলেন। সরোজের চোখেমুখে আলো এসে পড়ে। আলোতে উদ্যত বন্দুকের নল চক চক করে। নগেনবাবু অনেকক্ষণ আলোটা তার দোনলা বন্দুকের উপর ফেলে রাখেন।

ঘুম ভেঙ্গে ঘোষালমশাই বারান্দায় এসে হাঁক দেন, ‘কি হ’ল? এত গোলমাল কিসের? কে রাত জাগে আজ?’

ও-পাশ থেকে ঘুম-ভাঙা গলায় চন্দ্রবাবুও চিৎকার করেন, ‘কি হ’ল? চেঁচায় কে?’

কাজলেরা উত্তর দেয়, ‘আমরা, রাতজাগার দল। ভয় পাবেন না কেউ। ঘুমোন আপনারা, নির্ভাবনায় ঘুমোন—’

কিন্তু ঘুমোতে চাইলেই নির্ভাবনায় কি ঘুমুতে পারে ডাঙাপল্লীর নিম্নবিত্ত মানুষেরা। এইসময় এই দেশে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন ঘুম কি এত সহজ। সমস্যা তো শুধু চোরের নয়, হাজার সমস্যা। অন্তহীন সমস্যার ভারি পাহাড় সকলেরই বুকের উপর। যত দিন যায় সমস্যার নখদন্ত ততই বিস্তৃত হয়। পরিত্রাণের পথ নেই—সমাধানের সূত্র জানা নেই। বাজের মুখে নরম পাখির মত অসহায় শিকার তারা। থেকে থেকে রাতের ঘুম যায় ভেঙ্গে। ভয়ে-ভাবনায় শুকিয়ে ওঠে বুক। সেই ভয়-ভাবনা নিশিন্দার বুধনদের দলবদ্ধ আক্রমণের আশঙ্কার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

ঘোষালমশাই সারারাত ছটফট করেন। তাঁর সংসারের এখন অচলাবস্থা। পেন্সনের সামান্য টাকায় আর কিছুতেই দু’বেলার আহার জোটে না। গতমাসে একটা গরু বিক্রি করেছেন। জটাধারী কিনে নিয়েছে সেটা। সামনের মাসে হয়ত দ্বিতীয় গরুটাও বিক্রি করতে হবে। তারপর? কি দিয়ে কি করবেন? শেষপর্যন্ত কি বাড়িখানা বিক্রি করে স্ত্রীকন্যার মুখে অন্ন যোগাতে হবে তাকে?

পারুলের বিয়ের ভাবনা এখন আর ভাবেন না। মেয়েটার ক্লান্ত ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে এখন তাঁর প্রতিদিনের ভাবনা, পেট ভরে আজ ভাত খেয়েছে তো পারুল? কাল রান্না করার মত চালডাল আছে তো ঘরে? পারুল যদি বলে, 'বাবা, নেই তো!' তাহলে কি দিয়ে কি আনবেন তিনি কাল?

জটিল সারারাত ছটফট করে তার দোকানখানার কথা ভেবে। সামান্য পুঁজিতে কি ব্যবসা হয়! সারাদিনে যেটুকু বিক্রি হয় সংসারের গর্ভে যায়। নতুন মাল কেনার পয়সা জমে না। মহাজনের ঘরে দেনার উপর দেনা জমছে। শেষপর্যন্ত কি দোকানখানা তুলে দিতে হবে তার হাতে? তারপর মহাজনের বাঁধা-মাইনের চাকর হয়ে থাকতে হবে তার নিজেরই হস্তান্তরিত দোকানে?

উৎপলের ঘুম আসে না তার চাকরির কথা ভেবে। অস্থায়ী চাকরি ছিল তার। এখন ছাঁটাইয়ের কথা শোনা যাচ্ছে। একবার ছাঁটাই হয়ে গেলে নতুন করে কোথায় চাকরি পাবে সে? কে দেবে?

এমন কি নিমু যে নিমু সেও এখন রাতের বেলা ভাল ঘুমোতে পারে না। বাড়িখানার জন্য চিন্তিত থাকে সে। নগেন আর নকুল পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে অনেক দেনা বের করেছে তার বাপের। ইটের দাম, বাঁশখড়ের দাম। সঙ্গে মা'র দেনা তো আছেই। বারোশ টাকা এখন তিন-হাজারে ঠেকেছে। তার উপর নগেন সুদের হিসেব কষছে। নিমুর এখন ইচ্ছে করে নগেনটার বুকেপিঠে ছুরি চালাতে। কিন্তু এত সাহস তার নেই। আর ক'মাসের মধ্যেই বাড়িটা ছেড়ে কি নিশিন্দায় উঠে যেতে হবে তাকে? নিশিন্দার মা-বাপ মরা একটা মেয়ের সঙ্গে ভাবভালবাসা হয়েছে। নিমু তাকে বিয়ে করবে বলেছে। কিন্তু বাড়িঘর থেকে উৎখাত হয়ে গেলে বউ এনে কোথায় রাখবে সে?

এসব রকমারি ভাবনাচিন্তার সঙ্গে জেলার দ্রুত পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থাও রাতের ঘুম কেড়ে নেয় তাদের। নাইট-গার্ডের অবস্থাও ক্রমশ বে-সামাল হয়ে ওঠে।

থানা থেকে জরুরী চিঠি আসে সরোজের বাবার নামে। সাইকেল নিয়ে একজন পুলিশ এসে চিঠি ধরিয়ে দিয়ে যায়। চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যে বন্দুক জমা দিতে হবে থানায়। জেলার অবস্থা ভাল নয়। এখানেওখানে বন্দুক ছিন্‌তাই হচ্ছে। অবিলম্বে বন্দুক জমা দাও। তোমার এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে এই ব্যবস্থা। নাইট গার্ডের নাম করে বন্দুক নিয়ে বেআইনী ও বিপজ্জনকভাবে রাতের বেলা সরোজ বাইরে ঘোরাফেরা করে—এই রিপোর্টও থানায় আছে। চিঠিতে তার উল্লেখ থাকে। অতএব আর দেরি নয়, অবিলম্বে বন্দুক জমা দাও।

বিকেলে অফিস থেকে ফিরে সরোজের মুখ শুকিয়ে যায়। যেন একখানা হাত কেটে ফেলার হুকুম এসেছে তার সরোজের বাবা আগেই চিঠি পড়েছেন। ইজি-চেয়ারে শুয়ে-থাকা অবস্থায় বলেন, 'কি করবি খোকা?'

সরোজ অসহায়ভাবে বলে, 'কি করব?'

সরোজের বাবা বলেন, 'চিঠির যে-রকম ভাষা দেখছি, জমা না দিয়ে তো উপায় নেই!'

সরোজ ঠোঁট কামড়ে বলে, 'হ্যাঁ, কড়া হুকুম। আমাদের নিরাপত্তার জন্য!'

সরোজের বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, 'বন্দুকটা কোথায় আছে খোকা?'

'উপরের ঘরে।'

'একবার আনবি?'

'কেন?'

'অনেকদিন দেখিনি। একবার দেখব।'

বাবার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে সরোজ কিছু বুঝতে পারে। বলে, 'আনছি, বাবা।'

বন্দুক এনে বাবার কোলে শুইয়ে দেয় সরোজ। তাঁর ডানদিকটা একরকম অসাড়। মুখখানাও বেঁকে গেছে। বাঁ হাত দিয়ে বন্দুকটা

নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। পরম স্নেহে তার শরীরে হাত বোলান। সুখে দুঃখে এই বন্দুক তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের সঙ্গী। কত স্মৃতি, কত ঘটনা জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। বন্দুকে হাত রেখে চোখ তুলে ঘরের দেয়াল দেখেন। দরজার ঠিক উপরেই শিংওলা একটা হরিণের মাথা। ও-পাশে আরো একটা। বাঁ দিকে ডোরাকাটা বাঘের লোমওলা চামড়া টান টান করে কাঠের ফ্রেমে লাগানো আছে। হঠাৎ ঘরে ঢুকলে মনে হবে দেয়ালের উপর থেকে একটা ছোট চিতাবাঘ ঝাঁপিয়ে নামছে। বাঘের মাথাটা এ-ঘরে নেই। সরোজ সেটা উপরে নিজের ঘরে নিয়ে রেখেছে। সরোজের বাবা বন্দুকে হাত বোলান আর হরিণের মুখ বাঘের চামড়া দেখেন। কত ঘটনা কত স্মৃতি ভেসে ওঠে। যেন অস্পষ্টভাবে সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল থেকে হরিণের ডাক, বাঘের গর্জন শুনতে পান তিনি। মনে পড়ে, সরোজকে একদিন নিজের হাতে তিনি বন্দুক চালানো শিখিয়েছিলেন। যৌবনে নববিবাহিতা বধূকেও শেখাতে চেয়েছিলেন। ফরেস্ট-অফিসের বাংলোর ছাদে উঠে জ্যোৎস্নার আলোছায়ায় তরুণী স্ত্রীর হাতে বন্দুক দিয়ে বলেছিলেন, 'শেখো! শিখে রাখা ভাল। বনেজঙ্গলে বাস আমাদের, কখন দরকার লাগে বলা তো যায় না।' সরোজের মা'র ওই বন্দুক-শেখা নিয়ে কত কাণ্ড, কত কৌতুক!

সরোজের বাবা স্মৃতিভারে চোখ বুজে বসে থাকেন।

সরোজ চিন্তিত বিমর্ষভঙ্গিতে বাইরে আসে। বুধনের বুকে সে বন্দুক ঠেকিয়েছিল। সে কথা বুধন কি কখনো ভুলবে! শোধ সে তুলবেই। কিন্তু সরোজ ভয় পায় নি। শশাঙ্ক কিংবা জটিলের মত ভীতু নয় সে। কিন্তু তার মনের জোরটা ছিল আসলে বন্দুকের জোর। এখন কেমন ভয়-ভয় করতে থাকে। ক্লান্তভঙ্গিতে সে এসে দাঁড়ায় ঘোষালমশায়ের বারান্দায়।

ঘোষালমশাই বলেন, 'কি সরোজ? মুখখানা শুকনো কেন?'

সরোজ বলে, 'বড় বিপদ মেসোমশাই। থানা থেকে বন্দুক জমা দেবার হুকুম এসেছে।'

শুনে ঘোষালমশায়ের মুখেও চিন্তার ছায়া পড়ে, 'সে কি কথা? পাড়ায় একটা মোটে বন্দুক। আপদেবিপদে আমাদের বলভরসা। থানা থেকে চেয়ে পাঠায় কেন? কি মতলব?'

সরোজ বলে, 'জেলায় নাকি ভয়ানক সব কাণ্ড হচ্ছে। স্কুলকলেজ পুড়ছে। পুলিশমহাজন খুন হচ্ছে। বন্দুক ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে! এ জন্যই নাকি রাখা যাবে না আর—'

ঘোষালমশাই পরিষ্কার করে কিছু বুঝতে পারেন না। তিনি তো রাজনীতি করেন না। বাড়ি থেকে শহরেও যান না বড় একটা। কাগজ রাখার সামর্থ্য নেই বলে কাগজও রোজ পড়া হয় না। পাড়ায় কাগজ আসে তিন-চার ঘরে। নগেনবাবু রাখেন, চন্দ্রবাবু রাখেন, আর আসে শশাঙ্কর ঘরে। ঘোষালমশায়ের ইচ্ছে হলে শশাঙ্ক কিংবা চন্দ্রবাবুর ঘর থেকে দু'তিনদিনের বাসি কাগজ আনিয়ে পাতা ওল্টান। তাতে দেশ-কাল-রাজনীতির চেহারা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় না। আজ বন্দুকের প্রসঙ্গে তিনি সরোজকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে থাকেন। যারা স্কুলকলেজ পোড়াচ্ছে, জোতদারমহাজন খুন করছে, বন্দুক ছিনতাই করছে—তারা কারা, কোন্ দলের, কি তাদের রাজনীতি জানতে চান। সরোজ যেমন জানে, যেমন বোঝে উত্তর দেয়। ঘোষালমশাই বলেন, 'এ সব তো সাংঘাতিক ব্যাপার সরোজ। এর পরিণাম কি?'

সরোজ বলে, 'জানি না। কেউ জানে না। কিন্তু ক'দিন থেকে এই শহরের বুকেও ট্রাকভর্তি সি. আর. পি নামছে। শুনছি পরে মিলিটারি আসবে। পুলিশ-লাইনের বড়মাঠটা মিলিটারির তাঁবু পড়বে বলে সাফসুফ করা হচ্ছে—'

সি. আর. পি, মিলিটারির কথা শুনে ঘোষালমশাই অবাক হয়ে যান। এ তো রীতিমত যুদ্ধের প্রস্তুতি! এই জেলার বুকেও একটা যুদ্ধ কি আসন্ন?

ঘোষালমশাই কেমন দিশেহারা ভঙ্গিতে সরোজের দিকে তাকান, 'এসবকিছু আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না বাবা! একবার কাজলদের ডাকো—'

সরোজ বলে, 'ডেকে কোনো লাভ নেই মেসোমশাই। থানা থেকে বড় কড়া চিঠি এসেছে। চব্বিশঘণ্টা সময়। জমা না দিলে ওরাই নিয়ে যাবে এসে!' ঘোষালমশাই ক্ষুব্ধ বিচলিত গলায় বলেন, 'কেন আমাদের বন্দুকখানায় এত কি দরকার ওদের!'

সরোজ বলে, 'আমাদেরই নিরাপত্তার জন্য!'

ঘোষালমশাই হঠাৎ রেগে ওঠেন, 'থানাপুলিশের কথা রাখ। আমাদের নিরাপত্তা আমাদের হাতে। বন্দুক তুমি দিও না। পাড়ার সবাই মিলে দরখাস্ত করব আমরা—'

সরোজ ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে, 'তাতে কোনো লাভ হবে না মেসোমশাই! যেদিন চালের গাড়ি ধরেছি সেদিন থেকেই এ বন্দুকের উপর নজর পড়েছে ওদের—'

রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে সরোজ ছটফট করে। তার সাতাশ বছরের যৌবনের রক্তে যেন জ্বালা ধরে যায়। চব্বিশ ঘণ্টা পার হতে আর রাতটুকু মাত্র বাকি। সকালে উঠেই বন্দুক জমা দিয়ে আসতে হবে থানায়। নিজের হাতে নিজের আত্মরক্ষার, গৃহরক্ষার অস্ত্রটুকু তুলে দিতে হবে তাদের হাতে—যারা সরোজদের মরাবাঁচার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন! দু'দিন পরে বুধনেরা দলবেঁধে এপাড়া আক্রমণ করলে, আগুন লাগিয়ে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিলে, হাটতলার সেই মেয়েটির মত তার বাড়ির মেয়েদের ধানমাঠে উঠিয়ে নিয়ে গেলে—কে বাঁচাতে আসবে? থানা থেকে পুলিশের গাড়ি নিয়ে ছুটে আসবে কি ভূষণ সমাদ্দার? আসবে না। কোনোদিন আসে নি। এই দেশে এই সময়ে সরোজের মত সাধারণ নাগরিকদের রক্ষার দায়িত্ব আর রাষ্ট্রের হাতে নেই। বরং দেশের শরীর থেকে শেয়াল শকুনের মত যারা মাংস খুবলে খেতে চায় সেই বৃন্দাবন সরকার আর নকুল সরকারদেরই রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে তারা। সেদিন কেমন চালাকি করে চালের গাড়িদুটো বাঁচিয়ে থানায় নিয়ে গেল। তারপর তুলে দিল আবার বুধনদেরই হাতে। কার নামে মামলা হ'ল? কে গেল

হাজতে? কেউ গেল কি! মাঝখানে সদানন্দের পিসী মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরাল। ওই ধর্ষিতা বাতাসীর বিষয়টারই বা কি হ'ল? শরৎমাস্টার তো গিয়েছিলেন থানায়। ডাইরী করেছিলেন বুধনদের নামে। কেউ কি কিছু করল? এই বর্বর, পক্ষপাতযুক্ত থানাপুলিশের হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে আসবে সে? কেন দেবে? কার স্বার্থে, কার নিরাপত্তার জন্য? ওই বন্দুকের গুলিই তো তার বুকে এসে বিঁধবে একদিন। হয়ত থানা থেকে ওই বন্দুকখানা নিয়েই বুধন তার বাড়ির উপর হামলা করতে আসবে! সরোজের অস্ত্র সরোজেরই বুকে ঠেকিয়ে হাসবে হা হা করে। বলবে, 'এবার শালা কোথায় যাবি? কোন্ বাপ্ বাঁচাতে আসবে তোকে?'

যেন বুধনের কদর্য হাসিটা তার কানের কাছেই সশব্দে বেজে ওঠে। সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে যায় সরোজের। সারা মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একটা নিষ্ফল আক্রোশের আগুন জ্বলতে থাকে মাথায়। সে বুঝতে পারে, যেদিন ভূষণ সমাদ্দার তার বন্দুকের লাইসেন্স নিয়ে গেল সেদিন থেকেই বন্দুক নেবারও চক্রান্ত করেছে তারা। আর এই চক্রান্তের মূলে নগেন চৌধুরীও আছে। সরোজের চকিতে মনে পড়ে, সেদিন অনেকক্ষণ ধরে আলো ফেলে তার হাতের উদ্যত বন্দুক দেখছিল নগেন চৌধুরী।

কিন্তু সরোজের কি করার আছে! বন্দুক তো কাল জমা দিতেই হবে থানায়। তার বাবা, ঘোষালমশাই ওই পরামর্শই দিয়েছেন। চন্দ্রবাবু, শশাঙ্ক, কাজল সকলেই ওই কথাই বলে গেছে। রাত ন'টা-দশটায় একে একে অনেকেই এসেছিল তার বাড়িতে। ঘোষাল-মশায়ের কাছে খবর পেয়ে দুশ্চিন্তায় মুখ কালো করে এসেছিল। সকলেই রুষ্ট, সন্ত্রস্ত কিন্তু নিরুপায়। থানার হুকুম অমান্য করার কথা কেউ বলে নি। সরোজ কি করবে! কি করার ক্ষমতা আছে তার!

গভীর রাতের অন্ধকারে বিছানায় চোখ ফেটে যেন জল আসতে চায় সরোজের। তার শিয়রের দিকে দেয়ালে বাঘের একটা মাথা জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে জেগে থাকে। তার ঠিক নীচেই বন্দুকটা

দাঁড় করানো থাকে ঘরের কোণে। হাত বাড়ালেই তাকে ছুঁতে পারে সে। পাশেই গুলির বাক্স। চালের গাড়ি ধরার পর থেকে বন্দুকটা সে হাতের খুব কাছেই রাখে। কাল থেকে আর থাকবে না। বুকের মধ্যে যেন প্রিয়জন-হারানোর ব্যথা অনুভব করে সরোজ। সে জোতদার নয়, মজুতদার নয়, নকশালবাড়ি-আন্দোলনের সঙ্গেও তার কোনো যোগ নেই—বন্দুক নিয়ে সে একদিন বাঘ শিকার করতে যাবে, উপস্থিত আত্মরক্ষার অতিরিক্ত এটুকুই মাত্র তার স্বপ্ন! থানার চিঠি সরোজের সবকিছু বিপর্যস্ত করে দেয়। অস্থির বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহী মন নিয়ে নির্ঘুম চোখে সে ছটফট করতে থাকে।

তারপর অনেকটা সময় পার হয়ে গেলে ভোররাতের দিকে অকস্মাৎ তার দরজায় কেউ আঘাত করে। মৃদু টোকা দেওয়ার শব্দ। দোতলায় ছোট একটিমাত্র ঘর। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। পয়সা, সিমেণ্ট ও লোহার অভাবে পাকা সিঁড়ি করা হয় নি। বছর তিনেক আগে ওই ঘরটা তুলেছে সরোজ। ঘরের সামনে খোলা ছাদ। ও-পাশে আমকাঁঠালের গাছ। যে-কেউ গাছ বেয়ে উপরে উঠে আসতে পারে। পাঁচিল টপকে উঠোনে নেমে ভেতরের বারান্দায় এসে কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উপরে ওঠা যায়। সরোজ ঘুমিয়ে পড়েছিল। এবং ঘুমের মধ্যে সুন্দরবনের ঘন-অরণ্যে বাঘ শিকারের একটা অদ্ভুত স্বপ্নও বুঝি দেখছিল। শীতের জন্য জানালাগুলো বন্ধ। বাইরের শব্দ ভেতরে এসে অস্পষ্টভাবে ঘুরপাক খায়। কিছুক্ষণ পরে সরোজ জেগে ওঠে। কে ডাকে? এখন রাত কত? সরোজ কিছু বুঝতে পারে না। তার বালিশের তলায় টর্চ থাকে। টর্চ জ্বেলে সকলের আগে সে বন্দুক দেখে। বন্ধ দরজার বাইরে আবার শব্দ হয়। চাপাগলায় কেউ ডাকে, 'সরোজদা! সরোজদা!'

গলাটা চেনা চেনা মনে হয়। অথচ ঠিক বুঝতে পারে না। রাতজাগা দলের কেউ কি? কারা ডিউটি দিচ্ছে আজ? কেউ দিচ্ছে কি? রাতে কাজল যেন বলছিল, ডিউটি দেবার লোক পাওয়া

যাচ্ছে না। সরোজ উঠে দাঁড়ায়। দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, 'কে? কে ডাকে?'

বাইরে থেকে উত্তর আসে, 'আমি মানস। তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন।'

সরোজ ভীষণ অবাক হয়ে যায়। এতক্ষণে গলাও চিনতে পারে সে। মানসই বটে। ক'মাস আগে পাড়ায় এসে'ছিল। একসঙ্গে রাত জেগেছে। সরোজের নিজস্ব এই ঘরটিতে এসে অনেকক্ষণ গল্পও করে গেছে। বড় বুদ্ধিমান মেধাবী ছেলে মানস। সে হঠাৎ এমন সময় ডাকে কেন! তারপর হঠাৎ-ই মনে পড়ে, ভূষণ সমাদ্দার সেদিন খোঁজ করছিল মানসের। কেন? কি করেছে মানস? পুলিশ তাকে খোঁজে কেন? সরোজ কিছু বুঝতে পারে না। বলে, 'তুমি হঠাৎ এত রাত্রে?'

'রাত কোথায়? ভোর হয়ে আসছে। দরজা খুলুন।'

সরোজের মন নানাকারণেই অস্থির। আর বিশেষ কিছু ভাবার সুযোগ পায় না সে। হয়ত প্রয়োজনও মনে করে না। দরজা খুলে দেয়। আর তৎক্ষণাৎ তার নিজের হাতের টর্চের আলোতে স্পষ্ট দেখে, মানস একা নয়, আরো তিনজন ছেলে, মানসেরই বয়সী তারা, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে ছাদের উপর। মানসের হাতে উদ্যত রিভলবার। সরোজ কিছু না বুঝেও ভয়ে কেঁপে ওঠে। মানস রিভলবারটা সরোজের বুকের কাছে উঁচু করে ধরে বলে, 'প্লিজ্ সরোজদা, চেঁচাবেন না। আপনার বন্দুকটা দিন—'

ঘটনার আকস্মিকতায় সরোজের কথা জড়িয়ে যায়, কাঁপা গলায় বলে, 'একি! তুমি! হাতে পিস্তল! আমার বন্দুক নেবে কেন তুমি!'

মানস বলে, 'বন্দুকই তো শক্তির উৎস সরোজদা। আমাদের আরো বন্দুক চাই, অনেক বন্দুক। আপনি কথা বলবেন না, বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন।'

সরোজ দেখে শুধু মানসের হাতে নয়, তার পেছনে যে দাঁড়িয়ে আছে তার হাতেও উদ্যত পিস্তল। একজন এগিয়ে এসে সরোজের

হাত থেকে টর্চটা ছিনিয়ে নেয়। তারপর ঘরে ঢুকে আলো ফেলে বন্দুক আর গুলির বাক্স তুলে আনে। মানস চাপাগলায় বলে, 'ভাঁজ করে কাগজ আর চট দিয়ে মুড়ে ফেল, কুইক্—'

সরোজ প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'না। নিও না। নিও না।'

মানস বড় নিষ্ঠুরভাবে তার বুকে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে চাপ দেয়। অন্ধকারে তার কটা-চোখ বাঘের মত জ্বলে। সরোজের সারা শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। চিৎকার করা দূরে থাকুক, তার কথা বলার শক্তিটুকুও লুপ্ত হয়ে যায়। একটুপরেই মানসেরা তাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজার শেকল তুলে দেয়।

আকাশে কড়্ কড়্ শব্দে মেঘ ডেকে ওঠে। বিদ্যুতের বিশাল অগ্নিবর্ণ চাবুক দিক্‌দিগন্তে আছড়ে পড়ে। চরাচর কাঁপিয়ে বজ্রপাত হয়। অকালের মেঘ, অকালের বর্ষণ। বৃষ্টির সঙ্গে শিলও পড়তে থাকে। আর হু হু করে বইতে থাকে ঠাণ্ডা বাতাস। মাঠ থেকে সব ধান এখনো গোলায় ওঠে নি। তবে ডাঙ্গাপল্লীর চারদিকে আর ধান নেই। রুক্ষ মাঠে সদ্য-কাটা ধানের গোড়াগুলো মাথা উঁচিয়ে আছে। শিলগুলো মাঠে পড়ে ছিটকে যায়। কোথাও একসঙ্গে স্তূপাকারে জমে ওঠে। তখন রৌদ্রদগ্ধ তামাটে মাঠের বুকে সাদা জমাটবাঁধা বরফের টুকরোগুলোকে মনে হয় মড়ার মাথার খুলি।

ঘোষালমশাই শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলেন, 'যদি বর্ষে আগনে রাজা যায় মাগনে। বুঝলে কালীর মা, এবার দুর্ভিক্ষে দেশ উচ্ছন্নে যাবে।'

পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা স্মরণ করেন তিনি। তখন তার যৌবন-কাল। চোখের সামনে কত মানুষ মরতে দেখেছেন। লঙ্গরখানায় একহাতা খিচুড়ির জন্য কত মানুষকে পাগলের মত ছুটতে দেখেছেন। গ্রামের মানুষ সব। একমুঠো অন্নের জন্য শহরে এসে ছিটকে পড়েছে। না-খেয়ে রাস্তার বুকেই মরে থেকেছে।

স্নেহলতা বলেন, 'দুর্ভিক্ষের আর বাকি কি! ক'দিন পেট পুরে ভাত খাও তোমরা!'

পারুল কথা বলে না। একখানা শাড়ি ভাঁজ করে গায়ে জড়িয়ে হাঁটুর উপর মুখ নামিয়ে চুপ করে বসে থাকে। ঘরের চালডালের খবর তার চেয়ে আর বেশি কে জানে! আসন্ন দুর্ভিক্ষের আঁচ তো তার ঘরেই!

আকাশের জলঝড়বর্ষণ একদিনেই থামে কিন্তু জেলার বুকে রাজনীতির প্রমত্ত ঝড় ওঠে। সারা জেলায় অতিক্রুত নকশাল-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। যার সম্ভাবনায় কাজল একদা আশঙ্কিত হয়েছিল রাজনীতির সেই প্রলয়ঙ্কর রক্তমেঘ রাঢ়ের লালমাটির বুকে গ্রামেগঞ্জে অরণ্যেপাহাড়ে রক্তের ধারাবর্ষণ শুরু করে। একটার পর একটা জোতদার খুন হতে থাকে, মহাজনের গলা কাটা যায়, নলহাটি মল্লারপুর রাজনগরে থানা আক্রান্ত হয়, পর পর পুলিশ খুন হয় ক'টা, রাইফেলের সঙ্গে বন্দুকের লড়াই বাঁধে মুখোমুখি। রাজনগরের শাল বনে আর নলহাটিতে ললাটেশ্বরী দেবীর মন্দির ঘিরে পাহাড়ের বুকে রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধই হয়ে যায়। এই শহরের বুকেও মানুষ খুন হয়, স্কুল-কলেজ পুড়ে যায়, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মহামারীর মত। ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ নামে। কলকাতা থেকে ছুটে আসে মিলিটারি! শহরের বুকে পুলিশ-লাইনের বড় মাঠে মিলিটারির তাঁবু পড়ে। রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত বিশাল 'রবীন্দ্রভবন' হয়ে ওঠে সি. আর. পি-র ব্যারাক। রাতের অন্ধকারে রাইফেল গর্জে ওঠে, পাগলা ঘণ্টা বাজে, সার্চলাইট জ্বালিয়ে ছুটে যায় সি. আর. পি-র গাড়ি। একেকটা গ্রাম ঘিরে ফেলা হয় একেকদিন। ঘরে ঘরে খানাতল্লাশি হয়। রাত শেষে কয়েকটা মৃতদেহ পাওয়া যায় কোপাই কিংবা বক্রেশ্বরের তীরে, ময়ূরাক্ষীর শুকনো বালুচরে।

এখন সন্ধ্যা নামতে না নামতেই শহরের পথঘাট নির্জন হয়ে যায়, রাত দশটা বাজতে না বাজতে কার্ফু জারি হয়। তারপর ঝাঁক বেঁধে নেমে পড়ে পুলিশ। দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ে।

বেয়নেটের খোঁচায় নিরীহ গৃহস্থের বিছানাবালিশ ছিঁড়ে যায়, জিনিষপত্র ভেঙ্গে চুরমার হয়। টাকা পয়সাগয়নাপাত্তির খোঁজ পাওয়া যায় না। ঘরের মেয়েবউরা ঠকঠক করে কাঁপে। বুড়ো-বুড়িরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ছেলেদের কেউ হাজতে যায়, কেউ মার খেয়ে গোঙায়। মধ্যরাতে শহরের বুকে কোথাও প্রচণ্ড শব্দে বোমা পড়ে। ক্রেকার ফাটে। এই ডাঙ্গাপল্লী থেকেও শোনা যায় তার শব্দ। রাইফেলের গর্জনও শোনা যায় সঙ্গে সঙ্গে। সকালে কোনো যুবকের টাটকা তাজা মৃতদেহ পড়ে থাকে কালো পীচের রাস্তায়। সন্ধ্যা বেলা তার বদলা হিসেবে আরো একটা পুলিশ খুন হয়ে যায়।

শ্বেত-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাল-প্রতিরোধের অতর্কিত শ্লোগান ওঠে। হাতে হাতে গোপনে ছড়িয়ে যায় লাল-ইস্তাহার। কারা ছড়ায় কখন ছড়ায়, বোঝা যায় না। শহরের প্রেসগুলিতে খানাতল্লাশি হয়। ছুবরাজপুরের কাছে ট্রেন থামিয়ে জিনিসপত্র ওলটপালট করে কামরাগুলো সার্চ করে সি. আর. পি। হঠাৎ-হঠাৎ বাস থামিয়ে তার উপরেও ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ।

সরোজকে এখন মাঝেমাঝেই থানায় যেতে হয়। শহর ছেড়ে বাইরে যাওয়ারও হুকুম নেই তার। দু'একদিন থানায় না গেলে পুলিশের জীপগাড়ি ছুটে আসে তার বাড়িতে। অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে থানায় তুলে নিয়ে যায়। সেখানে ভূষণ দারোগা চেয়ারের উপর জুতোসমেত পা তুলে রেখে হাতের থাবায় হিংস্র ভঙ্গিতে রিভলবার নাচাতে নাচাতে বলে, 'নাম বলুন, নাম বলুন। কারা এসেছিল বাড়িতে?'

সরোজ বিবর্ণমুখে উত্তর দেয়, 'আমি চিনি না।'

'চেনেন না? ক'জন এসেছিল? কেমন দেখতে? বয়স কত?'

'অন্ধকার ছিল। বুঝতে পারি নি।'

'বুঝেছেন। সব জানেন। সব বোঝেন। ন্যাকা সাজবেন না, সত্যি করে বলুন কারা এসেছিল—'

'আমি জানি না।'

'রাস্কেল! হিপোক্রাট! নিজেই ডেকেডুকে বন্দুকটা তুলে দেন নি তো ওদের হাতে?'

'না।'

'না? এখনো বলুন! প্রাণের মায়া নেই আপনার?'

'বিশ্বাস করুন—'

'বিশ্বাস? কোনো বাঞ্চোতকে এখন বিশ্বাস করি না আমরা। রাইফেলের মুখে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মাথার খুলি ঝাঁঝরা করে দেব। গরম সাঁড়াশী দিয়ে গায়ের মাংস খুবলে নেব। এখনো বলুন, নাম বলুন—' বলতে বলতে হিংস্র ভঙ্গিতে জ্বলন্ত সিগেরেটের টুকরো সরোজের গলার নরম মাংসে চেপে ধরে ভূষণ। সরোজ আর্তনাদ করে ওঠে। তার সারা শরীর থর থর করে কাঁপতে থাকে। ভূষণ চুলের মুঠি ধরে সরোজকে দাঁড় করায়। তারপর দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, 'আজ যান। কাল আবার আসবেন। পাড়ার মানস গাঙ্গুলীর খোঁজখবর নিয়ে আসবেন। তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে আপনাকে ছেড়ে দেব আমরা—'

সরোজ ফিরে আসে। ভয়ে-ভাবনায় আতঙ্কে-উত্তেজনায় অত্যাচারে-অপমানে তার জ্বর এসে যায়। প্রবল জ্বর। সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁপতে থাকে। হাতে পায়ে খিঁচ ধরে। চোখ আলতার মত রক্তবর্ণ। দু'তিনটে লেপকম্বল চাপিয়েও কাঁপুনি থামানো যায় না। কাজলের মা সুলেখা ছুটে এসে বলেন, 'জল ঢালুন মাথায়, জল ঢালতে থাকুন। আর হট্‌ওয়াটার ব্যাগ দিন পায়ের তলায়। নেই? আমার ঘরে আছে—'

জ্বরের ঘোরে সরোজ প্রলাপ বকতে থাকে। বলে, 'বাবা আমার বন্দুকটা কই! গুলি ভরে দাও। আমি বাঘ শিকারে যাব।' কখনো চেঁচিয়ে ওঠে, 'না, নিও না, নিও না, আমার বন্দুক—' কখনো বলে, 'নিয়ে যাও। নিয়ে যাও। থানায় দেব না আমি—'

কিন্তু ভুলেও কখনো মানসের নাম উচ্চারণ করে না।

বাইরের জমিটুকুতে সকাল-সন্ধ্যা প্রাণপণে কোদাল চালান ঘোষালমশাই। একখানা ছেঁড়া লুঙ্গি থাকে তাঁর পরনে, গায়ে ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি, পায়ে টায়ারের চটি। কোদালের উল্টো পিঠ দিয়ে মাটির বড় বড় ঢেলাগুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো করেন, কুঁজো হয়ে বসে ঘাস পাতা কাঁকর বাছেন, ঘরের উঠোন থেকে ছাই আর গোবরসার এনে মিশিয়ে দেন। অল্প পরিশ্রমেই তাঁর শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পাঁচ-সাত-মিনিট কোদাল চালিয়ে দারুণ হাঁপাতে থাকেন তিনি। বুকের খাঁচাখানা হাপরের মত উঠানামা করে। জিভ তালু শুকিয়ে আসে।

পারুল এসে বলে, 'তুমি একটু জিরিয়ে নাও বাবা। আমি দু'কোদাল কুপিয়ে দিই।'

ঘোষালমশায়ের কথা বলার শক্তি থাকে না। বারান্দার সিঁড়িতে উঠে অবসন্নভাবে বসে পড়েন তিনি। পারুল শাড়ির আঁচলখানা পিঠ ঘুরিয়ে এনে কোমরে শক্ত করে গুঁজে নেয়। মাথার খোলাচুল দু'হাতে গুছিয়ে আঁট করে খোঁপা বাঁধে। হাতের দু' গাছা স্টিলের চুড়ি ঠেলে উপরের দিকে তুলে দেয়। তারপর বাঁশের হাতল মুঠো করে ধরে মাটি কোপাতে শুরু করে। রাঢ়ের শক্ত কাঁকুরে মাটি। কিন্তু জল দিয়ে অল্পকাল ভিজিয়ে রাখলে নরম হয়। কালী একটু আগেই ক'বালতি জল ঢেলে দিয়ে গিয়েছে। পারুল এদিকওদিক তাকিয়ে মাটি কোপায়। তার পাতলা নরম শরীরখানা ওঠানামার তালে দোলায়িত হয়। দুইবুকের জমাটবাঁধা নরম মাংস তালশাঁসের মত টলমল করে। হাতেপায়েমুখে গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো জমে। পরিচিত কি অপরিচিত কাউকে বাড়ির দিকে আসতে দেখলেই কোদাল রেখে ছুটে বারান্দায় উঠে আসে সে। বাচ্চা ছেলে কিংবা বুড়োবুড়ী হলে অবশ্য গ্রাহ্য করে না। বুড়োরা তো শিশুদের মতই— দ্বিতীয় শৈশব। যৌবনের লজ্জা যৌবনের কাছেই।

ঘোষালমশাই একটু বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হয়ে বলেন, 'রাখ, পারু, রেখে দে, পায়ে চোট লাগবে—'

পারুল বলে, 'আর একটু বাবা—'

একটুপরে সে-ও হাঁপিয়ে যায়। ফর্সা সুন্দর মুখখানা ক্লান্ত মলিন দেখায়। কোদাল রেখে বাবার কাছে এসে চুপ করে বসে পড়ে। ঘোষালমশাই বিষণ্ণ কাতর স্নেহে পারুলের মাথায় একখানা হাত রেখে বলেন, 'এসব কি তোর কম্ম মা। আর মাটি কোপাস্ নে তুই। আমি বরং কাল জটাধারীকে বলে একটা মুনিষ লাগাব—'

পারুল বলে, 'না বাবা। মুনিষের মজুরি এখন দেড়া হয়েছে। ওইটুকু জমি আমরাই কুপিয়ে নেব।'

মজুরির কথা ওঠায় ঘোষালমশাইও আর কিছু বলেন না। মেয়ে ও বাবা দু'জনেই চুপ করে বসে থাকে। তারপর একসময় পারুল বলে, 'এবার আর পালংটাংং লাগিও না বাবা। ওসব ঘাসপাতার দাম কি? শুধু আলু পেঁয়াজ লাগাও—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'তাই লাগাব, মা।'

একটুপরে সুলেখা আসেন। সরোজের বাড়ি হয়ে আসছেন তিনি। হাসপাতালের একজন বড় ডাক্তার সরোজকে দেখে গেছেন। বলে কয়ে সুলেখাই তার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভিজিট নেন নি শুধু রিক্সাভাড়া দিতে হয়েছে।

ঘোষালমশাই তাঁর কাছে সরোজের খোঁজখবর নেন। বলেন, 'এই সন্ধ্যাবেলা আর বেরুব না। কাল সকালে যাব।' তারপর যেন আপনমনেই বলেন, 'কি দিনকাল যে পড়ল! সোনাদানাগয়না ছেড়ে বন্দুক চুরি! এসব তো শুনি নি কখনো জীবনে—'

অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পাড়ার নাইট গার্ড বন্ধ হয়ে যায়। সরোজের বন্দুক চুরির পর থেকে সবাই কেমন ভেঙে পড়েছিল, তারপর শহর জুড়ে গুলিগোলা কার্ফু শুরু হতেই ভয় পেয়ে যায় সবাই। রাত হলে ঘর থেকে বেরুনো আর কেউই নিরাপদ মনে করে না। নাইটগার্ড নিয়ে আবার ছোটখাটো মিটিং বসে ঘোষাল-

মশায়ের ঘরে। কাজল নিজেই বলে, 'এখন কিছুদিন বন্ধ থাক মেসোমশাই—'

শশাঙ্ক বলে, 'হ্যাঁ, রাতের বেলা পুলিশ-মিলিটারির গাড়ি ছুটোছুটি করে। ওই কবরখানার পাশ দিয়েও যায়। রাতে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে গুলি করতে পারে।'

জটিল বলে, 'হ্যাঁ মেসোমশাই, শুক্কুরবারে কলেজের পেছনে কেঁদার ডাঙাল দিয়ে একটা মুনিষ পচুই গিলে পথ হাঁটছিল। পুলিশের গাড়ি হেঁকে বলল, হুকুমদার, হুকুমদার—'

উৎপল বাধা দিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, 'হুকুমদার না জটিল, হু কাম্ দেয়ার, মানে, কে যায়?'

জটিল ভুরু বাঁকিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'ওই হ'ল . বেশি ইংরেজি ফলিও না তো তুমি। তা সে লোকটা ভয় পেয়ে দৌড়ুতে লাগল, আর অমনি গুড়ুম্ —'

শশাঙ্কমাস্টার বলে, 'আমিও শুনেছি।'

ঘোষালমশাই বলেন, 'রাতজাগার দলটা বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে?'

চন্দ্রবাবু বলেন, 'উপায় কি।'

জটিল কাজলের কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলে, 'আমার টর্চের দামটা এখনো শোধ হয়নি ভাই। দেড়টাকা বাকি—'

কাজল বলে, 'পাবে।'

হতাশ ভঙ্গিতে জটিল বলে, 'আর পেয়েছি! সরোজদার তো ওই অবস্থা। কার কাছে চাইব।'

কাজল একটু রূঢ় চোখে তার দিকে তাকাতেই সে চুপ করে যায়। ঘোষালমশাই বলেন, 'ধানকাটা তো শেষ হয়ে এল। মাঠঘাট খা খা করছে। এখন তো আবার চুরিচামারি শুরু হবে। তা তোমরা যখন বলছ বন্ধই থাক কিছুদিন। কিন্তু ঘরে ঘরে সজাগ থেকো। রাতে হাঁকডাক না করে একা বেরিও না। খালি হাতেও কেউ বেরিও না। যা দিনকাল দেখছি, হাতের কাছে অস্ত্র রেখো।'

বুধনদের কথাও ওঠে। কাজল বলে, 'মতলবটা বোঝা যাচ্ছে না।

এখন ঘাপটি মেরে আছে। ধানের ভাগাভাগি শেষ হলে কি করবে বলা যায় না—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'কি করবে? বাড়িঘর তো আর তুলে নিয়ে যেতে পারবে না। অত ভয় পেয়ো না তোমরা—'

কাজল বলে, 'ভয় আমরা পাই নি মেসোমশাই, কিন্তু সতর্ক থাকার দরকার আছে। রাতের বেলা কিছু হলে সবাই যেন একডাকে বেরোয় সেই কথাটা বুঝিয়ে বলুন সবাইকে—'

ঘোষালমশাই সকলের মুখের দিকে তাকান। তারপর বলেন, 'বেরোবে, সবাই বেরোবে! কিন্তু খালিহাতে যেন বেরিয়ে পড়ো না—'

শহরের বুকে কর্তব্যরত অবস্থায় আরো একজন পুলিশ খুন হলে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ভয়ে সকলের মুখ শুকিয়ে যায়। এখন সন্ধ্যা হতে না হতেই ডাঙ্গাপল্লীর সব লোক সাইকেল নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘরে ফেরে। রাত দশটার পর ঘর থেকে কেউ বেরুতেই চায় না। শহরের বুকেও তখন কার্ফু জারি থাকে।

ঘোষালমশাই তো শহরে বড় একটা যান না। কাগজও রোজ পড়েন না। পাড়ার লোকের মুখে খবর পান। জেলার হালফিলের সংবাদ শুনে চমকে চমকে ওঠেন। দুশ্চিন্তায় তার মুখের চামড়া কুঁচকে যায়। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে ওঠে। সরু সরু আঙ্গুল দিয়ে ঘাড়মাথা ঘষতে ঘষতে বলেন, 'বল কি শশাঙ্ক? আজও পুলিশ খুন হয়েছে? স্কুল পুড়িয়েছে?'

শশাঙ্ক বলে, 'হ্যাঁ, মেসোমশাই। কাল পুড়েছিল সাতটা, আজ পুড়েছে পাঁচটা। সব মিলিয়ে এই একমাসে জেলার সিকি স্কুল পুড়ে গেল। আমাদের স্কুলও বন্ধ হয়ে যাবে শীগ্গির—'

'কেন? স্কুল-কলেজ পোড়ায় কেন ওরা?'

'বলে, এই শিক্ষাব্যবস্থাটা নাকি পচে গলে গেছে। এতে যে যত পড়ে সে তত মূর্খ হয়।'

'মূর্খ হয়? লেখাপড়া শিখলে মূর্খ হয়!' ঘোষালমশাই ঠিক

বুঝতে পারেন না। যেন ধাঁধায় পড়ে যান। তারপরই রেগে উঠে বলেন, 'যত সব মূর্খের কথা! লেখাপড়া শিখলে কেউ আবার কোনোদিন মূর্খ হয়!' তারপর একটু থেমে বলেন, 'পুলিশ খুন তো ভয়ানক কথা! কেন? পুলিশ খুন করছে কেন ওরা?' শশাঙ্কমাস্টার বলে, 'পুলিশও তো খুন করছে ওদের। ধরতে পারলেই ক্যানেলের ধারে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলছে। এদিকে একটা পুলিশ খুন হলে ওদিকে সাতটা নকশাল মরছে।'

একটুপরে উৎপল আসে। দোকান বন্ধ করে জটিলও আসে। এখন সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই দোকান বন্ধ করে দেয় সে। শহরের অন্যান্য দোকানও বন্ধ হয়ে যায়। রাতের বেলা সিনেমার ছবি দেখানো হয় না। লোক আসে না। শিশির কাজ করে সিনেমাহলে। হিসেব রাখা, টিকিট ছাপানো, বিজ্ঞাপন ছাপানো এসবের কাজ। দুপুরের শো শেষ হলে বিকেলের দিকে সে-ও চলে আসে।

জটিল থমথমে মুখে বলে, 'ব্যবসাবাণিজ্য লাটে উঠল মেসোমশাই! ঘোর অরাজক অবস্থা।'

ঘোষালমশাই বলেন, 'কেন? তোমার কি হ'ল?'

জটিল হতাশভঙ্গিতে বারান্দার সিঁড়িতে বসে বলে, 'হতে আর কি বাকি থাকল! সারাদিনে দশটাকার কেনাবেচা নেই। গাঁয়ের মানুষ ভয়ে শহরে আসছে না। হাটতলা খা খা করে। সন্ধ্যা হতে না হতে পথঘাট মরুভূমি। আজও শুনলাম হেতমপুরে খুন হয়েছে দু'জন। চারগাড়ি মিলিটারি গোঁ গোঁ করে ছুটে গেল। নিজের চোখে দেখলাম। হেতমপুর হয়ে ইলামবাজার যাবে—'

স্নেহলতা এসে চুপ করে বসে থাকেন একপাশে। পারুলও ঘন ঘন যাওয়া আসা করে। জেলার বুকে এখন রোজই নানা ঘটনা ঘটছে। উত্তেজক, রোমাঞ্চকর ঘটনা। তার খবর জানার জন্য সকলের মন উসখুস করে। শুনতে শুনতে স্নেহলতা বলে ওঠেন, 'ঘোর কলি! খুনোখুনি রক্তারক্তি করে কলির রাজত্ব শেষ হবে এবার—'

ঘোষালমশাই বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তুমি চুপ কর। যা বোঝ

না—', কথাটা শেষ না করেই জটিলের দিকে ঘুরে তাকান তিনি, জিজ্ঞেস করেন, 'হেতমপুরে কারা খুন হয়েছে?'

জটিল বলে, 'জোতদার মহাজন হবে। ঠিক জানি না। মগের মুল্লুক মেসোমশাই। যে যাকে পারছে খুন করছে। চাষাভূষো কেরাণি দোকানদার—কিছু বাছবিচার নেই।' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার বলে, 'আমার মহাজনটাকেও যদি কেউ খুন করত!'

জটিলের কথার ভঙ্গিতে সকলের মুখেই হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

শিশির বলে, 'অনেক টাকা দেনা করেছ বুঝি জটিল?'

জটিল বলে, 'করতে হয় না, আপনি জমে ওঠে। উইঢিবির মত রোজই বাড়ে, রোজই বাড়ে, তারপর এ-ত বড় পাহাড়! মাল চাইলে মাল দেয় না আর। মুখ ঘুরিয়ে নেয়!'

ঘোষালমশাই বলেন, 'কত টাকা বাকি ফেলেছ জটিল?'

'হাজার তিনেকের কম না।'

হাসি হাসি মুখে উৎপল বলে, 'তাহলে তোমার মহাজনকে খুন করে ফেলাই ভাল!'

জটিল রুষ্টভঙ্গিতে তাকায় উৎপলের দিকে। থমথমে মুখ করে বলে, 'আমার দুঃখ তুমি কি বুঝবে!'

শশাঙ্কমাস্টার বেশ ভেবেচিন্তে বলে, 'মহাজন খুন হলে তোমার দেনা কি শোধ হবে জটিল? পাকা খেরো খাতায় সব লেখা থাকে। মহাজনের ছেলে মহাজন হয়ে বসবে, খেরো খাতা ধরে তোমাকে নিয়ে ফের টানাটানি শুরু করবে—'

জটিল চোখ ছোট করে তাকায় শশাঙ্কর দিকে। যেন মহাজনের লোক বলেই সন্দেহ করে তাকে। ঝোঁকের মাথায় আবার বলে, 'তবু হোক। খুন হোক দু'চারটে!'

উৎপল বলে, 'তোমাকে পুলিশে ধরবে জটিল। ধরে নিয়ে গিয়ে ক্যানেলের ধারে দাঁড় করিয়ে গুলি করবে।'

শুনে জটিলের মুখ তৎক্ষণাৎ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অসম্ভব ভয়

পেয়ে যায় সে। বলে, 'কেন! আমাকে ধরবে কেন! আমি কি করলাম—'

'ওই যে মহাজন খুন করার কথা বলছ—'

'বলেছি তো কি! আমি কি খুন করতে যাচ্ছি? না আমার কথায় খুন হয়ে যাচ্ছে কেউ!'

'পুলিশ ওসব শুনবে না। দেখছ তো সরোজদার অবস্থা—'

সরোজের প্রসঙ্গ ওঠায় অকস্মাৎ সকলের মুখ বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যায়। যেন একটা চাপা আতঙ্ক মুহূর্তে গ্রাস করে সকলকে। সবাই কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে। তাদের পাড়ার বুকেই কিনা এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল! সরোজের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে বন্দুক লুঠ করে নিয়ে গেল কারা। সরোজ চিৎকার করার সুযোগটুকু পর্যন্ত পেল না। অনেকপরে শেকল-বদ্ধ ঘরের ভেতর থেকে তার অস্থির উন্মত্ত চিৎকারে বাড়ির লোক যখন জেগে উঠল, পাড়ার লোক যখন ছুটে গেল—তখন ত্রিসীমানায় দেখা গেল না কাউকেই। বন্দুক নিয়ে ভোররাতের অন্ধকারে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে তারা। ধানমাঠ দিয়ে যায় নি। তখনো নিশিন্দার শেষপ্রান্তে কাটা ধান পাহারার জন্য মহাদেবরা জেগে ছিল। সেদিকে পালানোর সুযোগ ছিল না। পূর্বদিকে ময়ূরাক্ষী নদীর বালি পার হয়ে শালবনের দিকে যেতে পারে। ওই পথে ধানী জমি নেই। পাড়ার লোক প্রথমে ভেবেছিল বুধনদের কাজ। কিন্তু তারা এলে এত সহজে কি রেহাই দিত সরোজকে! তাছাড়া মহাদেবদের জাগ্রত দৃষ্টি এড়িয়ে নিশিন্দা থেকে দলবেঁধে আসাও সম্ভব ছিল না তাদের। কারা এসেছিল, কি ভাবে যে বন্দুকটা লুঠ হ'ল—পাড়ার লোকের কাছে এখনো রহস্যময়। কিন্তু যেভাবেই হোক, এতে সরোজের কি দোষ! পুলিশ কেন থানায় ডেকে অত্যাচার করে তার উপর। কেন গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। জ্বরতপ্ত সরোজ এখনো পড়ে আছে বিছানায়। ঘোষাল-মশাই আজ সকালেও একবার দেখতে গিয়েছিলেন তাকে। তার শরীর শুকিয়ে উঠেছে। মুখেচোখে ভয়-আতঙ্কের একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব।

কথা বলতে যেন কষ্ট হয় তার। চুপ করে নিঃশব্দে শুয়ে-বসে থাকে। যেন গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করে। তার ঘাড়ের কাছে গোলাকার দগ্ধ চিহ্নটা স্পষ্ট দেখা যায়। সে দিকে তাকিয়ে থানা-পুলিশের হিংস্রতায় পাড়ার নিরীহ মানুষগুলো শিউড়ে ওঠে।

ঘোষালমশাই জটিলের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'উৎপল ঠিকই বলেছে জটিল। ওসব কথা না বলাই ভাল। ধরো, তোমার মহাজনটা যদি খুন হয়েই যায়—'

শুকনো মুখে জটিল বলে, 'আর বলব না, মেসোমশাই।'

পাড়ায় এখন কাজলের দেখা পাওয়া মুস্কিল। কখন আসে কখন যায়, টের পায় না কেউ। এমন কি, পারুলের সঙ্গেও যেন দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলার অবসর নেই তার। রোদে পুড়ে-পুড়ে তার মুখ আরো কালো হয়েছে। তৈলাভাবে চুল উস্কোখুস্কো। শীতের বাতাসে চামড়া ফেটে উঠেছে। দিনভর শরৎমাস্টারের সঙ্গে নিশিন্দা-মৌজার গ্রামগুলোতে ঘুরে বেড়ায় সে। নতুন-ওঠা ধানের ভাগ-বাঁটোয়ারার গোলমাল মেটায়, স্টেট্ রিলিফের গম কিংবা মাইলোর জন্য বি. ডি.ও অফিসে মিছিল নিয়ে যায়, চালডালতেলের দাম কমানোর জন্য কৃষক সমিতিকে নিয়ে আন্দোলন করে। মাঠ থেকে ধান উঠে গেছে এখন, গ্রামের হাজার হাজার খেতমজুরের কাজ নেই। ফলে রোজগারও নেই। ঘরে ঘরে অভাব, ঘরে ঘরে অন্নের জন্য হাহাকার। অনেকে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। দাঙ্গা করতে চায়। জেলার নতুন রাজনীতির ঝড়ো উত্তপ্ত বাতাসে উত্তেজিত হয় তাদের মন। রাতের অন্ধকারে কাস্তে নিয়ে তারা মহাজনের গলা কাটতে চায়। একেকটা খুনের খবরে তাদের কোটরগত চক্ষু ঝকমক করে। দুর্ভিক্ষ-তাড়িত বুকের হাড়পাঁজরা ফুলে ওঠে। অন্যদিকে পুলিশ মিলিটারির গাড়ি ছুটোছুটি করে। একএকটা গ্রামের বুকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে একএক দিন। ঘুমন্ত গ্রামবাসীর দরজা ভেঙ্গে ঘরবাড়ি তল্লাশি করে। হাঁসমুরগী ডানা ঝাপটায়। গুলির শব্দে গরুগুলো

ভয়ে দড়ি ছিঁড়ে অন্ধকারে মাঠের দিকে ছুটতে থাকে। প্রাণের ভয়ে উঠ্‌তি বয়সের ছেলেরা পুকুরে ডুবে থাকে, মেয়েরা আত্মরক্ষার, লজ্জারক্ষার আড়াল খোঁজে। সারা গ্রামে আর্ত চিৎকার ওঠে। মানুষের মনোবল ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ক্রমে কৃষকসমিতির অফিসের দরজা খোলার লোক পাওয়া যায় না। পুলিশ-মিলিটারি চলে গেলে গ্রামের বুকে জোতদার-মহাজনের লোকেরা তাণ্ডব করে বেড়ায়। চাষীর ঘর থেকে ধান লুটে নেয়, মেয়েদের শরীর ধরে টানাটানি করে, বাধা দিলে মাথায় লাঠি বসিয়ে, বুকেপেটে ছুরি চালিয়ে খুন করে রেখে যায়। কিন্তু সে খুনের কিনারা করতে পুলিশ-মিলিটারি আসে না।

কাজলের কাছে অন্যরকম কথা শোনেন ঘোষালমশাই। শক্ত কঠিন মুখে সে বলে, 'বক্রেশ্বরের কাছে তাঁতিপাড়ায় আজ তিনজন কৃষক খুন হয়েছে মেসোমশাই। কাল নিশিন্দার কৃষকসমিতির অফিসের তালা ভেঙ্গে সবকিছু রাস্তায় টেনে ফেলে পুড়িয়ে দিয়েছে—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'সে কি কথা। কারা করেছে?'

'ওই খোকন-বুধনেরা। ওদেরই তো পোয়াবারো এখন।'

ঘোষালমশাই ঠিক বুঝতে পারেন না, বলেন, 'কেন? ওদের পোয়াবারো কেন?'

শরৎমাস্টারের কাছে যেমন-যেমন শুনে আসে সেইভাবেই বিষয়টা ব্যাখ্যা করে কাজল। দৃঢ় গলায় বলে, 'ভ্রান্ত রাজনীতির পরিণাম তো এই-ই হয় মেসোমশাই। শেষপর্যন্ত জোতদার-মহাজন আর মিল-মালিকের হাতই শক্ত হয়। কলে কারখানায় ছাঁটাই শুরু হয়ে গেছে। ধর্মঘট নিষিদ্ধ হয়েছে। কথায় কথায় পুলিশ গুলি চালানোর হুকুম পেয়েছে। গণ-আন্দোলনের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—'

চাপাগলায় ফিসফিস করে জটিল জিজ্ঞেস করে, 'আজ ক'টা মহাজন খুন হ'ল কাজল?'

কাজল ঘুরে তাকায় তার দিকে। প্রশ্নের ভঙ্গিতে অবাক হয়ে বলে, 'কেন বল দেখি, জটিলদা?'

জটিল সামলে নেয় নিজেকে। বলে, 'এমনি!'

কাজল বলে, 'বিশপঞ্চাশটা জোতদার-মহাজন খুন করে কি হবে? এটা ব্যক্তিহত্যা, ব্যক্তিসন্ত্রাসের রাজনীতি। যাদের সঙ্গে শ্রমিক নেই, কৃষক নেই—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'ঠিকই তো। সব মানুষকে একসঙ্গে জড়ো করে লড়তে হবে। পাঁচদশজনে হম্বিতম্বি করে কি লড়াই হয়—'

কিছু না বুঝেই জটিল বলে, 'ঠিক কথা মেসোমশাই।'

কাজলের গলা শুনে পারুল বাইরে আসে। চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় জিজ্ঞেস করে, 'ও জটিলদা, আপনি কোন্ দলের?'

জটিল বলে, 'কোন্ দলের মানে?'

'ওই মহাজনের গলাকাটা, না না-কাটার দলে?'

জটিল হেসে দিব্যি পরিষ্কার গলায় বলে, 'আমি সুবিধাবাদী দলের। সেই যে বলে না, পাখি তুমি কার, না যখন যে পোষে তার। মহাজন আমায় দেখলে আমি মহাজনকে দেখব, মহাজন আমার গলায় ফাঁস লাগাতে এলে—'

বলতে গিয়ে থেমে যায় জটিল। পারুল বলে, 'থামলেন কেন? মহাজনের গলায় ফাঁস লাগাবেন?'

জটিল গম্ভীর হয়ে বলে, 'ওসব বলতে নেই! পুলিশে ধরবে।'

কাজল বিরক্ত হয়ে বলে, 'তুমি রাজনীতির কিছু বোঝ না জটিলদা। কেবল বাজে বকবক কর—'

জটিল রাগ করে না। ঘাড় মাথা দুলিয়ে স্বীকৃতি জানিয়ে বলে, 'কি করে বুঝব! শরৎমাস্টারের পাঠশালায় আমার পাঠ মুখস্থ করা হয় নি যে!'

মানসের কথা শরৎমাস্টার, কাজল কিংবা সরোজ সকলেই গোপন রাখার চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত গোপন থাকে না। জেলাপ্রশাসনের তরফ থেকে সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয় তার কথা। সঙ্গে

আরো কয়েকজনের নাম-ধাম বয়স-চেহারার বর্ণনা জেলার কাগজে বের হয়। কলকাতার দু'একটি দৈনিক কাগজেও ছাপা হয়। পুলিশ-কর্তৃপক্ষ সোজাসুজি বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করে তাদের। জীবিত বা মৃত যে-কোনো অবস্থায় ধরে দিতে পারলে মাথাপিছু একহাজার টাকা পুরস্কার দেবার কথাও ঘোষণা করা হয়। তাদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সংবাদ দিলেও অর্থপ্রাপ্তির প্রলোভন দেখানো হয়। ফলে কারো কাছে আর কিছু অজানা থাকে না। কাগজের সংক্ষিপ্ত সংবাদ লোকের মুখে মুখে বিস্তৃত, পল্লবিত হয়। সত্য-মিথ্যা, ঘটনা ও রটনা, বাস্তব ও গুজব মিলিয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী তৈরী হতে থাকে। জটিল দাস ছুটে এসে চোখ বড় বড় করে বলে, 'কি সাংঘাতিক কাণ্ড মেসোমশাই। সেদিন রাজনগরে পুলিশে-নকশালে সেই যে লড়াইটা হ'ল তার নেতা ছিল নাকি আমাদের মানস। হাতে ছিল মেশিনগান......'

শশাঙ্ক এসে বলে, 'হেতমপুরে একরাতেই তিনজন জোতদার খুন হ'ল না মেসোমশাই? সব ওই মানসদের কাজ—'

শিশির সংবাদ আনে, 'রবীন্দ্রভবনের তলায় টাইম্ বোমা রেখে গিয়েছিল মেসোমশাই। মিলিটারি-যন্ত্রে ধরা পড়ে গেল বলে বেঁচে গেল সি. আর. পি-রা!'

ঘোষালমশাই সব শুনে হতবাক্ হয়ে যান। সেদিনের ওইটুকু ছেলে মানস, মাঠময় সাইকেল নিয়ে পারুলের সঙ্গে ছুটোপাটি করে বেড়াত, ঘরে ঢুকে স্নেহলতার কাছে আচার খাওয়ার বায়না ধরত, একটু চঞ্চল ছটফটে কিন্তু বড় উজ্জ্বল মিষ্টি চেহারার ছেলেটা, পড়াশুনায় এত ভাল, বিনয়ী, ভদ্র—এই সেদিনও পা ছুঁয়ে প্রণাম করে গা ঘেঁষে বসে কত কথা বলে গেল—সে কি না মেসিনগান হাতে লড়াইয়ে নেমেছে! তাকে ধরার জন্য দু'তিনশ পুলিশ রাইফেল হাতে ছুটে বেড়াচ্ছে জেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। গ্রামে গ্রামে ঢুকে মিলিটারি তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। তার মাথার জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার। কথাগুলো যেন বিশ্বাস হয় না ঘোষালমশায়ের—

বানানো রূপকথা মনে হয়। কাজলকে আলাদা করে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এসব কি শুনছি কাজল ?'

এখন কাজলের মুখ খুলতে বাধা নেই। সে বলে, 'সব সত্যি মেসোমশাই। মানস পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে নকশাল হয়েছে। এই জেলাতেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে সে—'

ঘোষালমশাই হাঁ করে শ্বাস টানেন, 'কি সাংঘাতিক কাণ্ড সব !'

আঁতকে ওঠেন স্নেহলতাও। তাঁর মনের গভীর গোপনে সঞ্চিত একটা নিবিড় প্রত্যাশার স্বপ্ন এতদিনে যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় ! তীব্র রাগ ও বিরূপতা নিয়ে বলে ওঠেন তিনি, 'মানস ডাকাত হয়েছে ! খুনী হয়েছে। মানুষ খুন করছে ! ছিঃ ছিঃ, কি কাণ্ড !'

স্নেহলতার দিকে তাকিয়ে একটু রূঢ় ভঙ্গিতে প্রতিবাদ করে কাজল, 'না মাসীমা, ওভাবে বলবেন না। মানস রাজনীতি করছে, তবে অন্যধরনের রাজনীতি। ও আপনি বুঝবেন না।'

স্নেহলতা কঠিন গলায় বলেন, 'আমার বোঝার দরকার নেই বাবা। লেখাপড়া ছেড়ে বাপ-মা'র মনে দুঃখু দিয়ে যে-ছেলে মানুষ খুন করে বেড়ায় তার বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল !'

ও-পাশ থেকে পারুল চেঁচিয়ে ওঠে, 'কি বাজে বকছ মা। চুপ কর তুমি।'

কাজল ঘুরে পারুলের মুখ দেখে। স্নেহলতার গলায় 'মরাই ভাল' কথাটা তীরের মত তার কানে বেঁধে। তার সমস্ত অস্তিত্বে যেন একটা ঝাঁকুনি লাগে। এই কি সেই মাসীমা যিনি অভাবের সংসারে মানসকে নিমন্ত্রণ করে এনে যত্ন করে খাওয়াতে চেয়েছিলেন ! অনেকদিন পরে মানসকে পাড়ায় ফিরতে দেখে যাঁর মাতৃহৃদয়ের পুরনো স্নেহস্মৃতি উদ্বেল হয়ে উঠেছিল !

কাজল আর কিছু না বলে কেমন বিতৃষ্ণ মন নিয়ে ফিরে আসে। এইসময় পারুলের তীব্র ঝাঁঝালো গলার 'মা তুমি চুপ কর' শব্দ ক'টিও তার চেতনায় আঘাত করতে থাকে। পারুলের উত্তেজিত রাগ-রাগ মুখটা তার মনের পর্দায় অনেকক্ষণ ধরে ভেসে

থাকে। তার ফলে কাজল আবার একধরণের বিষণ্ণতা ও অস্থিরতা অনুভব করে।

বিকেলে সরোজের বাড়ি যায় সে। উপরের ঘরে এখন আর একা থাকে না সরোজ। নীচের ঘরে তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিছানার একপাশে বসে কাজল বলে, 'আজ অফিসে গিয়েছিলেন শুনলাম, সরোজদা?'

সরোজ বলে, 'গিয়েছিলাম। রিক্সা করে।'

কাজল বলে, 'ক'দিন রিক্সা করেই যান। শরীর দুর্বল আছে, সাইকেল চালাতে কষ্ট হবে।' তারপর একটু থেমে চাপাগলায় বলে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব সরোজদা?'

সরোজ বলে, 'কি কথা?'

'এতদিন বলি নি, কিন্তু আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ, আপনার বন্দুকটা মানসেরা নিয়ে গেছে—'

সরোজ কথা বলে না। ভুরু কুঁচকে যায়। মুখ গম্ভীর হয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাজলের মুখের দিকে তাকায় সে। তার গলার মাংসে একটা কালো পোড়া দাগ স্পষ্ট হয়ে থাকে। জ্বরের সময় চুলগুলো ছোট করে ছেঁটে দেওয়া হয়েছিল বলে মুখটা আরো সরু ও রুগ্ন দেখায়।

কাজল বলে, 'ঠিক বলি নি, সরোজদা?'

সরোজ স্থির ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'জানি না। অন্ধকারে কাউকে চিনতে পারি নি।'

কাজলের অভিমানে লাগে। আহত ক্ষুব্ধ মুখে সে বলে, 'আমাকে বললে আমি কাওকে বলতাম না সরোজদা। কোনোদিন না, জীবন থাকতে না!'

সরোজ আস্তে আস্তে কাজলের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয়। মৃদু চাপ দেয়। অল্প হাসে। কিন্তু আর কোনো কথা বলে না। কাজল দেখে, সরোজের চোখের মণিদুটো কেমন অস্বাভাবিক জ্বল জ্বল করছে।

বাইরের রাজনীতির প্রখর উত্তাপ ঘরের মেয়েবউদেরও উত্তেজিত করে। পুরুষেরা বাইরে গেলে তাদের ফেরার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে থাকে তারা। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত নামলেই ছটফট করতে থাকে। এ-বাড়ির বউ ও-বাড়ির মেয়েকে ডেকে খোঁজ নেয়, 'তোমার দাদা ফিরেছে? কখন ফিরল? জিজ্ঞেস করতো, আমাদের ঘরের লোকটা ফিরছে না কেন? শহরে গোলমাল হচ্ছে? আজ কার্ফু ক'টা থেকে?'

একটু দেরী হলে সদানন্দর বউ চলে আসে কাজলদের বাড়ি। কাজলের দেখা না পেলে ছুটে যায় উৎপলের কাছে। পিসীর সঙ্গে ঝগড়া করে মানুষটা সেই সাতসকালে নাকেমুখে চারটে সেদ্ধভাত গুঁজে অফিসে গেছে, এখনো ফিরছে না কেন—তার খোঁজ এনে দিতে বলে। একটু বেশি রাত হলে কাজলের মা-ও এবাড়ি ওবাড়ি ছুটোছুটি শুরু করেন। ঘোষালমশায়কে এসে বলেন, 'ছেলে না শত্তুর! সারা জীবন দগ্ধে মারলে আমাকে। আপনি ওকে একটু ধমকধামক দিন দাদা! কোন্‌দিন মিলিটারির গুলি খেয়ে মরে থাকবে যে রাস্তায়—'

এখন গ্রামগঞ্জের মেয়ে-বউরাও জেলার খবর রাখে। কার্ফুর অর্থ বোঝে। পুলিশ-মিলিটারির অত্যাচারের কথা শুনে চমকে চমকে ওঠে। ক্যাম্বিং-এর অর্থ জানে। রাতের অন্ধকার তাদের মনেও প্রবল ত্রাসের সঞ্চার করে।

একদিন শশাঙ্কর বাড়ি থেকে তার বউয়ের কান্না শোনা যায়। উৎপলের দিদি, জটিলের বউ, সরোজের মা ছুটে যায়। পারুলও যায় ছুটতে ছুটতে। বছরখানেক হ'ল বিয়ে হয়েছে, পাড়ায় এখনো নতুন বউ সে। একটু বেশী সাজগোছ করে, ঠোঁটে লিপ্‌স্টিক মেখে রিক্সা ডেকে সিনেমায় যায়, কখনো বগল-কাটা ব্লাউজও পরে। ডাঙ্গা-পল্লীর মেয়ে-বউদের চোখ টাটায়। তারা বলে, 'দেমাকী বউ! কলকাতার মেয়ে তো! রঙ্‌পালিশ মাখা শিখে এসেছে, ঘরের পুরুষটাকে ভেড়ুয়া বানিয়েছে!' পারুলেরা বড় একটা যায় না

তার কাছে। যে যায় ফিরে এসে নিন্দে ছাড়া প্রশংসা করে না কোনোদিন। কিন্তু ভরতুপুরে তার কান্নার শব্দে ছুটে যায় সকলেই। গিয়ে দেখে শশাঙ্কর বউ চিত্রলেখা শব্দ করে কাঁদছে। শশাঙ্ক তাকে প্রাণপণে বোঝাচ্ছে—'চুপ কর। তুমি চুপ কর। কাল ভোরের ট্রেনেই তোমাকে নিয়ে যাব কলকাতা—'

যাদবপুরে চিত্রলেখার বাপের বাড়ি। একটু আগেই চিঠি এসেছে —তার ভাইকে ক'দিন আগে বুকে রাইফেল ঠেকিয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। তারপর থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বেঁচে আছে কি মেরে ফেলা হয়েছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। বৃদ্ধ পিতার হাতে পোস্টকার্ডে লেখা সেই ভয়ঙ্কর চিঠিখানা পড়েই চিত্রলেখা কেঁদে উঠেছে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে, 'কলকাতা গিয়ে কি করব! কি দেখব! আমার ভাইটাকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলেছে—'

তার চাপা চেরা গলার কান্নার শব্দে পাড়ার মেয়েবউদের বুকের ভেতরটা ভয়ে-ভাবনায় কেমন কাঁপতে থাকে। জটিলের বউ তো ফুঁপিয়ে কেঁদেই ফেলে! জটিল আজ সকালের ট্রেনে মাল আনতে গেছে কলকাতায়। এখন আর রাতের ট্রেন ধরে না সে। সকালে যায়, পরের দিন দুপুরের বাস ধরে ফিরে আসে। চিত্রলেখার কান্না থেকে কলকাতায় ভারি একটা গোলমালের আঁচ পায় সে। জটিলের জন্য হঠাৎ তার মন কেমন করে। পারুলের মুখও কেমন ম্লান হয়ে যায়।

সেদিনই রাতের দিকে কাজলকে একা পেয়ে পারুল জিজ্ঞেস করে, 'একটা কথা বলব কাজলদা?'

'কি কথা?'

'মানসদার নামে যা শুনছি তা কি সত্যি?'

সেইমুহূর্তে কাজলের মনের মধ্যে অবচেতনের গহন-অন্ধকারে নির্মম নিষ্ঠুরতার একটা চোরাস্রোত নিজের অজান্তেই সর্পিল গতিতে বইতে থাকে। চোয়াল শক্ত করে সে বলে, 'সত্যি!'

'মানসদা মানুষ খুন করে?'

'করে।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'এখন এই জেলার সবাই জানে।'

'পুলিশ ধরতে পারলে কি করবে?'

'গুলি করে মেরে ফেলবে।'

'মেরে ফেলবে!'

'হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে!'

'যদি নিজে ধরা দেয়?'

'তাহলেও মেরে ফেলবে।'

'বিচার হবে না?'

'না।'

'কেন?'

'দেশ থেকে ওসব উঠে গেছে। এখন মিলিটারিআই-ন।'

পারুলের মুখ কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়। স্থির শীতল দৃষ্টি মেলে সে কাজলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাজলের মুখে-চোখে কিসের একটা নিষ্ঠুর দীপ্তি খেলা করতে থাকে। একটু-বা উদ্‌ভ্রান্ত অস্থিরতা। পারুল ঠিক বুঝতে পারে না। অপলকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'এমন সর্বনাশা রাজনীতি না করলেই নয়?'

কাজল হঠাৎ বলে, 'আমিও তো রাজনীতি করি!'

পারুল চুপ করে যায়। কথা বলে না।

কাজল ছটফটে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলে, 'জোতদার-মহাজন খুনের রাজনীতি করি না অবশ্য। কিন্তু আমাদের রাজনীতিটাই সঠিক এবং সেটা পুলিশের চোখে কম সর্বনাশা নয়!'

পারুল তবু কথা বলে না। এসব বিষয়ে কথা বলার অধিকার তার নেই। রাজনীতির সে কি বোঝে। গভীর থমথমে মুখে সে শুধু তাকিয়ে থাকে। কাজল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পারুলের মুখ দেখে। তার মনের মধ্যে যেন অতি সংগোপনে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার একটা

নিঃশব্দ ঝড় বইতে থাকে। একটু থেমে অসম্ভব জোরের সঙ্গে সে আবার বলে, 'আমাকেও তো মেরে ফেলতে পারে, পারুল।'

এবার পারুল কেঁপে ওঠে। তার বিবর্ণ মুখ আরো সাদা হয়, 'তোমাকে? কেন? কি করেছ তুমি?'

কাজল বলে, 'অসম্ভব কি! এখন রোজই আমাদের অনেক মানুষ খুন হচ্ছে। গ্রামেগঞ্জে কৃষকসমিতির অফিস পুড়িয়ে দিচ্ছে। পার্টি অফিস ভেঙেচুরে তছনছ করে দিচ্ছে। কাগজে বেরোয় না আমাদের কথা। কিন্তু কোথাও একটা পুলিশ খুন হলেই হেডলাইন হয়। সব আমরা বুঝি। তুমি জান না পারুল, পুলিশ নজর রেখেছে আমার উপর। নিশিন্দার বুধন সরকারদের রাগ আছে। তারা সুযোগ খুঁজছে—'

পারুল শুকনো মুখে বলে, 'তুমি আর নিশিন্দায় যেও না, কাজলদা।'

কাজল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসে, 'ঘরে বসে থাকব? না একটা বন্দুক হাতে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকব?'

পারুল উত্তর দিতে পারে না। তার কচি কিশোর মুখখানা বয়স্কের মত দেখায়। যেন এই ক'মাসেই অনেক বড় হয়ে গেছে সে। অনেককিছু বুঝতে শিখেছে। সে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। পারুলকে নিরুত্তর দেখে কাজলের হঠাৎ রাগ হয়! তার বুকের মধ্যে দুরন্ত একটা অভিমান ঠেলে ওঠে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অকস্মাৎ আবেগে উচ্ছ্বাসে পারুলের একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'আচ্ছা পারুল, আমাকে কেউ খুন করলে তুই কাঁদবি?'

পারুল আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। কাজলের এলোমেলো শরীর আর রোদে পোড়া তামাটে মুখের দিকে করুণ বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর সহসা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে! কি জন্য কাঁদে, কার জন্য কাঁদে—কে জানে! কিন্তু সে কান্না দেখতে কাজলের বড় সুখ হয়!

ডাঙ্গাপল্লীর বুকে নগেন চৌধুরীর ছয় ব্যাটারির টর্চ সতর্ক হিংস্র ভঙ্গিতে আলো ফেলে। এখন সন্ধ্যার কিছু পরেই দোকানপাট বন্ধ করে বাড়ি ফেরেন তিনি। স্টেশন-বাজারে শুকলাল মাড়োয়ারির গদী আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর প্রাণে ভয় ঢুকে গেছে। শুকলালের একটা হাত উড়ে গেছে, একটা পা জখম হয়েছে। তার সেই বীভৎস চেহারা নিজের চোখে দেখে এসেছেন নগেন. তাঁর দোকানের কয়েকটা ঘর পরেই শুকলালের তেল-ঘি-দালদা-বেবিফুডের বড় দোকান। মোড়ে রাইফেলধারী পুলিশ ছিল পাঁচ-সাতটা। তবু শুকলাল রেহাই পায় নি। ফলে সন্ধ্যা নামলে নগেনের আর গদীতে বসার সাহস হয় না। গাড়ি ছুটিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ি ফিরে আসেন। মানসদের দলটা তাঁর মত সাহসী মানুষকেও ভীতু করে তুলেছে!

বাড়ি ফিরে চাকরদের ডাকাডাকি করে ঘর-দরজায় তালা লাগাতে বলেন। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখের কোলাপ্‌সেবল্‌ গেট নিজের হাতে তালাবন্ধ করেন। তারপর গরম চাদর মুড়ি দিয়ে উঠে যান ছাদে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টর্চ ফেলে চারপাশ ভাল করে পরীক্ষা করেন। উঠোনের পাঁচিলটা আরো ক'হাত উঁচু করার কথা ভাবেন। বাইরের দিকের খোলা জমি কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনাও করেন। যা দিনকাল, বিশ্বাস নেই। সবদিকে চোখকান খোলা রাখা দরকার। চেনাজানা ছেলেরাই এখন রিভলবার নিয়ে ঘুরছে।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টর্চ ফেলতে ফেলতে হঠাৎ বনমালীকে ডাকাডাকি শুরু করেন, 'কই, কোথা গেলি? এই শালো—'

নীচের উঠোনে এসে উর্দ্ধমুখে তাকিয়ে বনমালী সাড়া দেয়, 'এই তো বাবু, হেথা রয়েছি আমি!'

ছাদ থেকে নগেন বলেন, 'ওই ডালিমতলাটা দেখ তো, কি যেন নড়ে চড়ে!'

বনমালী একটা লণ্ঠন এনে ইঁদারার ও-পাশে ডালিমতলায় গিয়ে ভাল করে দেখে বলে, 'ই শালা! পাড়ার বেজম্মা কুকুরট বটে গো, কুঁকুড়েমুকুড়ে ঘাপুটি মেরে রয়েছে!'

নগেন বলেন, 'ঢুকল কখন? বের কর। বের করে দে শালোকে—'

ওই টর্চ-ফেলা নিয়ে একদিন নিমুদের বাড়ি থেকে একটা গোলমাল পাকিয়ে ওঠে। নগেনের বাড়ির অল্পদূরে নিমুদের বাড়ি। মাঝখানে আর কোনো বাড়ি নেই। একটা বাড়ি জানালা-বরাবর উঠে থেমে আছে। কেদার মল্লিকের বাড়ি। পাড়ায় যখন প্রথম নাইটগার্ড শুরু হয় তখন বাড়ি তুলছিল কেদার। শেষ করতে পারে নি। শহরে ভাড়া-বাড়িতে থাকে। মাঝে মাঝে সাইকেল চালিয়ে অসম্পূর্ণ-বাড়ি দেখতে আসে। পাড়ার লোক তাকে বিশেষ আমল দেয় না। দোতলার উঁচু ছাদে দাঁড়িয়ে দক্ষিণদিকে টর্চ মারলে কেদার মল্লিকের বাড়ির উপর দিয়ে সেটা সোজাসুজি এসে পড়ে নিমুদের ঘরে-উঠোনে।

নিমুর দিদি সুখদা একদিন কুয়োতলায় জল তুলতে এসে থমকে দাঁড়ায়। তার খোলামেলা শরীরের উপর উজ্জ্বল আলোর বৃত্ত স্থির হয়ে থাকে। সুখদা বুঝতে পারে ওটা নগেনবাবুর টর্চ। তার সাতাশের অপুষ্ট যৌবনের শরীর কি-এক আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। সে ডাকে, 'মা—'

নিমুর মা বাইরে আসতেই টর্চটা নিভে যায়। ঘর-দরজা অন্ধকার। উঠোনে কুয়োতলায় লণ্ঠনের আলো টিমটিম করে। নিমুর মা বলে, 'কি হ'ল? ডাকলি কেন? আলো ফেলছিল কে?'

সুখদা বলে, 'ওই ছাদ থেকে—'

নিমুর মা ঘুরে তাকায়। চিৎকার করে বলে, 'মুখপোড়া, আটকুড়ো বেটা! আসুক নিমু ঘরে—'

সুখদা বলে, 'না মা! নিমুকে কিছু বলো না।'

পরের দিন আলোর ঝলক ছুটে আসতেই সুখদার হাত কেঁপে যায়। তাড়াতাড়ি বুকের আঁচল সামলাতে গিয়ে ভরা বালতি আছড়ে পড়ে কুয়োর জলে। ঘুরন্ত কপিকলে-দড়িতে বিকট শব্দ ওঠে ঘড়্ ঘড়্। সুখদা ছুটে ঘরে চলে আসে। আলোর বৃত্তটা তাকে অনুসরণ করে। সুখদা ঘরে ঢুকে ভয়ে লজ্জায় কেমন হাঁফাতে থাকে।

নিমু ঘরে ছিল সেদিন। সে দেখে ফেলে সব নিজের চোখে।

উঠোনের দরজা খুলে লাফিয়ে বাইরে আসে। ক্রুদ্ধ গলায় চিৎকার করতে থাকে, 'কে রে? কোন্ শালা টর্চ মারে আমার উঠোনে! বাপের বেটা হলে নেমে আয় শালা!'

নগেন টর্চ নেভান না। ছাদের উপর থেকে হাত ঘুরিয়ে সবটুকু আলো নিমুর শরীরের উপর ফেলেন। ফেলেই রাখেন। নিমুর বেঁটেখাটো শরীর, ঝাঁকড়া চুল, ঘন নীল রঙের সোয়েটার, বাঁ হাতের কব্জিতে চকচকে একটা ইস্পাতের বালা—আলোতে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়।

নিমু চেঁচায়, 'আলো ফেলছেন কেন ইতরের মত? নিজের বাড়ি, পরের বাড়ি জ্ঞান নেই? হ্যাজাক জ্বেলে নিজের বউশালীর শরীর দেখুন গে উদোম করে—'

ছাদের উপর থেকে নগেন চাপাগলায় বলেন, 'বেশি তড়পাস নে নিমু। ও-বাড়িও এখন আমার! কাল আদালতে যাস, ডিক্রির নোটিশ হাতে হাতে পেয়ে যাবি!'

নিমু একটু থমকায়। তারপরই মাথায় যেন রক্ত চড়ে তার। হাত পা ছুঁড়ে চোখ রাঙিয়ে বলে, 'আয় শালা! দখল নিবি আয়! দেখি ধড়ে ক'টা মুণ্ডু আছে তোর!'

নগেন বলেন, 'দেখবি! দেখবি!'

দরজার ও-পাশ থেকে নিমুর মা ডাকে, 'ও নিমু! ঘরে আয়।'

সুখদাও ডাকে, 'তুই ঘরে আয়, নিমু।'

কারো কথা না শুনে আলোর বৃত্তের মধ্যে হাত পা ছুঁড়ে অস্থির উত্তেজিত গলায় নিমু চিৎকার করতে থাকে, 'খুন করব! ওই শালাকে আমি খুন করব। নেমে আয় শালা—'

বলতে বলতে হঠাৎ পায়ের কাছ থেকে একখণ্ড আধলা ইট কুড়িয়ে নেয় নিমু। সজোরে ছুঁড়ে মারে নগেনের বাড়ির দিকে। সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ধানমাঠে গিয়ে পড়ে।

নগেন আর কথা বলেন না। টর্চটা নিভিয়ে আবার জ্বালেন।

নিমুর সারা শরীরে আরো একবার আলো ফেলে নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে যান।

এর মাত্র তিনদিন পরেই নিশিন্দার বুকে নিমু খুন হয়ে যায়। আর ওই খুনের সূত্র ধরে কয়েক গাড়ি পুলিশ আর সি. আর. পি ঝাঁপিয়ে পড়ে মহাদেবদের মুচিপাড়ায়। শীতের রাতে মহাদেবের চালাঘরে আগুন জ্বলে ওঠে। বাউড়িবাগ্‌দিপাড়াও বাদ যায় না। নিশিন্দার নামুপাড়ার ঘরে ঘরে এক বিভৎস তাণ্ডব শুরু হয়। মাথা ফাটিয়ে শরৎমাস্টার জেলে যান। মার খেতে খেতে মহাদেবরাও জাল-ঢাকা গাড়িতে ওঠে।

এখন এই জেলার বুকে প্রতিটি রাতই ভয়ঙ্কর। প্রতিরাতেই সংঘর্ষ, গুলিগোলা, কার্ফু, হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড। অনেক রক্তের মূল্যে এখন রাঢ়ের আকাশে প্রভাতের সূর্যোদয় হয়। কিন্তু মানুষের চোখে সেই সূর্যের রঙও জমাটবাঁধা র.ক্তর মত।

মহাদেবদের শায়েস্তা করার চক্রান্ত করেন বৃন্দাবন সরকার। ফসলকাটা শেষ হয়েছে কিন্তু গোলায় ধান ওঠে নি তাদের। ধানকলের গুদাম খা খা করছে। ভাগের স্বত্ব নিয়ে গোলমাল পাকিয়ে রেখেছে চাষীরা। শরৎমাস্টার তাদের নেতা। তাঁর পরামর্শে বেশির ভাগ ধান জমা হয়ে আছে নামুপাড়ার মানুষদের ঘরে। সে ধান উঠিয়ে আনা চাই। ধানকলের অচল চাকা সচল করা চাই। সঙ্গে অবাধ্য চাষা আর বর্গাদারদের বিষদাঁত ভাঙ্গা চাই। শালারা অন্য মুনিষ দিয়ে ধান কাটাতে দেয় নি। জুলুম করে নিজেরা আদায় করেছে দেড়া মজুরি। মাঠ থেকে ফসল চুরি করেছে। সরকারবাবুদের লোক-জনের উপর হামলা করেছে। বগা মুচিকে পাড়ায় ঢুকতে দেয় নি। লখা ডোমের হাতে লাঠির বাড়ি মেরেছে। বাড়তে বাড়তে অনেক বেড়েছে শালারা। আর বাড়লে কোন্‌দিন সরকার-বংশের বাস্তুভিটা ধরে টান দেবে। ধানকল গমকল নিশিন্দার হাটতলা নাটমন্দির দেবস্থান দখল করে বসবে। এবার শক্ত হাতে রাশ টানা

দরকার। ওরা বুঝুক, নিজেরা লাঠালাঠি করলেও সরকার-বংশের রক্তের তেজ মরে যায় নি।

বৃন্দাবনের ঘরে গোপন বৈঠক বসে। থানার সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। পারস্পরিক বিবাদ মুলতুবি রেখে নকুল-মদন-খোকন-বুধনেরা একসঙ্গে একত্রে গোল হয়ে বসে। নিশিন্দার ঘরজামাই ডাঙ্গাপল্লীর নগেন চৌধুরীও উপস্থিত থাকেন।

সর্বজ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন বলেন, 'পুলিশ নামবে। কিন্তু শুধু শুধু তো নামতে পারে না। একটা শক্ত কারণ চাই—'

নকুল বলে, 'কারণ বানিয়ে নিলেই হয়।'

'কি বানাবে ?'

'ওই নকশালদের নাম করে স্কুলদুটো পুড়িয়ে দিই।'

'ওতে সুবিধে হবে না। তার চেয়ে বরং নিশি স্যাকরাকে খুন করিয়ে দাও। সে তো মহাজন। চড়া সুদে টাকা খাটায়। ঘটিবাটিও বাঁধা রাখে। মুচিবাউড়িদের সব জিনিস তো ওর ঘরে। নামুপাড়ার রাগ আছে ওর উপর—'

কিন্তু এ প্রস্তাবে নকুল সরকার মদন সরকার রাজি হয় না। নিশি স্যাকরা তাদের অনুগত লোক। মদনকে টাকা ধার দিয়ে সে-ই বাঁচিয়ে রেখেছে। ও মরলে বৃন্দাবনের লাভ, তাদের ক্ষতি।

বৃন্দাবন সরকার বিরক্ত হয়ে বলেন, 'একটা বলি তো চাই। ও-পক্ষের নয়, এ-পক্ষের বলি। মানে আমাদের পক্ষের। নইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।'

তখন নগেন চৌধুরী ঠাণ্ডা স্থিরগলায় বলেন, 'নিমুটাকেই মায়ের নামে উৎসর্গ করে দিন তাহলে। ওর মতিগতি ভাল ঠেকছে না।'

খোকন সরকার আপত্তি করে। নিমু তার বড় বাধ্য, বড় বিশ্বস্ত। বৃন্দাবনও রাজি হ'ন না। কিন্তু বুধন দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে ওঠে, 'শালাকে তো আমিই খুন করতাম। শালা আমাদের চালের গাড়ি আটকায়, এত হিম্মৎ!'

খোকন কিছু বলতে চায়। কিন্তু বৃন্দাবন চোখের ইশারায় তাকে

থামিয়ে দিয়ে নিরুত্তাপ অপ্রসন্ন মুখে বলেন, 'তাই হোক। বে-পাড়ার বলিই ভাল। পরে ঝামেলা কম হবে।'

সেদিন সেই রাত্রে নিমুর জীবনের শেষ দিনক্ষণ চিরকালের মত নির্দিষ্ট হয়ে যায়—সে জানতেও পারে না। বৃন্দাবন সরকারের ধানকলের একটা দমচাপা ঘরে সে তখন সঙ্গীদের নিয়ে খুচরো পয়সা ছড়িয়ে তিন তাসের জুয়া খেলছে আর জোড়া গোলাম তুলে বারো-আনার একটা বাজি জিতে খুশিতে হাসছে খিক্ খিক্ করে।

পরের দিন মধ্যরাতে নিমুর মৃতদেহ পড়ে থাকে মুচিপাড়ার পথের ধারে পাকুড়গাছের তলায়। মাথায় শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করেছে কেউ। খুলি ফেটে ঘিলু বেরিয়ে এসেছে। ঘাড়েগলায় ধারালো কাস্তের টান। রক্তে মাখামাখি ভয়ঙ্কর শবদেহ।

কিছু একটা গোলমালের আঁচ পেয়ে মহাদেবরা জেগে উঠেছিল। লাঠি হাতে বাইরেও বেরিয়ে এসেছিল কেউ কেউ। ততক্ষণে সি. আর. পি-র গাড়ি এসে ঘিরে ফেলে নামুপাড়া। তারপর এক এক করে ঝাঁপিয়ে নামে পুলিশ। গাড়ির প্রখর সার্চলাইটের আলোতে বেয়নেট-গাঁথা উদ্যত রাইফেল জান্তবভঙ্গিতে চক্ চক্ করে।

সকলের আগে টের পান ঘোষালমশাই। ধানমাঠের ধারেই তো তাঁর বাড়ি। ঘুমও গাঢ় হয় না এইবয়সে। অঘ্রাণ শেষ হয়ে পৌষের শুরু এখন। শীত পড়েছে। রাতের বেলা জানালাগুলো সব বন্ধ রাখেন। তবু ঘুম ভেঙ্গে তাঁর মনে হয় কোথায় যেন কি-রকম একটা আর্ত কোলাহল উঠছে। যেন একসঙ্গে অনেক মানুষের ত্রস্ত চকিত ব্যাকুল চিৎকার শীতের ঠাণ্ডা বাতাসে ভর দিয়ে ধানমাঠ পার হয়ে ছুটে এসে তাঁর বন্ধঘরের দরজাজানালার উপর অস্পষ্টভাবে আঘাত করছে।

গায়ের উপর থেকে কম্বলখানা সরিয়ে বিছানায় উঠে বসেন তিনি। মনোযোগে কান পাতেন। গোলমালটা কোথায় কতদূরে যেন তার আঁচ করার চেষ্টা করেন। দরজা খুলে বাইরে বেরুনোর

কথা ভাবেন। চাপাগলায় ডাকেন, 'এই কালী, এই পারুল, একবার ওঠ্ দেখি মা!'

পারুল তাড়াতাড়ি উঠে বসে, 'কেন বাবা? কি হয়েছে?'

ঘোষালমশাই বলেন, 'চেঁচাস নে। লণ্ঠনটা আগে জ্বাল্।'

একটুপরে ডাঙাপল্লীর অনেকেই জেগে ওঠে। ঘরে ঘরে আলো জ্বালানো হয়। জানালা খুলে এ-বাড়ির লোক ডাকাডাকি করে ও-বাড়ির মানুষকে। সব বাড়ি থেকে সাড়া পাওয়া গেলে দরজা খুলে বর্শাবল্লমলাঠি হাতে সকলেই বাইরে আসে। সকলের মুখে-চোখেই আতঙ্কের ছাপ।

দরজা খুলে ঘোষালমশাইও বাইরে আসেন। ওদিক থেকে সকলের আগে ছুটে আসে কাজল। ঘোষালমশায়ের বাইরের জমিটুকুতে এসে দাঁড়ালে নিশিন্দার নামুপাড়ার শেষঅংশ দেখা যায়। সে এসে দাঁড়ায় সেখানে। ঘোষালমশাই বলেন, 'বারান্দায় উঠে এস কাজল, বাইরে হিম পড়ছে।'

একটুপরে উৎপল শিশির নরেনরাও এসে যায়। পাড়ার চারদিকে লণ্ঠন কিংবা টর্চের আলো ছুটোছুটি করতে থাকে। ঘরে ঘরে ঘুমভাঙা মেয়েবউদের সন্ত্রস্ত কলরব শোনা যায়। পাড়ার কুকুরগুটো ডাকতে থাকে।

ভয়-পাওয়া মুখ নিয়ে সরোজও ছুটে আসে। কতদিন আর ঘরে বন্ধ থাকবে সে! সরোজের বাবা চিৎকার করেন, 'তুই যাস নে! ঠাণ্ডা লেগে আবার জ্বর আসবে তোর!' সরোজের মা-ও বারণ করেন, 'যাস্ নে বাবা, কথা শোন্—' কিন্তু সরোজ আর ঘরে থাকতে পারে না। কালো কোটখানা গায়ে দিয়ে সে বাইরে আসে, তার হাতে আজ বন্দুক নেই। হাঁটাচলার ভঙ্গিতে সেই তেজ, সেই দর্পও নেই। সে আসে খালিহাতে শুধু একটা টর্চ নিয়ে। অনেকটা যুদ্ধ ফেরৎ ক্লান্ত পরাজিত সৈনিকের মত। হিম থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য ঘোষালমশাই তাকেও বারান্দায় উঠে আসতে বলেন।

নিশিন্দার নামুপাড়ার আর্ত কোলাহল মাঝে মাঝে থেমে যায়,

তারপরই আবার উচ্চকিত চিৎকারে ফেটে পড়ে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে তীব্র আলোর ঝলক একেকবার ধানমাঠে আছড়ে পড়ে—পরমুহূর্তেই আবার অন্যদিকে সরে যায়। কখনো একসঙ্গে অনেকগুলো মেয়েলি গলার বুকফাটা কান্নার রোল ওঠে। এতদূর থেকে স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। তবু ডাঙ্গাপল্লীর মানুষগুলো ছটফট করে। তারা এটুকু বুঝতে পারে, ওখানে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটছে।

অস্থির ছটফটে গলায় কাজল একসময় বলে ওঠে, 'সর্বনাশ হয়েছে মেসোমশাই, নামুপাড়ায় হাঙ্গামা হচ্ছে। ধান লুটে নিচ্ছে—'

ঘোষালমশাই বলেন, 'কি বলছ? কারা লুটে নিচ্ছে?'

'ওই সরকারবাড়ির খুনেগুণ্ডারা—'

ঘোষালমশাই আঁতকে ওঠেন, 'সে কি কথা! ওদের এত কষ্টের এত পরিশ্রমের ধান—'

সহসা সরোজ চেঁচিয়ে ওঠে, 'আগুন! ওই দেখ আগুন—'

সকলেই ঘুরে তাকায় নামুপাড়ার দিকে। শীতের কুয়াশার স্তর ভেদ করে আগুনের শিখা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রীষ্মকালের মত দাউ দাউ রূপ নয়, কিছুটা নিস্তেজ ফ্যাকাশে ভঙ্গি। তবু আগুন তো আগুনই! কয়েক মিনিটের মধ্যেই নামুপাড়ার গাছপালা আকাশের বুকে আগুনের লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ে। তার সঙ্গে মানুষজনের চিৎকার আরো তীব্র হয়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসে। একপাল শুয়োরের কর্কশ ভয়ার্ত চিৎকার মানুষের কণ্ঠ চাপা দেয়।

সরোজ বলে, 'গুলির শব্দ। গুলি ছুঁড়ছে ওরা। ওই যে আবার।'

বর্শা হাতে কাজল হঠাৎ লাফিয়ে নেমে পড়ে বারান্দা থেকে, 'আমি নিশিন্দা যাচ্ছি। কে যাবে আমার সঙ্গে চলে এস—'

নরেন বলে, 'আমি যাব! চল—'

ঘোষালমশাই প্রচণ্ড শব্দে ধমকে ওঠেন, 'না। এত রাতে কোথায় যাবে তোমরা—'

কাজল থমকে দাঁড়ায়। উত্তেজিত গলায় বলে, 'ওদের খুব বিপদ। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখব? আমি যাব মেসোমশাই!'

হঠাৎ পারুল তীব্র গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'না, যাবে না! কিছুতেই যাবে না। বাবা, তুমি বারণ কর কাজলদাকে—'

এত জোরে, এমন ত্রস্ত ব্যাকুল ভঙ্গিতে বলে যে সবাই ঘুরে তাকায় পারুলের দিকে। পারুল সহসা খুব লজ্জা পেয়ে যায়। বারান্দা থেকে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে যায় সে। ঘর থেকে চাপা রাগের গলায় বলে, 'যাক। যেতে দাও। গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে মাথা ফাটিয়ে আসুক। তুমি বারণ করো না বাবা! যেতে দাও—'

স্নেহলতা কিছু একটা বুঝে ধমকে ওঠেন মেয়েকে, 'তুই থাম দেখি পারু। পাগলামি করছিস কেন!'

সেই মুহূর্তে কাজলের বুকের মধ্যে একটা দুরন্ত সাহস সিংহের মত কেশর ফুলিয়ে দাঁড়ায়। মনের মধ্যে একটা অস্থির আবেগ বন্যার মত ফুলে ফেঁপে ওঠে। সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে সে পুরাকালের নিষাদ-বীরের মত দীর্ঘশরীর নিয়ে বর্শা হাতে টান টান দাঁড়িয়ে যায়। অন্ধকারে ম্লান জোৎস্নায় তার চোখ দপ দপ করে। হাত-পা মুখের মাংসপেশী দৃঢ় সংবদ্ধ হয়। ভয়? কাকে ভয় করে সে! জীবনের মায়া ত্যাগ করে শুধু মানসই পারে বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিতে! সে পারে না? এইমুহূর্তে জীবনমৃত্যু কাজলের কাছেও একবৃন্তে ফুল হয়ে ফোটে বুকের মধ্যে শুধু জেগে থাকে পারুলের মুখখানি আর সে মুখের পেছনে অনেক দূরে অস্পষ্টভাবে আরো একটা মুখ। সে মুখ পলাতক মানসের—জীবিত বা মৃত যাকে ধরতে পারলে এখন অনেক টাকার পুরস্কার!

কাজল ঝাঁপ দিয়ে নামে ধানমাঠে।

ঘোষালমশাই ডাকেন, 'ও কাজল, শোন—'

সরোজ বলে, 'কাজল, ও ভাবে যেও না।'

কাজলের মা সুলেখা এইরকমই কিছু একটা আশঙ্কা করে উঠে

এসেছিলেন ঘোষালমশায়ের ঘরে। তিনি প্রায় কেঁদে ওঠেন, 'দাদা, ওকে ফেরান!'

কিন্তু ঘোষালমশাই আর কাজলকে ডাকেন না। যে যাবেই তাকে ফেরানোর চেষ্টা বৃথা। অকারণে পিছু ডেকে কেন অমঙ্গল বাড়ানো। বরং অবস্থা বুঝে স্নলেখাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন তিনি।

কাজলের সাথে নরেনও নেমে এসেছিল ধানমাঠে। কিছুটা পথ যাবার পরেই একটা উজ্জ্বল আলোর বৃত্ত ধানমাঠের বুকে আছড়ে পড়ে। তারপর ইতস্তত ঘুরেফিরে তাদের শরীরের উপর স্থির হয়। নগেন চৌধুরীর ছয় ব্যাটারীর টর্চ। যথারীতি ছাদে উঠে এসেছেন তিনি। আলো ফেলছেন নিশিন্দার দিকে। কাজল ও নরেন মুহূর্তকালের জন্য থমকায়। নগেন চৌধুরী হাঁক দিয়ে বলেন, 'এত গোলমাল কিসের! নামুপাড়ায় আগুন লেগেছে মনে হচ্ছে! কে ছুটছ? কে তোমরা?'

কেউ তাঁর কথার উত্তর দেয় না। পৌষের ঠাণ্ডা রাত্রে শিশির ভেজা ঘাসের বুক মাড়িয়ে কাজলেরা ছুটতে থাকে। খোলা মাঠে হিমেল বাতাস বইছে। কিন্তু এইমুহূর্তে তাদের শীতের কোনো অনুভূতি নেই। বরং উত্তেজনায় কাজলের যেন গরমই লাগছে।

কিন্তু বেশি দূর যেতে পারে না তারা। ধানমাঠের পুকুরের উঁচু পাড়ে উঠে থমকে দাঁড়ায় দু'জনেই। নামুপাড়ার আর্ত তীব্র চিৎকার এবার স্পষ্ট হয়ে কানে আসে। দুজনেই দেখে, নামুপাড়া থেকে মাঠ ভেঙে মানুষজন এদিকপানে ছুটে আসছে। পুকুরপাড়ের কাছাকাছি এসে গেছে অনেকেই। আরো ছুটতে ছুটতে আসছে। নামুপাড়ার মেয়েবউশিশুর দল। ভয়ের গলায় চিৎকার করতে করতে আসছে। পায়ে কাপড় জড়িয়ে ধানমাঠের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ছে কেউ। কারো কোল থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে শিশু। তার তীব্র কান্নায় শীতের আকাশ চিরে যাচ্ছে।

নরেনের হাতে একটা ছোট টর্চ ছিল। সে এগিয়ে এসে আলো

ফেলে। কাজল হাঁক দিয়ে বলে, 'ভয় নেই। এদিকে এস। এই পথটা দিয়ে এস।'

মাটির কলসি, পেতলের ঘড়া আর টিন হাতে ছুটে আসে পুরুষেরা। আসতে আসতে মেয়েদের ধমকায়, 'চুপ কর্। চুপ করে পথ হাঁট। চিঁচাইছিস্ কেনে এমুন? শুনতে পেলে ইদিক-পানে ঝাঁপিন্ আসবে না শালোরা?'

তারা জল নিতে আসছে পুকুর থেকে। মুচিপাড়ার আগুন নেভাবে। শীতের আগুন বেশী ছড়াতে পারছে না। কয়েক ঘড়া জল ঢালতে পারলে হয়ত নিভে যাবে। খালি গা, খালি পা, ছোট একফালি কাপড় কোমরে জড়ানো—পুকুরের উঁচু পাড় বেয়ে দ্রুত পায়ে তারা উপরে উঠে আসছে। তাদের শরীরে শীত নেই।

কাজলকে দেখে তারাও থমকায়। চিনতে পেরে বলে, 'এখুন পাড়ায় ঢুকো নি দাদাবাবু। ছের্পি ঘিরে রেখেছে।'

কাজলের মুখ কঠিন হয়ে যায়, 'সি. আর. পি? সি. আর. পি এসেছে কেন?'

'সরকারবাবুরা লিয়ে এল। মুচিপাড়ায় খুন হয়েছে—'

'কে খুন হয়েছে?'

'সে এখুনো বুঝতে লারছি।'

কে খুন হয়েছে, কখন খুন হয়েছে বুঝতে পারছে না তারা। ঠিক মুচিপাড়ার মানুষ নয় তারা—বাউড়িপাড়ার। ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করেও যেতে পারে নি। তার আগেই পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের পাড়াতেও। ঘরে ঘরে খানাতল্লাশি হচ্ছে। আকাশে বন্দুক তুলে ফাঁকা আওয়াজ করছে পুলিশ। বুকে বেয়নেট ধরে হাত তুলিয়ে রেখেছে মরদদের। মেয়েদের বুকেপেটে খোঁচা মারছে। সঙ্গে আছে সরকারবাবুর লোকেরা। খোকনবাবুরা আছে, বুধনেরাও আছে। ধান লুঠ হয়ে যাচ্ছে। ঘরের জিনিশপত্র লুঠ হয়ে যাচ্ছে। লখা ডোম আর বগা মুচি মাথায় পাগড়ীর মত গোল করে গামছা বেঁধে লাঠি হাতে হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও-পাশের পুকুরে

যাওয়ার পথ নেই। যাওয়ার চেষ্টা করলেই লাঠি পড়ছে মাথায়। মুচিপাড়ার মানুষ জলের জন্য চিৎকার করছে। কিন্তু পাড়া ছেড়ে বেরুতে পারছে না। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকারে ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে বাউড়িপাড়ার মানুষ এ পুকুরে ছুটে এসেছে জলের জন্য। কিন্তু সি. আর. পি উঠে না গেলে জল নিয়ে মুচিপাড়ায় ঢুকতে পারবে না। বর্শা হাতে কাজলেরা নামুপাড়ায় ঢুকলেই পুলিশ তাদের গুলি করবে। কাজেই 'তোমরা এখুন যেও নি দাদাবাবু. চুপ করে ডাঁড়িন্ থাকো। ও শালোরা গাড়ি লিয়ে চলে যাক, তা'পরেতে যেও। তা'পরেতে সরকারবাবুদের লোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করে লিব আমরাও। লাঠি ধরতে আমরাও জানি বাবু কিন্তু আমাদের তো গুলিবন্দুক নাই! থাকলে ও শালো ছেরপিদিগেও দেখে লিতম! সি তেজ আমাদের আছে বাবু!'

কে যেন বলে কথাগুলো। ঠিক একজন নয়, অনেকজন। একজনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে আরেকজন। আর নরেনকে পাশে রেখে কাজল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রাতের অন্ধকারে মুচিপাড়ার বুকে আগুন দেখে, মানুষের কান্না শোনে। যে দুরন্ত সাহস আর বাঁধভাঙা আবেগ নিয়ে সে ধানমাঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ক্রমশ যেন তা থিতিয়ে আসতে থাকে। ভোঁতা বর্শামাত্র সম্বল করে সি. আর. পি-বেষ্টিত নামুপাড়ার বুকে ছুটে যাওয়ার মনোবল আর সে খুঁজে পায় না। তার উত্তেজনা কমে গিয়ে এতক্ষণ পরে কেমন যেন শীত করতে থাকে। আর বুকের মধ্যে নিষ্ফল আক্রোশের একটা যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে ওঠে। যেন চোখ ফেটে জল আসতে চায় তার। মাটিতে পা গেঁথে সে নির্বাক নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে।

নিশিন্দার নামুপাড়া থেকে মানুষজনের চিৎকার বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এতক্ষণ পরে আগুনের শিখা লকলকিয়ে ওঠে। সহসা আবার গুলির শব্দ হয়। একটা প্রবল আর্তনাদ শোনা যায়। পুকুর-পাড়ে ছুটে-আসা মেয়েবউদের একজন ডুকরে কেঁদে উঠে বলে, 'আমার ঘরের মানুষট তো পালায় নাই। উয়াকে মেরে ফেলাইলে গো—'

ডাঙ্গাপল্লীর বুকে ঘোষালমশায়ের ঘরে-বারান্দায় বিনিদ্র চোখে রাত জাগে কিছু মেয়ে-পুরুষ। অপলকে ভয়ার্ত চোখে তারা তাকিয়ে থাকে নামুপাড়ার দিকে। কেউ বড় একটা কথা বলে না। মদের ঝোঁকে সিদ্ধেশ্বর দেয়ালে ঠেস দিয়ে গুটিসুটি বসে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়েও পড়ে। সদানন্দ ঘরে চলে যায়। শশাঙ্ক বউ নিয়ে কলকাতা গেছে, ফেরে নি। জটিল মাঝে মাঝে বলে, 'কাজল অমন ছুটে না গেলেই পারত!' সরোজ চাপাগলায় তাকে ধমকায়, 'তুমি চুপ কর!' পারুল আর একটাও কথা বলে না। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা জানালার পাল্লা আধখানা খুলে ধানমাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাজলের মা সুলেখা মাঝে মাঝে চমকে ওঠেন আর কান্না ভেজা গলায় বলেন, 'আপনি কেন ওকে বারণ করলেন না দাদা!'

ঘোষালমশাই এখন অন্য সুরে কথা বলেন। দিব্যি সতেজ ভয়হীন কণ্ঠস্বর। বলেন, 'বারণ করলে কি শোনে তোমার ছেলে! মানুষের আপদবিপদ দেখলেই ছুটে যায়। তা ভালই তো করে। অত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি? নরেন তো গেছে সঙ্গে। বুড়োমানুষ না হলে আমিও ছুটে যেতাম—'

সরোজ বলে, 'আমি একটু এগিয়ে দেখে আসব, মেসোমশাই?'

ঘোষালমশাই হা হা করে ওঠেন, 'না বাবা, না। তুমি ঘরে যাও। তোমার মা এসে বসে আছেন।'

সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির শেষে ডাঙ্গাপল্লীর মানুষের কাছে এক এক করে সব খবর এসে পৌঁছায়। কাজল আর নরেনই নিয়ে আসে খবর। নামুপাড়া থেকে সি. আর. পির গাড়ি চলে গেলে ওরা ঢুকেছিল পাড়ায়। একটু বেলার দিকে ফিরে এসেছে। যেন শ্মশান থেকে ফেরা। চোখমুখ উদ্‌ভ্রান্ত। শীতে সারা শরীর কাঁপছে। আকাশে সূর্য ঝকমক করছে। কিন্তু কাজলের শরীরে সে সূর্য যেন একটুও উত্তাপ দিতে পারছে না।

নরেন ঘরে চলে যায়। তাকে ডিউটিতে যেতে হবে। কাজল এসে দাঁড়ায় ঘোষালমশায়ের বারান্দায়। পারুল উনুনের ছাই বাইরে ফেলতে এসে কাজলকে দেখে, কিন্তু একটাও কথা বলে না। ঠাণ্ডা কঠিন মুখ করে কুয়োতলার ছোট দরজা দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে যায়। কাজল নিজেও এখন পরাজিত সৈনিকের মত। হাঁকডাকের সাহস নেই। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ডাকে, 'মেসো-মশাই—'

কালী এসে বলে, 'বাবা গোয়াল থেকে গরু বার করছে। তুমি এখুনি আগে বাড়ি যাও কাজলদা—'

কাজল আর কথা বলে না। বাড়ির দিকে পথ হাঁটে। তার রাতজাগা চোখ জ্বালা করতে থাকে। বুকের মধ্যে কেমন দমচাপা ভয় আতঙ্ক ঘৃণা। মুচিপাড়ায় শুধু আগুনে-পোড়া ঘর নয়—অনেক জমাটবাঁধা রক্তও দেখে এসেছে সে। উত্তেজনায় এখনো তার সারা শরীর কাঁপছে। পারুলের মুখে রাগ না অভিমান দেখার মত মনের অবস্থা নেই। সে ভাবছে অন্য কথা।

নিমু খুন হয়ে গেছে। তাকে হত্যার অপরাধে শরৎমাস্টারকে ঘর থেকে টেনে তুলে পুলিশের জালঢাকা গাড়িতে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। ওইসময় একটা লাঠিও পড়েছে মাথায়। ভূষণ দারোগা বাধা না দিলে শরৎমাস্টার নাকি খুন হয়েই যেতেন। মুচিপাড়া থেকে মহাদেবসহ ধরা হয়েছে তেরোজনকে। বাউড়িবাগ্‌দিপাড়া থেকে ন'জনকে। ঘরের আগুন এখনো ধিকি ধিকি জ্বলছে। সবশুদ্ধু দশ-বারোটা ঘর পুড়েছে মুচিপাড়ায়। আগুন নেভাতে দেয় নি। বাউড়ি-বাগ্‌দিপাড়ার ঘরদরজা ভেঙেচুরে দেওয়া হয়েছে। জিনিশপত্র ওলট-পালট। ভাঙা মাটির হাঁড়িকুরি উঠোনে ছড়িয়ে আছে। বুটজুতোর তলায় চাপা পড়ে ক'টা হাঁসমুরগী থেঁৎলে আছে। সমস্ত পাড়া জুড়ে একটা ছিন্নভিন্ন অবস্থা। যেন সারারাত ধরে ভূমিকম্প হয়েছে। কিংবা একদল বুনোহাতি ঝাঁপিয়ে নেমেছে পাহাড়ী জঙ্গল থেকে। যারা লাঠি তুলে বাধা দিতে এসেছিল তাদের রক্তই চাপ বেঁধে জমা

হয়ে আছে আঙিনায়-উঠোনে। কে একজন ভয় পেয়ে গাছে উঠেছিল—পুলিশ তাকে গুলি করে নামিয়েছে। একটা কাঁঠালগাছের কাণ্ড বেয়ে রক্তের ধারা নামতে নামতে গুঁড়ির কাছে এসে জমাট বেঁধে আছে। গড়িয়ে-পড়া লোকটাকে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে গাড়িতে। নিমুর মৃতদেহটাও নিয়ে গেছে।

এইমুহূর্তে নিমুর কথাও ভাবছে না সে। নিমুর প্রতি কোনোকালে তার কোনো সমর্থন ছিল না, সহানুভূতিও না। নিমুদের পরিণতি যে এইরকমই হয়—তা তার অজানা নয়। সে ভাবছে, এই খুনের জের কোথায় গিয়ে থামবে। নামুপাড়ার ঘর থেকে ধান লুঠ হয়ে গেছে। গরু ছাগল মুরগীও উঠিয়ে নিয়ে গেছে। কাঁসার বাসনপত্র এতক্ষণে নিশি স্যাকরার ঘরে। মানুষগুলো এখন রাগে দুঃখে ফুঁসছে, কিন্তু রাতের বেলা উদ্যত রাইফেলের মুখে বাধা দেবার সাহস পায় নি। লুঠ-হয়ে-যাওয়া ধান তারা কি সরকারবাড়ির গোলা থেকে আর কোনোদিন ফিরিয়ে আনতে পারবে? কিভাবে আনবে? হাতে লাঠি নিলেই ঝাঁক বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়বে সি. আর. পি। দরকার হলে মিলিটারিও নামবে। শহরের বুকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। তাদের হাতে শুধু রাইফেল নয়, স্টেনগানও আছে। জঙ্গল থেকে মানুষ টেনে বের করার জন্য বিষাক্ত গ্যাসও এনেছে সঙ্গে। রাজনগরের জঙ্গলে নাকি সে গ্যাস ব্যবহার করেছে তারা। মানসদের দলের ক'জন ছেলে গ্যাসের তাড়নায় ছুটে বেরিয়ে আসতে গিয়ে মিলিটারির হাতে গুলি খেয়ে মরেছে। কে জানে তার মধ্যে মানসও আছে কিনা। তার সম্পর্কে আর তো কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না অনেকদিন—

মনের মধ্যে মানসের কথা উঠতেই মুখটা আরো কঠিন হয়ে যায় কাজলের। হঠাৎ তীব্র রাগ ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়। শরৎমাস্টারের কথা মনে পড়ে। ইদানীং তিনি প্রায়ই বলতেন, 'এ হ'ল আত্মধ্বংসী হঠকারী রাজনীতি। এতে শ্রমিক কৃষকের সর্বনাশ হবে। প্রতিক্রিয়ার শক্তি সুযোগ নিয়ে সমস্ত গণআন্দোলন ধ্বংস করবে। সারা রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হবে।'

এইমুহূর্তে কথাগুলো অসম্ভব সত্য বলে মনে হয় কাজলের। ঠিক তাই তো ঘটল কাল নিশিন্দার নামুপাড়ায়। জেলা জুড়ে নকশালী-হামলার সুযোগ নিয়ে সরকারবাবুরা গুণ্ডাপুলিশ নামিয়ে দিল গ্রামের বুকে, ঘর জ্বলল, ধান লুঠ হ'ল, মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরিয়ে জেলে গেল শরৎমাস্টার আর মহাদেবরা। তারাই ছিল এলাকার কৃষকসমিতি আর ক্ষেতমজুর আন্দোলনের সামনের সারির মানুষ। এখন আন্দোলন হবে কাদের নিয়ে। নামুপাড়ার সকলের মুখে হতাশা, ভয়, আতঙ্ক। সরকারবাবুদের সঙ্গে লাঠালাঠি অনেক লড়াই করেছে তারা কিন্তু পুলিশ-সি আর-পি-র-গাড়ি সঙ্গে নিয়ে একযোগে এমন হিংস্র ভঙ্গিতে বাবুদের ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেনি আর কখনো। মানসদের ভ্রান্ত রাজনীতি এই সুযোগ এনে দিয়েছে। একপক্ষের হিংস্রতা অন্যপক্ষকে হিংস্রতর করেছে। জেলার এই অশান্ত উন্মত্ত পরিবেশের মধ্যে এখন কত সহজেই কৃষকের ঘর থেকে ধান লুঠ করতে পারে তারা, গুলি করে মেরে ফেলতে পারে নিরীহ নির্বিরোধী ক্ষেত-মজুরকে। ব্যক্তিহত্যা, ব্যক্তিসন্ত্রাসের রাজনীতির এই তো পরিণতি।

কিন্তু...

কাজল আবার যেন কোথাও ধাক্কা খায়। শরৎমাস্টারের কথাই মনে পড়ে—'মানুষের ইতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের, শ্রেণী-সংঘর্ষের ইতিহাস, অবিরাম রক্তপাত রক্তক্ষয়ের ইতিহাস।' যদি তাই হবে তবে এইমুহূর্তে এই দেশে সংঘর্ষের একপক্ষে আছে গুলিগোলা বারুদ বন্দুক -অন্যপক্ষে কি? ভোঁতা বর্শা আর বাঁশের লাঠি। নামুপাড়ার মানুষগুলো তার সাহায্যে কি লুঠ-করা ধান ফিরিয়ে আনতে পারবে? এত মানুষের খরচ-হয়ে-যাওয়া এত রক্তের শোধ তুলতে পারবে? সংঘবদ্ধ মানুষের শক্তি সকলের বড় শক্তি সন্দেহ নেই—কিন্তু মানুষ কি শুধুহাতে লড়াই করে? ইতিহাসে কোনোকালে করেছে? ব্যক্তিহত্যা ব্যক্তিসন্ত্রাসের প্রশ্ন বাদ যাক, তাকে কেউ সমর্থন করে না, কিন্তু মানুষের বাঁচার জন্যই তো সংঘবদ্ধ-সংগঠনের সঙ্গে চাই আত্ম-রক্ষার আর প্রতিআক্রমণের উপযুক্ত অস্ত্র। অবশ্যই চাই। কিন্তু কে

দেবে। কিভাবে কোন্ পথে গড়ে উঠবে এক শিক্ষিত সশস্ত্র কৃষক-বাহিনী, যারা কিনা—

সহসা বুকফাটা তীব্র এক চিৎকারে কাজলের সমস্ত চিন্তাজাল ছিন্ন হয়। সে কি আকুল মর্মভেদী কান্না। ছোট ডাঙ্গাপল্লীর ঘর-বাড়ি গাছপালামানুষজন সব যেন শিউরে ওঠে সে কান্নায়। রাতজাগা মানুষ— যারা তখনও লেপকাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল ঘরে ঘরে, ছটফট করে বিছানায় উঠে বসে। চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে, 'কি হ'ল ? কে কাঁদে ? কোন্ বাড়ির ?'

কাজল থমকে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে, নিমুর মা'র কাছে খবর পৌঁছে গেছে। হয়ত নরেনের মুখ থেকেই ছড়িয়ে গেছে খবরটা। এ আকুল ক্রন্দন সেই সন্তানহারা জননীর।

কান্নার শব্দে ছুটে যায় অনেকেই। সদানন্দের বউ, সিদ্ধেশ্বরের বউ, উৎপলের দিদি, সরোজের মা। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘোষাল-মশাইও এগিয়ে যান। পায়ে পায়ে কাজলও এসে দাঁড়ায় নিমুর বাড়ির উঠোনে। ভেতরে সে এক করুণ দৃশ্য। মেয়েবউরা এসে জড়ো হয়েছে অনেকে। তারা সবাই মিলে নিমুর মাকে জোর করে জাপটে ধরে রাখতে পারছে না। তার রোগা দুর্বল শরীরে এখন যেন অমানুষিক শক্তি। এক ঝটকায় সকলের হাত ছাড়িয়ে বাইরের দরজার দিকে ছুটে যাচ্ছে সে। ধানমাঠ পার হয়ে নিশিন্দায় যাবে। নিমু কোথায় খুন হয়ে পড়ে আছে দেখবে। সকলে মিলে আবার ধরে ফেলছে তাকে। একবার দরজার চৌকাঠে আছাড় খেয়ে পড়ল। সারা গা ধুলোবালিতে মাখামাখি। উঠে দাঁড়াল আবার। আচ্ছন্ন, হতচেতন বিকারগ্রস্ত অবস্থা। চোখে জল নেই কিন্তু গলায় আকুল চিৎকার—'নিমু, আমার নিমুরে-এ-এ-এ !'

সদানন্দের পিসী ছুটে এসে সে দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণ পাথরের মত স্থির শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ কি মনে হ'ল তার, ছুটে গিয়ে নিমুদের বাঁধানো তুলসীমঞ্চে জোরে জোরে মাথা ঠুকে

চেঁচাতে লাগল—'হে ঠাকুর, আমার ক্যান্ মরণ হয় না। সবাই মরে, আমার ক্যান মরণ হয় না।'

সদানন্দর বউ তার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে চাপাগলায় সিদ্ধেশ্বরের বউকে বলল, 'পিসীর ঢঙ, দেখ। শানে মাথা ঠুকলে কেউ আবার মরে।' বলে সে নিজেই কিন্তু পিসীর ছোট শরীরটা দুহাতে ধরে টানতে টানতে একপাশে নিয়ে এসে নরম গলায় বলল 'ও পিসী, কাঁদ কেন? বসো, এখানটায় চুপ করে বসো।' বউয়ের গলায় নরমসুর শুনে পিসী একমুহূর্তেই স্থির শান্ত হয়ে গেল। মুখখানা উঁচু করে বড় করুণভাবে বলল, 'বহুম? চুপ কইরা বহুম এইহানে? এই বই। আর কথা কমু না। খাওন দিবি তো আমারে? ভাত দিবি আইজ?'

সদানন্দের বউ বলে, 'দেব। তুমি চুপ থাক।'

নিমুর মৃত্যুর চেয়েও পাড়ার বুকে বড় হয়ে বাজে নিমুর মা'র আকুল কান্না। নিমুর দিদি একপাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘোষালমশাই থেকে শুরু করে সকলের মুখেচোখেই একটা বিহ্বলতা ছড়িয়ে পড়ে। পাড়ায় নিমুকে কেউ পছন্দ করত না। ঘৃণাও করত অনেকে। তবু সুখেদুঃখে সকলের চোখের সামনে এ পাড়াতেই ছোট থেকে বড় হয়েছে সে—তার এমন অপঘাত মৃত্যু কে চেয়েছিল। ওই সংসারটার এখন কি হবে। দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন কে যোগাবে ওদের মুখে!

বাইরের মাঠে, কেদার মল্লিকের আধখানা বাড়ির পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করে পাড়ার পুরুষেরা। ও-পাশে নিমুদের উঠোনে ভিড় করে থাকে মেয়েরা। ঘোষালমশাই একবার ভেতরে ঢোকেন, আবার ছটফট করে বাইরে চলে আসেন। নিমুর মা'র কান্নাটা তাঁর সহ্য হয় না। সান্ত্বনা দেবার ভাষাও খুঁজে পান না।

বাইরে সকলের মুখেই তখন এক প্রশ্ন—কে খুন করল নিমুকে? কিভাবে খুন হ'ল?

ঘোষালমশাই কাজলকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি সারারাত জেগে কি দেখে এলে? কি শুনে এলে? কে মারল ছেলেটাকে?'

রাতজাগা কাজলের মুখ মুহূর্তেই কঠিন হয়ে ওঠে। চোখের মণিতে রাগ ও উত্তেজনা দপ্ দপ্ করে। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বেশ জোর গলাতেই বলে, 'যারাই খুন করে থাকুক শরৎমাস্টার কিংবা মহাদেবরা করে নি। এসব ব্যক্তিখুনের রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না মেসোমশাই—'

এমন স্পষ্টগলায়, এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজল কথাগুলো বলে যে উপস্থিত সকলেই, রাজনীতির কোনো গভীর তত্ত্ব না বুঝেও, ঘাড় মাথা ঝাঁকিয়ে কাজলকে নিঃশর্ত সমর্থন করে। ঘোষালমশাই বলে ওঠেন, 'সে তো একশবার। শরৎমাস্টার পাঁচ-গাঁয়ের গরীবদুঃখী মানুষের নেতা। তিনি কেন এমন অপকর্ম করতে যাবেন।'

কাজল বলে, 'কিন্তু তাঁকেই ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ!'

ঘোষালমশাই বিরক্ত হয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলেন, 'পুলিশের কথা বাদ দাও! খুনটা ওরাই করে নি তো?'

ঘোষালমশায়ের ঘরে দুধ দুইতে এসে জটাধারীও বলে সে কথা। তার মুখেচোখেও একটা ভয় আতঙ্কের ছাপ। সারারাত ধরে সে-ও দেখেছে পুলিশের তাণ্ডব। আরো কিছু বেশিই দেখেছে। নিশিন্দার অন্যপ্রান্তে যে-দিকটায় তার ঘর তারই পাশের সরু মেঠো নির্জন রাস্তা দিয়ে রাতের বেলা নিমুকে দু'হাত মুচড়ে মুখে কাপড় বেঁধে টেনে নিয়ে যেতেও দেখেছে সে। বুধনকেও দেখেছে সঙ্গে। ভয়েভাবনায় সারারাত তার ঘুম হয় নি। সকালে উঠতেও বেলা হয়ে গেছে। ঘোষালমশায়ের ঘরে আজ অনেক দেরিতে দুধ দুইতে এসেছে সে।

জটাধারী এলে কালী এসে বাবাকে ডেকে নিয়ে যায়।

এপাশে ওপাশে তাকিয়ে জটাধারীও চাপাগলায় বলে, 'সাজানো খুন বাবু! নামুপাড়া ঠাণ্ডা করার লেগে খুন করে ফেলালে অর্জুন নন্দীর বেটাটকে!'

'কারা করলে?'

জটাধারী ঢোঁক গেলে, 'সি বলতে লারব। মানুষগুলান্ তো সোজা লয়। জমি লিয়ে আমার উপরেও রাগ আছে উয়াদের। বলা-বলি করলে আমার লাশ-টও পড়ে থাকবে হুই বড়পুকুরের ঘাটে—'

নিমুর মৃত্যুতে বড়রকমের একটা ধাক্কা খায় সরোজ। নিমুর দুঃখে নয়—নিমুরা যে এমনি করেই মরে সে বিষয়ে কাজলের মত তারও কোনো সন্দেহ নেই। সে ভাবে অন্য কথা চালের গাড়ি ধরার কথা মনে পড়ে যায় তার। পাকেচক্রে নিমুও জড়িয়ে পড়েছিল তার সঙ্গে। বুধন হুম্‌কি দিয়ে বলেছিল, নিমুকে সে দেখে নেবে। তাহলে বুধনেরাই কি মেরে ফেলল নিমুকে? সরোজের রুগ্ন শরীর, দুর্বল মন। থানায় তাকে অবশ্য আর হাজিরা দিতে হয় না এখন। সরোজের বাবা দীর্ঘকাল সরকারী উচ্চপদে কাজ করেছেন। সরোজের এক মামা রাইটার্সে এখনো বড় চাকরি করেন। তাঁরাই লেখালেখি ধরাধরি করে সরোজের থানায় যাওয়া রদ্ করেছেন। সরোজের ভয় এখন বুধনদের নিয়ে। নিমুকে তারাই যদি মেরে থাকে—তাহলে সরোজকে কি ছেড়ে দেবে? এরপর কি তার পালা? সেই-ই তো বন্দুক ঠেকিয়েছিল বুধনের বুকে। সে বন্দুকখানাও আজ তার হাতে নেই। সে নিরস্ত্র, অসহায়। কি দিয়ে ঠেকাবে। নিমুর মা'র কান্নায় তার বুকের মধ্যে শিরশির করে। তার স্নায়ুর উপর প্রবল চাপ পড়ে। দুর্বল শরীর কেমন অবশ হয়ে আসতে চায়। কাউকে কিছু না বলে সে নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে আসে।

দুপুরের দিকে নিশিন্দা থেকে দু'জন মানুষ চুপিচুপি এসে কাজলকে নীচুগলায় ডাকাডাকি করে। তারা শরৎমাস্টারের অনুগত মানুষ। নামুপাড়ায় বাস। সরকারদের ধানকলে কাজ করে। মাঠ ভেঙ্গে আসে না। ঘুরে শহরে ঢোকার কাঁচা রাস্তা দিয়ে আসে। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে কাজল তখন ঘুমোচ্ছিল। গৌরী তাকে ডেকে দেয়। কাজল বাইরে এসে সনাতন আর সুদেবকে দেখে অবাক হয়। বলে, 'এ সময় তোমরা কেন এসেছ?'

সনাতন বলে, 'ঘরের ভিতর চল দাদাবাবু, কথা রয়েছে।'

কাজল তাদের ঘরে এনে বসায়।

সুদেব বলে, 'আজ রাতটা তোমরা দাদাবাবু, খানিক সাবোধানে থাকবে!'

কাজল চমকে ওঠে, 'কেন বল দেখি? কি হবে?'

সুদেব ও সনাতন দু'জনেই আগোছালোভাবে নানাকথা বলে। কাল রাতে কাজল ও নরেন বর্শাহাতে ছুটে গিয়েছিল। খোকনবাবুরা তা জেনেছে। এ পাড়ার মানুষ জেগে উঠে দল বেঁধে নামুপাড়ার মানুষদের পক্ষ নিয়ে হৈ-হল্লা করছিল—তাও বাবুরা শুনেছে। ধানকলের অফিসঘরে দরজা এঁটে বসে তারা কি যেন শলাপরামর্শ করছে। স্পষ্ট বোঝা যায় নি। সুদেব কয়েকবার চা সিগ্রেট জল দিতে গিয়ে বন্ধ দরজায় কান পেতে ডাঙ্গাপল্লীর নাম শুনেছে। তাদের সন্দেহ, কাল নামুপাড়ায় বাবুরা যেমন দাঙ্গা করেছে, আজ রাতে হয়ত এখানেও তমন কিছু করবে।

সনাতন বলে, 'বাবুরা চেলের গাড়ি ধরেছিলেন, বুধনবাবুরা তা ভোলে নাই। মনে হল সি কথাটও বলছিল তেনারা—'

কাজলের মুখ দুশ্চিন্তায় কালো হয়। সুদেব-সনাতনের কথা অবিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। নামুপাড়ার বুকে কাল তাণ্ডব চলেছে। মানুষগুলো এখ'না ভীত সন্ত্রস্ত। মহাদেবরা হাজতে। অন্যেরা ঘরদরজা সামলে উঠতে পারে নি। এই অবস্থায় ডাঙ্গাপল্লীর মানুষ আক্রান্ত হয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করলেও ছুটে আসতে পারবে না তারা। হয়ত বা ছুটে আসার সাহসও পাবে না। ফলে আজ রাতই ওদের পক্ষে এ পল্লীর বুকে হামলা করার উপযুক্ত সময়।

সুদেব ও সনাতন একটুপরেই চলে যায়। কাজল কি করবে ঠিক করতে পারে না। এখন দুপুরবেলা, পাড়ায় সরোজ-উৎপলেরাও নেই। সকলেই নিজের নিজের অফিসে-দোকানে কাজের জায়গায়। ঘোষালমশাই অবশ্য ঘরেই আছেন। কিন্তু ওই বুড়োমানুষটিকে

এসব কথা বলে ভয় পাইয়ে দিয়ে লাভ কি। কাজল ঠিক করে সুদেব-সনাতনের কথা একমাত্র সরোজ ছাড়া আর কাউকেই বলা হবে না। ডাঙ্গাপল্লীর মানুষ ভয় পেয়ে যাবে তাহলে। ভয় পেলে প্রতিরোধের শক্তি হারাবে। বিষয়টা রেখে-ঢেকে বলতে হবে সকলের কাছে। সকলে মিলে তৈরি হয়ে রাত-পাহারা দিতে হবে আজ।

বিকেলে নিমুর মৃতদেহ নিয়ে নিশিন্দায় শোকমিছিল বের হয়। হাসপাতালে পোস্টমর্টেমের পর তার মৃতদেহ খোকনদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। নিমু তো তাদেরই দলের ছেলে। তার মৃতদেহের উপর তাদের ষোলোআনা অধিকার। তারা নিমুকে ফুল-টুল দিয়ে সাজিয়ে মিছিল বের করে। স্লোগানে স্লোগানে 'শহীদ' বানিয়ে দেয়। বুধনেরা হাত পা ছুঁড়ে ক্রুদ্ধ গলায় বলে, এ হত্যার বদলা তারা নেবেই। শরৎমাস্টার আর মহাদেবরা জেল থেকে ফিরে এলে নিমুর রক্তের শোধ তারা তুলবেই।

মুচিপাড়াবাউরিপাড়ার মানুষগুলো প্রিয়জনের সদ্য-ঝরা রক্তের মধ্যে দগ্ধগৃহের ভস্মস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে সে প্রমত্ত চিৎকার কান পেতে শোনে। তাদের হাত পা মুখের পেশী শক্ত হয়। চোখ জ্বলতে থাকে অঙ্গারের মত। কিন্তু ঘর থেকে, পাড়া থেকে বেরুবার সাহস পায় না তারা। কেন না শোকমিছিলের আগেপরে রাইফেল উঁচিয়ে পুলিশের গাড়ি পাহারায় থাকে। নিজের ঘরে-উঠোনে দাঁড়িয়ে ব্যর্থ আক্রোশে তারা দাপাদাপি করে। গতরাত্রে তাদের ঘরের শুধু যে ধানচালবাসনপত্র লুঠ হয়েছে এমন নয়, কাস্তেকুড়ুল-লাঙলের ফলা সহ কোদালখানাও তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। সম্ভবত ওগুলো বেআইনি ও বিপজ্জনক অস্ত্র বলে ভেবেছে তারা। নামুপাড়ার মানুষ এই মুহূর্তে বড় অসহায়।

শোকমিছিলের গর্জন সন্ধ্যার মুখে ডাঙ্গাপল্লীতেও এসে পৌঁছায়। কাজলকে কিছু বলতে হয় না। অফিসআদালত-ফেরৎ মানুষগুলো নিজেরাই এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। মৃতদেহটা নিয়ে ওরা

ঢুকবে নাকি এ পাড়ায়? ঢুকতেও পারে। নিমু তো এ পাড়ারই ছেলে। তার বাড়ির সামনে নামানো হবে না তার শবদেহ।

সরোজের অপেক্ষায় কাজল বসে ছিল তার বাড়িতে। দ্রুত সাইকেল চালিয়ে শহর থেকে সরোজ ফিরে এসেই বলে, 'নিশিন্দায় আজ রাতে আবার গোলমাল হবে। শুনলুম ছুরিছোরাবোমা নিয়ে শোকমিছিল করেছে ওরা—'

কাজল বলে, 'আপনি একটু বসুন সরোজদা। বড় হাঁপাচ্ছেন।'

সরোজ বলে, 'এ পাড়ায় ঢুকবে না তো কাজল?'

কাজল বলে, 'সব বলছি। আগে একটু জিরিয়ে নিন।'

সরোজ হাতেমুখে জল দিতে যায়। কাজল কান পেতে শোক মিছিলের গর্জন শোনে। এ পাড়ার বুকে এখুনি আসবে বলে আশঙ্কা করে না। কেননা বিকেলের দিকে নিমুদের বাড়িটা সে দেখে এসেছে। নগেনবাবুর চাকর বনমালী তখন বড় বড় তালা লাগাচ্ছিল নিমুদের ঘর-দরজায়। নিমুব মা আর দিদি দুপুরের দিকে চলে গেছে নিশিন্দায়। নগেনবাবুর নির্দেশে বনমালীই নাকি রিক্সা ডেকে বৃন্দাবন সরকারের ঘরে তুলে দিয়ে এসেছে ওদের। খোকনেরা আপাতত তাদের দায়িত্ব নিয়েছে। পরে নগেনবাবু যা-হয় ব্যবস্থা করবেন। তালায় চাবি আঁটতে আঁটতে বনমালীই বলে এসব কথা। চাবি এখন থাকল নগেনবাবুর কাছে। মা-দিদিসহ নিমুদের ঘরদরজার দায়দায়িত্ব এখন তো নিশিন্দার বাবুদের পক্ষে তাঁরই।

নিমুর মা নিশিন্দা চলে যাওয়ায় কাজল এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। ওরাই যদি না থাকল—তাহলে নিমুকে নিয়ে শোকমিছিল ঢুকবে কেন এ পাড়ায়? কাজলের আশঙ্কা অন্যরকম। ওরা যদি আসে আসবে শেষ রাতে। নিমুকে ময়ূরাক্ষীর সতীঘাটায় পুড়িয়ে। এ পাড়ার মানুষ যখন ঘুমে অচেতন থাকবে, তখন। হামলা-হাঙ্গামা লুটপাট করে নিশিন্দায় ফিরে যাবে। সুদেব-সনাতনের কথা থেকেও তার আঁচ পাওয়া গেছে।

একটুপরে সরোজ ফিরে এলে কাজল তাকে নিয়ে কাঠের সিঁড়ি

ভেঙে উপরের ঘরে যায়। মুখোমুখি বসে বলে, 'নিশিন্দা থেকে খবর এসেছে, আজ রাতে এ পাড়ায় একটা হাঙ্গামা হতে পারে সরোজদা।'

সরোজের মুখ শুকিয়ে যায়, 'কে খবর দিল ?'

'আমাদের লোক। খুব বিশ্বস্ত।'

'ওদের এত তর্জনগর্জন দেখে আমিও সে আশঙ্কাই করছিলাম! ওই শোন, কেমন বিকট চেঁচাচ্ছে সব—'

'চেঁচাক! আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন সরোজদা ?'

'ভয়! না ভয় পাচ্ছি না।'

'পাচ্ছেন। আপনার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

সরোজ চুপ করে থাকে। মুখ মনের দর্পণ। সেখানে যদি আতঙ্ক ফুটে উঠে থাকে কি করে লুকোবে সে। তাছাড়া ভয় তো সে সত্যি পেয়েছে। বন্দুকটা হাতছাড়া হওয়ার পর থেকে সে ভয় পেতে শুরু করেছে, থানা-পুলিশের অত্যাচার তাকে আরো আতঙ্কগ্রস্ত করেছে, অবশেষে নিমুর হত্যার বিবরণ শুনে তার স্নায়ু একেবারে ভেঙে পড়েছে। কোথাও কোনোদিকে আর জোর পাচ্ছে না। অথচ তার বুকেই একদিন দুরন্ত সাহস ছিল। গভীর নির্জন রাতে একাই বন্দুক দিয়ে ছুটে যেত সে চোর ধরতে। বুধনের বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে সে-ই বলেছিল, 'দাঁড়া শালা, হাত তুলে দাঁড়া!' একটা বন্দুকের এত জোর! সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে সে কিনা ভেবেছিল একদিন সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘ মারতে যাবে!

কাজল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সরোজের দিকে। চিন্তিত বয়স্ক গম্ভীর মুখ তার। যেন সরোজের মুখের রেখা থেকে তার সমস্ত মনটাই জরিপ করে নিতে চাইছে। সরোজের এমন ভেঙে-পড়া মূর্তি তার অসহ্য মনে হচ্ছে। একটুপরেই সে গভীর গলায় বলে, 'সরোজদা, মনের জোরটাই আসল জোর। আপনার তো সে জোর আছে। তবু আপনি ভয় পাচ্ছেন।'

কথাটার অর্থ ঠিক ধরতে পারে না সরোজ। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে

কাজলের দিকে তাকায়। কাজল স্থির শান্ত গলায় বলে, 'থানা-পুলিশের এত অত্যাচারেও আপনি তো মানসের নাম বলেন নি সরোজদা।'

সরোজ একটু চমকে ওঠে, 'মানসের কথা কেন?'

কাজল বলে, 'আমার কাছে মিথ্যে লুকোনোর চেষ্টা করছেন। আপনার এই ঘর থেকে এত সহজে বন্দুক মানস ছাড়া আর কেউ নিতে পারে না। আপনি থানায় কেন তার নাম বললেন না? বলুন, কেন বললেন না?'

সরোজ আস্তে আস্তে বলে, 'ঘৃণায়।'

'রাইফেলের মুখে দাঁড় করালে বলতেন?'

'বোধ হয় না।'

'কেন বলতেন না?'

সরোজ একই উত্তর দেয়, 'ঘৃণায়। এই থানাপুলিশকে আমি ঘৃণা করি।'

'ওরা তো হুকুমের চাকর, সরোজদা। তার চেয়েও বেশি ঘৃণ্য যারা ওদের চালায়।'

সরোজ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ে, 'ঠিক কথা।'

কাজল এবার সামান্য উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে, 'এত ঘৃণা আপনার! এত মনের জোর! তবু আপনি ভয় পাচ্ছেন। ঘরে বন্দুক নেই, বর্শা তো আছে। পাড়ায় এতগুলো মানুষ আছি আমরা। কেন ভয় পাচ্ছেন আপনি? কিসের ভয়!'

কাজলের কথায় সরোজের রক্তের মধ্যে হঠাৎ যেন তোলপাড় একটা ঝড় বইতে শুরু করে। নিজেকেই যেন অকস্মাৎ নিজে আবিষ্কার করতে থাকে সরোজ। সত্যি তো, এমন করে কখনো তো ভাবে নি সে। থানায় ভুবন সমাদ্দার তার গলায় জ্বলন্ত সিগেরেট চেপে ধরেছিল, একদিন বুটজুতো দিয়ে পিষে তার পায়ের পাতা থেঁৎলে দিয়েছিল, আর একদিন চুলের মুঠি ধরে এত জোরে হেঁচকা টান দিয়েছিল যে তার চুল ছিঁড়ে মাথা দিয়ে রক্ত

গড়িয়ে নামছিল—তবু তো মানসদের নাম বলে নি সে। কেন বলে নি? সে তো মানসদের দলের লোক নয়। তাদের রাজনীতিও সমর্থন করে না সে। তবু এত জোর সে কোথায় পেয়েছিল। এমন প্রতিরোধ মনের কোন্ উৎসে লুকিয়েছিল! ঘৃণা? যদি তাই হবে তাহলে যাদের নির্দেশে ওই বর্বর থানাপুলিশ গতকাল ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিশিন্দার নামুপাড়ায়, ঘরে আগুন লাগিয়েছিল, গুলি করে মানুষের রক্ত ঝরিয়েছিল—তাদের প্রতি ঘৃণা জাগে না কেন তার। ক্রোধে জ্বলে ওঠে না কেন শরীর? কার ভয়ে। কিসের ভয়ে! পুলিশ-মিলিটারির রাইফেলের মুখে যে দাঁড়াতে চেয়েছিল—নিশিন্দার খোকন-বুধনদের তার কিসের ভয়!

সরোজের মনের মধ্যে সমস্ত লুপ্ত সাহস মরা নদীতে বান আসার মত কল কল শব্দ তুলে ফিরে আসতে থাকে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোতেও কাজল স্পষ্ট দেখে—সরোজের মুখের আশ্চর্য রঙ পরিবর্তন। সেই দুর্বল ভঙ্গুর ফ্যাকাশে ভাবটা কেটে যাচ্ছে। রক্ত উঠে আসছে মুখে। চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে সরোজ। চোখের দৃষ্টি ধারালো হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে মোমবাতির শিখার মত!

কাজল বলে, ‘চলুন, সরোজদা। আজ রাত-পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে।’

মুহূর্তে সরোজ উঠে দাঁড়ায়। টান টান সোজা তার ভঙ্গি। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে শব্দ তুলে নীচে নেমে বলে, ‘দাঁড়াও, আমাদের বর্শাটা কোথায় আছে দেখি—’

ডাঙ্গাপল্লীর বুকে একটু একটু করে রাত বাড়ে। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে আসে। চাঁদটাকে মনে হয় প্রাণহীন, বিবর্ণ।

সরোজ আর কাজলের ডাকে সকলেই এক এক করে জড়ো হয় ঘোষালমশায়ের ঘরে। শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য এখন আর

বাইরের বারান্দায় বসা যায় না! ঘোষালমশাই বড় ঘরখানায় বসতে বলেন সবাইকে। তাতে সকলের জায়গা হয় না। বারান্দাতেও থাকে কেউ কেউ।

কাজল পরিষ্কার করে কিছু বলে না। শুধু বলে, 'আজ রাতটা ভাল নয়। সজাগ থাকতে হবে সবাইকে।'

এত উদ্যোগ-আয়োজন দেখে জটিল ভয় পেয়ে যায়। বলে, 'কেন, কি হবে কাজল?'

কাজল বলে, 'হবেই এমন কোনো কথা নেই। তবু সজাগ থাকতে হবে। নিমুকে নিয়ে হল্লা করতে করতে ওরা শ্মশানে গেছে। ফেরার পথে কি করে—'

জটিল আরো ভয় পেয়ে যায়, 'কেন? কি করবে?'

উৎপল বিরক্ত হয়ে বলে, 'তোমার গলা কাটবে। চুপ কর দেখি তুমি।'

জটিল মুখখানা গম্ভীর করে বলে, 'সেদিনই আমি বলেছিলাম সরোজদা—'

সরোজ ঘুরে তাকায় তার দিকে, 'কি বলেছিলে?'

'ওসব চালের গাড়ি ধরাটরা—'

সরোজ হঠাৎ রেগে যায়। বলে, 'ধরেছি বেশ করেছি। আবার গেলে আবার ধরব। বন্দুক নেই তো কি হয়েছে। বর্শা আছে। কুঁচ দিয়ে যেমন মাছ মারে—বর্শা দিয়ে তেমনি শালাদের বুকপিঠ গেঁথে ফেলব!'—এত জোরে আর এমন তেজের সঙ্গে সরোজ কথাগুলো বলে যে ঘরের সমস্ত লোক ঘাড়মাথা উঁচু করে তাকায় সরোজের দিকে। অনেকদিন সরোজ এমন উঁচুগলায় কথা বলে নি। কেমন যেন মনমরা হয়ে ছিল। মুখে ফুটে থাকত আতঙ্কের ভাব। চোখে থাকত নিষ্প্রভ মলিন দৃষ্টি। তার সেই বিষণ্ণ স্তিমিত চেহারা দেখে পাড়ার লোকও থানাপুলিশের অত্যাচারের কথা ভেবে ভয়ে ভয়ে থাকত। আজ হঠাৎ আবার সরোজের এই মারমুখী বলদর্পিত রূপ দেখে ডাঙাপল্লীর লোকও বুক ফুলিয়ে সাহসী হয়ে

উঠল। আগুন থেকে যেমন আগুন জ্বলে সাহস থেকেই তেমনি সাহস ছড়িয়ে পড়ে। থানাপুলিশের এত অত্যাচার উপেক্ষা করে সরোজ যদি এমন টান টান হয়ে দাঁড়াতে পারে, তারা পারবে না?

সরোজের কথা শেষ হতে না হতেই অনেকগুলো গলা একসঙ্গে গমগম করে ওঠে, 'হ্যাঁ, আসুক কে আসবে। সারারাত জেগে পাহারা দেব আমরা। পাড়ায় কেউ ঢুকলে ছাদ থেকে ইট মেরে মাথা থেঁৎলে দেব।'

কাজল বলে, 'না, ওভাবে হৈ হৈ করে রাত জাগা যাবে না এখন। দশটার পর থেকে শহরে কার্ফু জারি হয়—'

নরেন বলে, 'তাতে আমাদের কি। এ পাড়া তো শহরের মধ্যে পড়ে না।'

ঘোষালমশাই বলেন, 'তা না পড়ুক। কাজল ঠিকই বলেছে! হৈ-হল্লার দরকার কি। চুপি চুপি জাগবে। পাঁচসাতজন করে এক-একটা দলে ভাগ হয়ে ঢাকা-বারান্দা দেখে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। দরকার না হলে টর্চ জ্বালাবে না—'

ঘোষালমশায়ের পরামর্শই মনোমত হয় সকলের। জটিলও আর আপত্তি করে না। শুধু বলে, 'আমি কিন্তু সরোজদাদের সঙ্গে থাকব।'

এরপর রাত এগারোটার কাছাকাছি খাওয়াদাওয়া সেরে গরম জামাকাপড় গায়ে কাজল-উৎপল-সরোজ-নরেনরা প্রায় বিশ-বাইশজন শক্তসমর্থ মানুষ বর্শা বল্লম হাতে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে যায় ডাঙ্গাপল্লীর ঠিক মাঝখানটিতে। এই ফাঁকা জমিটুকুতে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা হয়। আজ কারো বাড়ি গিয়ে ডাকাডাকি করতে হয় না। কেউ কোনো ওজর-আপত্তি তোলে না। একটুপরে বর্শা হাতে মোটা ওভারকোট গায়ে শশাঙ্কও এসে দাঁড়ায়। তার গলায় মাফলার, মাথায় উলের কানঢাকা টুপি। আজ দুপুরেই কলকাতা থেকে ফিরেছে। চিত্রলেখাও এসেছে। আজ চিত্রলেখা শশাঙ্ককে গরম পোষাকে সাজিয়ে দেয় কিন্তু হাতে বর্শা দিতে ভোলে না। তার ভাইটার এখনো খোঁজ পাওয়া যায় নি।

এতগুলো সশস্ত্র সংঘবদ্ধ মানুষকে একসঙ্গে কঠিন ভয়হীন মুখে জড়ো হতে দেখে কাজলের চোখ খুশিতে জ্বল জ্বল করে। একদিন এইকথাই তো ভেবেছিল সে। চোরধরার রাতজাগা দলটা পরিবর্তিত হবে একটা সচেতন সংগঠনে। ঘরের সামান্য ঘটিবাটি চুরির সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর হিসেব থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে আরো বড় সংগ্রামের ক্ষেত্রে। এই মানুষগুলো ক্রমে ক্রমে আপন অভিজ্ঞতায় পুড়তে পুড়তে সেই দিকেই কি পথ হাঁটছে না?

সরোজের মনেও যেন একটা নতুন বিশ্বাসের জন্ম হয়। রাতের নিবিড় অন্ধকারে নিঃশব্দ ডাঙ্গাপল্লীর বুকে এতগুলো মানুষকে এই অবস্থায় দেখে মনে হয়, এত মানুষ একসঙ্গে জোটবদ্ধ থাকলে খালিহাতেও বুঝি বাঘের সঙ্গে লড়াই করা যায়!

মাঠে দাঁড়িয়ে ওরা কে কোন্‌দিকে কোন্‌-বারান্দায় বসবে তার পরামর্শ করছে এমনসময় নগেনবাবুর ছাদ থেকে আলোর ঝলক এসে পড়ে। শীতের ঘুম-ঘুম কুয়াশার স্তর ভেদ করে আলোটা নিমুদের বাড়িঘরদরজার উপর ঘুরপাক খায়। তারপর ধানমাঠের দিকে অল্পকাল ছুটোছুটি করে কাজলদের উপর এসে পড়ে। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে আবার অন্যদিকে সরে যায়।

দলবাঁধা মানুষগুলো চমকে ওঠে। রাগে-আক্রোশে কাজলের বুকের রক্ত ছলছলিয়ে ওঠে। তার মনে পড়ে কাল রাতে সে আর নরেন যখন বর্শাহাতে নামুপাড়ার দিকে ছুটে যাচ্ছিল—তখন আলো ফেলে নগেন তাদের অনুসরণ করেছিল। এই নগেনই কি আজ নিশিন্দায় বসে খোকন-বুধনদের পরামর্শ দিয়েছে ডাঙ্গাপল্লীর উপর হামলা করার? অসম্ভব না। নিমুকে হত্যার মূলে নগেনের যে একটা বড়রকমের হাত আছে, এ কথাও কাজল বিশ্বাস করে। সে চাপাগলায় বলে, 'দেখ সরোজদা, নগেনটা আলো ফেলছে। মহাদেবরা বলে, শয়তানের চোখ ঘুরছে!'

শশাঙ্ক বলে, 'এত রাতে ও ছাদে কেন?'

সরোজ চিন্তিত মুখে বলে, 'আমরা তো ওকে ডাকি নি। কোনো খবরও দিই নি।'

কাজল বলে, 'মনে হয় কিছু একটা আঁচ করে ওয়াচ্ করছে আমাদের। আলোটা কোনো সিগ্ন্যাল নয় তো?'

জটিল বলে, 'নিবে গেছে। আর দেখা যাচ্ছে না।'

সকলেই সতর্ক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নগেনের ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু আলোটা সত্যি আর দেখা যায় না। একটুপরে নগেনের দোতলায় কোলাপ্সেবল্ গেট টানার শব্দ হয়। তারপরে নীচের উঠোনের দরজা খোলার শব্দ ওঠে। স্বয়ং নগেন চৌধুরী দামি শাল মোড়া লম্বা লোমশ শরীরখানা নিয়ে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসেন। রাতজাগা মানুষগুলোর মনের মধ্যে কেমন পিচ্ছিল একটা অনুভূতির শিরাশিরানি জাগে। যেন মানুষ না, রাতের অন্ধকারে আলোছায়ার বৃত্ত তৈরি করে বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে বিশাল একটা ময়াল সাপ। মাঠের মধ্যে সকলেই আরো একটু ঘন হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কোনো কথা বলে না। নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করতে থাকে।

চটিজুতোর ফট্‌ফট্ শব্দ তুলে ঘাসহীন শুকনো ডাঙ্গাপথ দিয়ে নগেন আরো এগিয়ে আসেন। টর্চ ঘুরিয়ে এমনভাবে নীচে-উপরে আলো ফেলেন যাতে সকলেরই মুখচোখ পরিষ্কার দেখা যায়। হাতে হাতে বর্শাবল্লমের তীক্ষ্ণধার মুখ আলোতে চক চক করে। নগেন ভারি অবাক হয়ে বলেন, 'কি ব্যাপার? মধ্যরাতে ঘর ছেড়ে বর্শাটর্শা নিয়ে মাঠে কেন? একটা যুদ্ধ শুরু হবে মনে হচ্ছে। দলনেতা কে? কাজল নাকি?'

কেউ কোনো উত্তর দেয় না। স্থির শক্ত শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নগেনের টর্চ জ্বলে আর নেভে। উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হয়ে নগেন এবার সোজাসুজি দু'একজনের মুখের উপর টর্চ ফেলেন। তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। নগেনের আত্মসম্মানে লাগে। লোকগুলো কথার উত্তর দেয় না কেন! কি ভেবেছে শালারা। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে

তিনি কিছু একটা বলতে চান—কিন্তু সেইমুহূর্তে কাছেই কোথাও একটা রাতজাগা পাখি কর্কশ গলায় ডেকে ওঠে এবং তারপরই গাছের ডালপালার মধ্যে দুটো পাখির প্রবল ডানাঝাপটাঝাপটির শব্দ শোনা যায়। যেন বাসস্থানের অধিকার নিয়ে ক্রু-কর্-র্র্-শব্দে ঝগড়া শুরু করে দেয় তারা। তখন দুটো পাখি একসঙ্গে চেঁচাতে থাকে।

নগেন সামান্য চমকে টর্চ ঘুরিয়ে ওপাশে শশাঙ্কদের বাড়ির আম-গাছটার উপর আলো ফেলেন। তারপর ডানপাশে সরিয়ে মানসদের বাড়ির উপর আলো ফেলেই প্রবলভাবে চমকে ওঠেন। রীতিমত ভয়ের গলায় বলেন, 'কি? ওটা কি? কি লাফ দিয়ে নামল পাঁচিল থেকে?'

আলোতে মানসদের বাড়ির জোড়া নারকেলগাছ দেখা যায়। একটা সজনে গাছও ডালপালা ছড়িয়ে আছে। এবার শশাঙ্ক কথা বলে। মানসদের বাড়ির দিকে চোখ রেখে বলে, 'কই কি নামল?'

নগেন আলোটা স্থিরভাবে ফেলে প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মানসদের তালাবন্ধ বাড়ির দিকে। তার হাত পা শরীর অল্প কাঁপতে থাকে। খসখসে গলায় বলেন, 'কিছু নয় তো? ঠিক দেখেছেন আপনারা? ঠিক বলছেন?'

কাজল বিরক্ত হয়ে বলে, 'আমরা আবার কে কি দেখলাম। যা দেখার আপনিই দেখেছেন, যা বলার আপনিই বলছেন।'

তবু নগেনের সন্দেহ যায় না। ক'পা এগিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টর্চ ফেলে গাছপালাসহ বাড়িটা ভাল করে দেখতে থাকেন তিনি। তারপর ভয়ের ভাবটা সামলে নিয়ে বলেন, 'ধুৎ, কিছু না। বেড়াল টেড়াল হবে। কিন্তু বাড়িটা খুব বিপজ্জনক। একটু নজর রাখবেন আপনারা। বাইরে তালাবন্ধ থাকলে কি হয়—ভেতরে হয়ত ঘর দরজা খোলা, নানারকম কাণ্ডকারখানা চলে রাতে রাতে—'

একটু থেমে, দম নিয়ে নগেন আবার কিছুটা এলোমেলো ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, 'বর্শাবল্লম নিয়ে ঘুরছেন। ওসবের কোনো দাম নেই এখন। যা দিনকাল, এখন যা করার স্টেনগান ব্রেনগান নিয়ে করবে

মিলিটারি! দেখছেন না, কেমন সুন্দর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়। দেখলেও বুকে বল হয়। ক'মাস ধরে ভূতের তাণ্ডব চলছে জেলা জুড়ে। এবার সব ঠাণ্ডা করে দেবে। কালও গুলি চালিয়ে খতম করেছে সাতটাকে—'

কাজলেরা কঠিন মুখে চুপ করে থাকে। কেউ একটা শব্দও করে না। নগেন ফের পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসেন। কিন্তু তার দৃষ্টি থাকে মানসদের বাড়ির দিকে এবং মাঝে মাঝেই টর্চটা ঘুরিয়ে ফেলতে থাকেন সেদিকে। সরোজ ও কাজল উভয়ের মুখেই একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে ওঠে। নগেন কেন এত ভয় পাচ্ছেন তা তারা বুঝতে পারে। অন্ধকারে কাজল একবার সরোজের হাতও টিপে দেয়।

নগেন এবার রীতিমত রুষ্ট গলায় বলেন, 'দলবেঁধে আপনারা বর্শা টর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন বলবেন তো? আমিও তো পাড়ায় থাকি, নাকি?...এই যে জটিলও আছ দেখছি! কি ব্যাপার বল ত?'

জটিলের মুখের উপর সোজাসুজি আলো পড়তেই সে কেমন ঘাবড়ে যায়। মুখ ফস্‌কে বলে ফেলে, 'পাড়ায় আজ একটা হামলা হবে, নগেনদা।'

'হামলা। কিসের হামলা। কারা করবে?'

কিন্তু জটিল আর কথা বলে না। শিশির পা দিয়ে তার পায়ের পাতার উপর কষে চাপ দিয়েছে। একটু ব্যথাও পেয়েছে জটিল। মুখটা বিকৃত করে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। নগেন সকলের মুখ দেখার চেষ্টা করেন। তারপর হঠাৎ খুক্ খুক্ করে হেসে ওঠে বলেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি! আপনারা খোকনদের ভয় করছেন। ভাবছেন নিমুর খুনের বদ্‌লা নিতে আসবে আপনাদের উপর। আরে না, না! আপনাদের কি দোষ। ও তো শরৎমাস্টার আর মহাদেবমুচির কাজ! আমরা সব জেনে ফেলেছি। আপনাদের ভয় কি। যান, যান, ঘুমোতে যান! আমি আছি কেন পাড়ায়? কিছু হলে আমি দেখব। যান, আপনারা ঘুমোতে যান—'

কেউ নড়ে না। কথাও বলে না।

নগেনের উঁচু গলার কথাবার্তা শুনে সেলাই করা পুরনো একখানা গরমচাদর মুড়ি দিয়ে টায়ারের চটি পায়ে ঘোষালমশাইও এগিয়ে আসেন। তিনি শুয়ে পড়েছিলেন—কিন্তু ঘুমোন নি। কাজল পায়ের শব্দ পেয়ে টর্চ ফেলে তাঁকে পথ দেখায়। কাছে এলে বলে, 'এই ঠাণ্ডার মধ্যে আপনি আবার কেন উঠে এলেন মেসোমশাই?'

ঘোষালমশাই বলেন, 'কালীর মা যে বলল নগেনবাবুর গলা শোনা যাচ্ছে মাঠে। কই? নগেনবাবু কই?'

নগেন চৌধুরী বলেন, 'এই যে আমি! দেখুন দেখি কি কাণ্ড! কোথাও কিছু নেই—দল বেঁধে সব রাত জাগতে বসেছে!'

ঘোষালমশাই বলেন, 'ভালই করছে। আপনিও জাগুন না সঙ্গে। তাহলে আর ভয় থাকে না!'

নগেন চুপ করে যান। অন্ধকারে তাঁর মুখের ভাব কঠিন হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টিতে হিংস্রতা ফুটে ওঠে। ঘোষালমশাই কাজলের হাত থেকে টর্চখানা নিয়ে নগেনের শরীরের নীচের অংশে আলো ফেলে বলেন, 'দিব্যি গরম জামাকাপড় পরা আছে! রাতটা আজ জেগেই যান ওদের সঙ্গে। আমরা বুড়োবুড়ীরা একটু নিশ্চিন্তে ঘুমুই!'

নগেন রাগ সামলে শব্দ করে হেসে ওঠেন, 'ছেলেছোকরাদের সঙ্গে ওঠাবসা করে আপনিও ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছেন ঘোষালমশাই! আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি নিশিন্দায় খবর নিচ্ছি!'

'খবর নেবেন? কি খবর নেবেন?'

'ওই যে হামলা-টামলার কথা কি বলছে সবাই! আমি দেখছি ব্যাপারটা—'

নগেন আর দাঁড়ান না। ঘুরে বাড়ির দিকে রওনা হ'ন। যাওয়ার মুখে আর একবার টর্চ ফেলেন মানসদের বাড়ির উপর। আর ফেলেই বিবর্ণ মুখে আর্তনাদ করে ওঠেন, 'ওই তো! ওই যে পাঁচিল থেকে লাফিয়ে কে যেন ছুটে আসছে—'

সরোজ-কাজলেরাও ভয় পেয়ে যায়। সকলে মিলে একসঙ্গে টর্চ জ্বালায়। তারপর সবাই একসঙ্গে চাপাগলায় হেসে ওঠে।

একটা বড় আকারের হনুমান। লেজ উঁচিয়ে হাতে-পায়ে লাফিয়ে ছুটে যাচ্ছে ঝাঁকড়া নিমগাছটার দিকে। এ পাড়ায় দিনেরাতে এ রকম কিছু হনুমান ঘোরাফেরা করে। মাচার লাউকুমড়ো, খেতের বেগুনটমেটো, গাছের আমকলা ছিঁড়েখুঁড়েকামড়ে নষ্ট করে।

নগেনের সারাশরীর তখন কাঁপছে থরথর করে। তিনি আর একমুহূর্তও দাঁড়ান না। কাজল-সরোজদের সম্মিলিত চাপা বিদ্রূপের হাসি তাঁর গায়ে যেন হুল্ ফুটিয়ে দেয়, রক্তে জ্বালা ধরায়। ভয়ের মধ্যেও তাঁর মুখের রেখাগুলো ভয়ঙ্কর রকমের হিংস্র হয়ে ওঠে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে শেষবারের মত কাজলের শরীরের উপর একবার আলো ফেলে দ্রুত পায়ে নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে যান। তারপর উঠোনে ঢুকে ক্রুদ্ধ গলায় ডাকাডাকি শুরু করেন, 'বনমালী, বনমালী—এই শালা নবাবের বাচ্চা, গেলি কোথা! শালা পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস তো লোহা দিয়ে ঠুকে মাথা ভাঙ্গব।'

তার একটুপরেই বনমালীকে দেখা যায় ধানমাঠ ভেঙ্গে নিশিন্দার দিকে ছুটে যেতে।

কাজল-সরোজেরা চোখ রেখেছিল নগেনের বাড়ির দিকে। অন্ধকারেও টের পায় তারা—কে যেন মাঠে নেমে ছুটছে। কাজল এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে টর্চ ফেলে। চেঁচিয়ে বলে, 'কে? কে যায়?'

কেউ উত্তর দেয় না। কাজল ফিরে এসে বলে, 'নিশিন্দায় খবর চলে গেল সরোজদা—আমরা তৈরি আছি, আজ যেন হাঙ্গামা করতে না আসে! শ্মশানেও খবর পৌঁছে যাবে একটুপরে।'

সরোজ বলে, 'তাহলে আজ রাতের মত নিশ্চিন্তি!'

ঘোষালমশাই দাঁড়িয়েছিলেন তখনও। তিনি বলেন, 'মানুষ জেগে থাকলে শয়তানেরা চিরকালই ভয় পায় গো সরোজ!'

কাজল বলে, 'হ্যাঁ, মেসোমশাই, আসল কথা ওই জেগে থাকা—'

ডাঙাপল্লীর বুকে রাগে ও ঘৃণায়, আতঙ্কে ও প্রতিরোধে একটি রাত কাটে।

কিন্তু পরের রাতেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হয়।

মধ্যরাত্রে শহরের উপান্তে নিরিবিলি নির্জন দ্বীপখণ্ডের মত ক্ষুদ্র জনপদটুকুর বুকে প্রায় নিঃশব্দে কয়েকগাড়ি সি. আর. পি এসে নামে। সঙ্গে ছোট জীপগাড়িতে আসে ভূষণ সমাদ্দার।

গাড়ির মাথায় লাগানো বিশেষ একধরণের তীব্র উজ্জ্বল আলোর আঘাতে পাড়ার বাড়িঘরগাছপালাসহ ঘাসের ডগাগুলো পর্যন্ত চকচকিয়ে ওঠে। রাতের বেলা অকস্মাৎ দিবালোকের মত স্পষ্ট অস্বাভাবিক আলোর ছটা দেখে পাড়ার কুকুরগুলো ডাকতেও ভুলে যায়। দু'পাশে ছুটে গিয়ে অন্ধকারের আড়াল বেছে নিয়ে লেজ উঁচিয়ে সতর্ক সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। ঝাঁকড়া পাকুড়গাছটায় একজোড়া হনুমান ভয় পেয়ে বুকে হেঁটে নীচু ডাল থেকে নিঃশব্দে উপরের দিকে উঠে গিয়ে দু'হাতে ঘনপত্রপল্লব সরিয়ে উঁকি মারতে থাকে। কিন্তু প্যাঁচাগুলো ডানা ঝটপট করে চেঁচিয়ে ওঠে। আলো তাদের সহ্য হয় না।

গাড়ি থেকে পুলিশ নেমে দ্রুত সমস্ত পাড়া ঘিরে ফেলে। বিশেষ করে মানসদের বাড়িটা। ও-বাড়ির চারদিকে ডজন দুই সি, আর, পি রাইফেল উঁচিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে যায়। তারপরই তালাবদ্ধ দরজার উপর বুটজুতোর প্রচণ্ড লাথি পড়তে থাকে। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবে তারা। পাঁচিল টপ্‌কে উঠোনে নামার সাহস নেই।

নির্জন নিঃশব্দ রাত্রে কাঠের দরজার বুকে কয়েকজোড়া ভারি বুটের লাথি পড়তেই এক ভয়ঙ্কর ধ্বনিবৃত্তের সৃষ্টি হয়। ঘরে ঘরে ঘুমন্ত মানুষ আচমকা জেগে ভয়েভাবনায় কাঁপতে থাকে। মায়ের বুকে বাচ্চারা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। তাদের মুখে হাত চাপা দিয়ে কান্না থামাতে চায় মায়েরা। পুরুষেরা লেপকম্বল সরিয়ে ঝাঁপ দিয়ে খাট থেকে নেমে কাঁপা কাঁপা হাতে বর্শাবল্লমের খোঁজ

করে। ঘরের মেয়েবউরা ঘুমভাঙা এলোমেলো শরীর নিয়ে রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কে নীলপাংশু মুখে ঘরের পুরুষদের একরকম জড়িয়ে ধরে ছটফটে গলায় বলে ওঠে, 'না, বেরুবে না। কিছুতেই না। আগে হাঁকডাক করে বেরুক সবাই—'

ঘোষালমশাইও মশারি সরিয়ে মেঝেয় নেমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যান। পারুলেরাও জেগে উঠেছে। বন্ধ দরজাজানালার ফাঁক দিয়ে সার্চলাইটের আলোর রেখা ঘরে এসে পড়েছে। ভারি বুট-জুতার খট্‌খট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। কারো বাড়ির বন্ধ দরজা পদাঘাতে ভেঙ্গে পড়ছে।

ঘোষালমশাই অস্থির গলায় বলেন, 'সর্বনাশ হয়েছে। নিশিন্দা থেকে আজ হামলা করতে এসেছে ওরা। কার বাড়ির দরজা ভাঙ্গছে—'

পারুল ছুটে বাবার কাছে এসে দু'হাতে ঠেলে খাটের উপর বসিয়ে দিয়ে চাপাগলায় বলে, 'ভাঙ্গুক। তুমি ছটফট করে বাইরে বেরুবে না তো বাবা!'

ঘোষালমশাই বলেন, 'আঃ, কি মুস্কিল! খাটের তলা থেকে তুই আমার লাঠিখানা বের করে দে দেখি—'

পারুল সে কথায় কান দেয় না।

বাবাকে বসিয়ে দিয়ে ছুটে এসে একটা জানালার সরু ফাঁকে চোখ রেখে বাইরের দিকটা দেখার চেষ্টা করে। প্রায় কিছুই দেখা যায় না। তবু যেটুকু দেখে তাতেই বুক কেঁপে ওঠে। বলে, 'বাবা পুলিশের গাড়ি। বন্দুক হাতে পুলিশ ছুটছে। মাথায় আলো জ্বলছে—'

ঘোষালমশাই আবার উঠে দাঁড়ান, 'পুলিশ! পুলিশ কেন! আমরা কার জমির ধান ঘরে তুলে এনেছি, কোন্ মহাজনের গলা কেটেছি—'

পারুল বলে, 'বাবা, অনেক জুতোর শব্দ! অনেক পুলিশ! ওই শোন, কাদের বাড়ির দরজা ভেঙ্গে ফেলছে—'

ঘোষালমশাই কিছু বলতে চান এমনসময় ও-পাশ থেকে তীব্র ছটফটে গলায় কেউ চিৎকার করে ডেকে ওঠে, 'সরোজদা, শিশির, নরেন—'

পারুল বলে, 'কাজলদার গলা বাবা।'

'কাজলের গলা? তাহলে ও তো বাইরে বেরিয়ে পড়েছে!'

'বাইরে। কি বলছ বাবা!'

'হ্যাঁ, ওই তো আবার ডাকছে—'

বাইরে কোথাও কাজলের গলা আবার উচ্চগ্রামে ছটফটিয়ে ওঠে।

পারুলের সারা শরীর একবার প্রবলভাবে কেঁপে উঠে পরমুহূর্তে স্থির শক্ত হয়ে যায়। যেন আর কোনো উত্তেজনা নেই, অস্থিরতা নেই। কেমন অদ্ভুত ঠাণ্ডা নিস্তেজ গলায় বলে, 'ও মরবে! দেখো বাবা, ও আজ মরবে!'

বাইরে গুলির শব্দ হয়। রাত্রির আকাশ থর থর করে কেঁপে ওঠে। কিন্তু কোনো আর্তনাদ শোনা যায় না। মানসদের দরজা ভেঙ্গে পুলিশ ঢুকেছে ঘরে। ঢোকার মুখে ফাঁকা আউয়াজ করেছে তারা। বড় বড় টর্চের আলো ফেলে সঙীন উঁচিয়ে সামান্য কুঁজো হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে সারিবদ্ধভাবে ঘরে ঢোকে তারা। যেন সামনেই কোথাও ভয়ঙ্কর কোনো শত্রু-বাহিনী গেরিলা-কায়দায় ওৎ পেতে আছে। তাদের অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কায় পুলিশগুলোর চোখেমুখে আতঙ্কের সঙ্গে জান্তব হিংস্রতা ফুটে থাকে। সন্তর্পণে পা ফেলে এগোয় তারা।

জীপগাড়ি থেকে পুলিশের মাইকে ভূষণ সমাদ্দার ঘোষণা করে, 'কার্ফু জারি করা হ'ল বাইরে, ঘর থেকে কেউ বেরুলেই সোজাসুজি গুলি করা হবে। যে যেখানে যেমন আছ থাক চুপ করে!'

সেই ঘোষণার শব্দ ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। কাজলের গলাও আর শোনা যায় না। কার্ফু শুনে মেয়েবউদের বুকের রক্ত হিম হয়। হাত বাড়িয়ে বাতি জ্বালানোর সাহসটুকুও পায় না তারা। যারা জ্বালিয়েছিল ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেলে। কাজলের ডাকে বর্শা

বল্লম হাতে বাইরে বেরুতে গিয়েও সরোজ শিশির নরেনেরা থমকে দাঁড়ায়। ঘরের ঘোলাটে অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বল জ্বল করে। কি করবে ঠিক করতে পারে না।

এদিকে মানসদের বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া যায় না। মানুষজন দূরে থাক—একটা কাগুজে-ইস্তেহার পর্যন্ত না। ঘরের সামান্য আসবাবপত্র যা ছিল ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে বাইরে ছুঁড়তে থাকে পুলিশগুলো। আলো ফেলে নারকেলগাছের মাথা থেকে কুয়োর ভেতরটা পর্যন্ত দেখে। তাতেও সন্দেহ যায় না। দড়ি ঝুলছে কেন কপিকল থেকে। যদি কেউ নেমে গিয়ে ডুবে থাকে। উঠোনের একপাশে থাকবন্দি সাজানো ইট থেকে কয়েকটা তুলে নিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলতে থাকে তারা। ভারি ইট জলে পড়ে শব্দ হয় ঝপাং ঝপাং। সেই শব্দে একেকসময় নিজেরাই কেঁপে ওঠে।

কিছু না পাওয়ার আক্রোশে ভূষণ দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'এ পাড়ার সব বাড়ি সার্চ করা দরকার। সাংঘাতিক পাড়া এটা। বর্শা বল্লম হাতে শালারা এখনো রাত জাগে। যাও, দেখো—'

হুকুম পাওয়া মাত্র পুলিশেরা তিনচার দলে ভাগ হয়ে আরো কয়েকটা বাড়িঘরদরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভূষণের ইঙ্গিতে কাজল আর নরেনের বাড়ির দিকেও রাইফেল উঁচিয়ে এগিয়ে যায় ক'জন। মানসদের বাড়ির গা ঘেঁষেই শশাঙ্কমাস্টারের বাড়ি। তার বন্ধ দরজায় স-বুট লাথি পড়ে। শশাঙ্কর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। তার বউ চিত্রলেখা আতঙ্কে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, 'কে আছ, বাঁচাও, বাঁচাও—'

মেয়েলি কণ্ঠের সেই আর্তনাদ কতগুলো কর্কশ পাথুরে গলার অট্টহাসিতে ডুবে যায়। আমকাঠের পলকা দরজা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়।

চিত্রলেখা থর থর করে কেঁপে ওঠে। বাইরের কদর্য হাসিটা যেন লোমশ ভালুকের থাবার মত তার নরম শরীরের সর্বত্র আঁচড় কেটে বেড়ায়। সে শিউরে ওঠে। সদ্য যাদবপুর থেকে ফিরেছে সে।

সেখানে এক তরুণী গৃহবধূর উপর পাশবিক অত্যাচারের করুণ কাহিনী শুনে এসেছে। স্বামীকে হত্যা করে শিশুকন্যার সামনেই দলবদ্ধভাবে বধূটিকে ধর্ষণ করেছে দুর্বৃত্তরা। পুলিশ, সি. আর. পি-র গাড়ি পাহারায় ছিল—কেউ রক্ষা করে নি। নিশিন্দার বাতাসীর কথাও শুনেছে চিত্রলেখা। চকিতে সে-সব কথা মনে পড়ে তার। কাঁপতে কাঁপতে চিত্রলেখা অস্ফুটে বলে ওঠে, 'দিও না! ঘরে ঢুকতে দিও না ওদের! ওরা মানুষ না, পশু। আমাকে ছিঁড়ে খাবে।'

শশাঙ্কর রক্তের মধ্যে দপ্ করে মশাল জ্বলে ওঠে। আত্মরক্ষা গৃহরক্ষার সঙ্গে আপন নারী রক্ষার আদিম তাড়নায় সে যেন মরিয়া হয়ে যায়। ভয়ভাবনা ঝেড়ে ফেলে অকস্মাৎ অসম্ভব সাহসী হয়ে ওঠে। বউকে একহাতে পেছনে ঠেলে অন্যহাতে বর্শা ধরে চেঁচিয়ে বলে, 'ভয় নেই! ভয় কি! কে কি করবে তোমার! বর্শা গেঁথে খুন করে ফেলব না আমি!'

বাইরের দরজায় সবুট পদাঘাত পড়তেই থাকে। মাইক বাজিয়ে ভূষণ আরো একবার কার্ফুর কথা শুনিয়ে দেয়। শশাঙ্ক ভেতরে কাঁপে কিন্তু বাইরে সদর্প ভঙ্গি নিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকে।

ও-পাশে অন্য কারো বাড়ি থেকে আবার প্রবল কান্নার শব্দ ওঠে।

সরোজের অবশ অচল বাবা বিড়বিড় করে বলেন, 'কি হ'ল? কার ঘরে ঢুকল? কে কাঁদে?

সরোজের মা বলেন, 'তুমি চুপ কর! চেঁচিও না অত!'

সরোজের বাবা বলেন, 'আমার ঘরে যদি ঢোকে! সরোজ! সরোজ কই!'

মা বলেন, 'আছে। তুমি চুপ কর!'

বাবা বলেন, 'না, না!, আমাকে দরজার কাছে নিয়ে যাও! ওরা এলেই যেন দেখতে পাই। ঘরে ঢুকলে আমার সরোজকে মেরে ফেলবে ওরা।'

সরোজের বাবার কথা শেষ হয় না। কাজলদের বাড়ির ওদিক-

টায় অনেকগুলো বুটজুতা একসঙ্গে দৌড়ে যায় একটা বাজখাঁই গলা চিৎকার করে ওঠে, 'ভাগ্‌তা হ্যায়, ও দেখো—'

সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ হয়। একটা, তারপর আরো একটা। কে যেন ছুটতে গিয়ে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে। সরোজের বাবার অচল অবশ হাত-পাও আমূল কেঁপে ওঠে, 'কে চেঁচায়? কাকে গুলি করল?'

সরোজের মা ছুটে এসে মুখে হাত চাপা দেন, 'চুপ কর, তুমি চুপ কর!'

কেঁপে ওঠেন ঘোষালমশাইও, 'কার গলা? কে চিৎকার করল?'

ঠাণ্ডা শীতরাত্রির আকাশ ছিঁড়েখুঁড়ে সুলেখার চিৎকার শোনা যায়, 'কাজল—আমার কাজলকে মেরে ফেলল ওরা।'

সেই তীক্ষ্ণ আকুল চিৎকারে ঘোষালমশায়ের সারা শরীর থর থর করে কেঁপে ওঠে। ডুকরে ওঠেন স্নেহলতাও। আর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে পারুলের শরীর যেন অবশ হয়ে যায়। তার মাথাটা কেমন ঘুরতে থাকে। পড়ে যাওয়ার মুখে ঘরের একপাশের দেয়াল ধরে ঠেস দিয়ে টাল সামলায় সে। একটাও শব্দ করে না। নিথর নির্বাক নিশ্চল শরীর নিয়ে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

সুলেখার চিৎকার থামতে না থামতে অন্যপ্রান্ত থেকে কেউ পাড়া কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। বয়স্ক মেয়েমানুষের গলা—'আমার নরেনকে ধরে নিয়ে গেল গো—'

পাড়ার বুকে ঘরের দরজায় দরজায় লাথি পড়তে থাকে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে দরজা খুলতে বলে। না খুললে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে। কাজলের মা'র কান্নার সঙ্গে নরেনের বুড়ী-মা'র গলা মিলে যায়। তার সঙ্গে আরো কিছু শিশু ও মহিলার কান্না যুক্ত হয়ে সমস্ত ডাঙ্গাপল্লীর আকাশবাতাস আতঙ্কপাণ্ডুর হয়ে ওঠে।

এইসময় পাড়ার মাঝামাঝি জায়গায় পলায়নপর একটা কুকুরের পেটে কে যেন লাথি মারে। শক্ত সবুট পায়ের লাথি। কুকুরটা কঁকিয়ে উঠে বারকয়েক ঘুরপাক খায়—তারপর কুঁই কুঁই শব্দ তুলে

ছুটতে থাকে। যে লাথি মারে সে হেসে ওঠে খ্যাক্‌-খ্যাক্‌ করে। কদর্য পাশবিক হাসি! সুলেখার কাতর কান্নার সঙ্গে সেই হাসিটা মিশে গিয়ে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্ম দেয়। ও-পাশে আরো একটা দরজার খিল ভেঙ্গে পড়ে। নারীশিশুর ভয়ার্ত কান্না চাপা দিয়ে প্রমত্ত উল্লাসের অট্টহাসি হা হা করে ওঠে সেখানেও।

সরোজ শিশির উৎপলেরা আর ঘরে থাকতে চায় না। ছটফট করে। এমন কি জটিল দাসও বউয়ের হাত ছাড়িয়ে বর্শা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে চায়। বলে, 'না বেরুলে দরজা ভেঙ্গে ঢুকবে! আগেই বেরুই! ইঁদুরের মত জাঁতাকলে মরি কেন!'

সরোজ লাফিয়ে দরজার দিকে এগোয়। সরোজের বাবা কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, 'আমার বন্দুকটা? বন্দুকটা আন খোকা!' ঘরে যে বন্দুক নেই সে কথা তাঁর মনেই পড়ে না!

ঘোষালমশাই এগিয়ে এসে দরজার খিল খুলে ফেলেন। পারুল বাধা দিতে পারে না। দেবার চেষ্টাও করে না। রুদ্ধ কান্নাভেজা গলায় শুধু ডাকে, 'বাবা—'

চেঁচিয়ে ওঠেন স্নেহলতা, 'না, যেও না! বাইরে যেও না তুমি!'

কালী এসে হাত চেপে ধরে, 'না বাবা, যেও না!'

ঘোষালমশাই এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে দরজার পাল্লাদুটো খুলে ফেলেন। পাড়ার সর্বসম্মত অভিভাবক তিনি। সুখেদুঃখে আঘাতে বেদনায় আনন্দে উৎসবে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে দাঁড়ান। পাড়ার লোক তাঁকে মান্য করে, ভালবাসে, তাঁর কথা শোনে, আদেশ পালন করে। এখন এই মধ্যরাতে ডাঙ্গাপল্লীর বুকে মায়ের কান্না, শিশুর চিৎকার, গুলির শব্দ আর বর্বরের হাসি শুনে তিনি কি স্ত্রীকন্যার আঁচল ধরে ঘরে লুকিয়ে থাকবেন! পরিপূর্ণ বৃদ্ধ মানুষ তিনি। তাঁর কি ভয়? মৃত্যু ভয়? আর কতদিন বাঁচবেন? কত বছর? পাড়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত সম্মানের আসন তিনি টলতে দেবেন না। ওইটুকু ছেলে কাজল, সে যদি সাহস করে বেরিয়ে আসতে পারে ঘর থেকে, প্রাণের ভয় উপেক্ষা করে পাড়ার মানুষকে ডাকাডাকি করতে পারে

—তিনি পারবেন না? হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকবেন!

শক্ত হাতে লাঠি ধরে ঘোষালমশাই বারান্দায় আসেন। বারান্দা থেকে বাইরের আঙিনায় নামেন। তারপর বাঁশের দরজা ঠেলে লম্বা লম্বা পা ফেলে আরো এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলেন, 'ও কাজলের মা, কাঁদছ কেন? কি হ'ল তোমার? কই, কাজল কই? কোথায় সে?'

পুলিশের গাড়ি থেকে একটা ঘূর্ণ্যমান আলো ঘোষালমশায়ের মুখের উপর পড়ে। ঘোষালমশাই ভ্রূক্ষেপ করেন না। আরো ক'পা এগিয়ে এসে বলেন, 'কে তোমরা? পাড়ায় ঢুকে হামলা করছ কেন? কি করেছে পাড়ার মানুষ?' বলতে বলতে চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেন। মানসদের বাড়ির কাছে এখনো রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল পুলিশ। শশাঙ্কদের ঘরে-বারান্দায় পুলিশ। ক'জন ছুটে যাচ্ছে সরোজের বাড়ির দিকে। রাস্তার দিকে নিমতলায় দাঁড়িয়ে আছে ক'জন। ও-পাশে নগেনবাবুর বাড়ির কাছে ধান-মাঠের দিকে মুখ করে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। তিন-চারটা গাড়ি থেকে সার্চলাইটের প্রখর আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পাড়ার ঘরবাড়ির সঙ্গে ধানমাঠের একঅংশও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা আলো অনবরত চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশের গাড়িতে এমন ঘূর্ণ্যমান আলো আর কখনো দেখেন নি ঘোষালমশাই। ওই গাড়িটার ইঞ্জিনও চালু আছে।

হঠাৎ নগেনের ছাদের দিকে দৃষ্টি পড়ে তাঁর। চাদরমুড়ি দিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। শরীরের ঊর্দ্ধভাগ আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। তার হাতের ছয় ব্যাটারির টর্চের ধাতব অংশে আলো পড়ে চিকচিক করছে। সামনের কাঁচটা জ্বলে উঠছে থেকে থেকে। নগেন চৌধুরী! সে কেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। এইসময়?

ঘোষালমশায়ের মুখ রাগে ঘৃণায় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তাহলে নগেনই কি পুলিশ আনল এ পাড়ায়! টর্চের আলো ফেলে ঘরগুলো সেই কি চিনিয়ে দিচ্ছে পুলিশকে! তার নির্দেশেই কি গুলি খেল

কাজল ! ধরা পড়ল নরেন ! অসম্ভব নয় ! ঠিকই বলেছিল মহাদেব, 'শয়তান ঢুকেছে একটা পাড়ায়—'

ঘোষালমশাই অস্থির পায়ে কাজলের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ওখানেও পুলিশ ঘিরে রেখেছে গোটা বাড়িটা। সুলেখার আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ঘর থেকে বেরুতে পারছেন না তিনি।

ঘোষালমশাই আবার চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ও কাজলের মা ! কই কাজলকে বাইরে দেখতে পাচ্ছি না তো—'

সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল উঁচিয়ে ছুটো পুলিশ ছুটে আসে তাঁর দিকে। একজন কর্কশ গলায় চোখ রাঙিয়ে বলে, 'এই শালা বুড্ঢা, বাহার কিউ আয়া ? কার্ফু হ্যায়, জানতা নেহি ?'

ঘোষালমশাই ঘাড়মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, 'জানি ! জানি ! ও তো তোমরা রোজই জারি করছ ! কি করবে তোমরা ? গুলি করবে ? কর না, কর—'

যেন কোথা থেকে অসীম সাহস পেয়ে গেছেন তিনি। রাইফেলের নল উদ্যত হয়ে আছে বুকের উপর, গ্রাহ্যই করছেন না। পুলিশ ছুটোর মাঝখান দিয়েই লাঠিহাতে শক্ত সোজা ভঙ্গিতে আরো ক'পা এগিয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল আলোতে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলেন তিনি। কাজলের গুলিবিদ্ধ শরীরটা হাতেপায়ে ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে ক'টা পুলিশ। পেছনে উদ্যত রাইফেল হাতে আরো ক'জন। কাজলের সারাশরীর রক্তে মাখামাখি। সেই তরল রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ঘাসে। এখনো গোঙাচ্ছে সে। মরে নি, বেঁচে আছে। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছে শরীরটা। রুদ্ধকণ্ঠ থেকে কাতর কষ্টের অস্ফুট শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সকলের পেছনে রিভলবার হাতে হেঁটে আসছে ভূষণ সমাদ্দার।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখামাত্র ঘোষালমশাই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কোনো শব্দ বেরুলো না মুখ দিয়ে—কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন সশব্দে ফেটে গেল। বিস্ফারিত চোখ মেলে কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। তারপর হঠাৎ কি হ'ল, কাঁপতে কাঁপতে, ভাঙ্গতে

ভাঙ্গতে অস্থির উন্মত্ত গলায় প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠলেন, 'খুন! খুন! কাজলকে খুন করেছে। দল বেঁধে পাড়ার মানুষদের খুন করতে এসেছে খুনীরা। ও সরোজ, ও চন্দ্রবাবু, ও জটিল—কে কোথায় আছ, উঠে এস সবাই—'

রাত্রির নিস্তব্ধতায় সেই প্রবল পৌরুষ কণ্ঠের ডাক সর্বত্র পৌঁছে যেতেই পাড়ার ঘরে ঘরে রাতজাগা মানুষ একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল! সরব সন্ত্রস্ত, রাগ ও ঘৃণার উচ্চকিত সম্মিলিত চিৎকার।

ভূষণ সমাদ্দার লাফিয়ে এল সামনে। হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'সেই বাঞ্চোত বুড়োটা! হাতে আবার লাঠি! মারো শালাকে!'

একটা পুলিশ রাইফেল উল্টো করে বাঁট দিয়ে জোরে আঘাত করল ঘোষালমশায়ের মাথায়। ঘোষালমশাই আর্তনাদ করে উঠলেন। হাত থেকে লাঠি ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। আর একবার আঘাত করতেই মাথা ফেটে রক্ত ছুটল। মুহূর্তে সাদা চুল লাল হয়ে রক্ত ধারা গড়িয়ে নামল চোখেমুখে। ঘোষালমশাই দীর্ঘ শীর্ণ দু'হাত বাতাসে ছড়িয়ে কিছু একটা ধরতে চাইলেন। কোনো অবলম্বন না পেয়ে টলতে টলতে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। পড়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে মাটি খামচে খামচে লাঠিখানা খুঁজলেন। আর একটু হলেই ধরতে পারতেন কিন্তু লাফিয়ে এসে তাঁর রুগ্ন শীর্ণ প্রসারিত হাতখানার উপর জুতোসমেত একটা পা চাপিয়ে দিয়ে মাটিতে পিষতে পিষতে ভূষণ সমাদ্দার বলে উঠল, 'চেঁচা শালা! এবার চেঁচা! দেখি গলায় কত জোর!'

যন্ত্রণায় ঘোষালমশাই গুঙিয়ে উঠলেন—আঁ আঁ আঁ!'

তারপর সম্পূর্ণ জ্ঞান হারানোর আগে অস্পষ্টভাবে অনুভব করলেন এপাড়ার বুকে যেন অনেকমানুষের কোলাহল উঠছে। ঘরদরজা খুলে যেন মানুষ ছুটে আসছে। ক্রুদ্ধ মানুষ। ধাবমান পায়ের শব্দে মাটি কাঁপছে। ও-পাশে শিশিন্দার ধানমাঠ ভেঙেও কি ছুটে আসছে নামুপাড়ার মানুষ। ঘোষালমশায়ের মনে হল দূরে-অদূরে ক্রমাগত ধাবমান মানুষের পায়ের শব্দ উঠছে। শঙ্খের মত গমগম করে

মানুষের গলার স্বর বেজে উঠছে। সেই প্রবল গণকণ্ঠের মধ্যে যেন কাছাকাছি কোথাও, হয়ত ময়ূরাক্ষীর শালবনেই গুলির শব্দও শোনা যাচ্ছে। গুলির বিনিময়ে গুলি!

পুলিশগুলোর জান্তব হাসি থেমে গেছে। মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। রাইফেলের উপর কাপুরুষ-হাতগুলি কাঁপছে ঠকঠক করে। পায়ে পায়ে পিছু হঠছে তারা।

কাজলের মা চিৎকার করছে, 'কাজল—'

পারুল চিৎকার করে ডাকছে, 'বাবা—'

ঘোষালমশায়ের চৈতন্য লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আকাশ মাটি কাঁপছে। যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। শিলাস্তর বিদীর্ণ হচ্ছে। মাটির বুকে বড় বড় ফাটল। ঘোষালমশাই আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছেন। তবু প্রাণপণে চেষ্টা করছেন চোখদুটো খোলা রাখার। তাঁর মুখে আলো এসে পড়েছে। রক্তমাখা বিস্ফারিত দুটি চোখ আলোতে ঝকমক করছে—

সেই চোখে রাগ ক্রোধ ঘৃণা—

এবং জল।

যতক্ষণ জ্ঞান আছে চোখের পাতা টান টান করে জেগে থাকতে চাইছেন ঘোষালমশাই—